“জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

তাসনীম তাহের

পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর - ৯০

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৬-২০১৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা -১০০০

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা -১০০০

তারিখ ঃ ১৩ এপ্রিল ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা" শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরুপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

তাসনীম তাহের পিএইচ.ডি
গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন পত্র

জনাব তাসনীম তাহের কর্তৃক পেশকৃত, "জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে গবেষকের এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের প্রয়োজনীয় চাহিদার আংশিক পরিপূরক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হলো।

অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই পরম করুনাময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠূভাবে সম্পাদন করার জন্য। দীর্ঘদিন ধরে আমি এই গবেষণা কাজটি করে আসছি। প্রথমদিকে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন। তিনি অবসর গ্রহণ করায় এবং সর্বোপরি বিদেশে অবস্থান করায় আমার গবেষণা কাজটি মন্থর হয়ে পড়ে। যদিও তিনি আমাকে সর্বদা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁরই পরামর্শে আমি তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন করি এবং তাঁর যোগ্য ছাত্র এবং সহকর্মী ড. সাব্বীর আহমেদকে আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেন।

বর্তমানে আমি আমার গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদের অধীনে সম্পন্ন করেছি। তাঁর দিকনির্দেশনা আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার পান্ডুলিপি পড়ে পরামর্শ দিয়ে, সংশোধন করিয়ে আমার লেখাকে উত্তোরত্তর সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক আমাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বিশেষ করে করোনা কালীন সময়ে বারবার পান্ডুলিপি দেখা, গবেষণার প্রয়োজনে বারবার সময় বৃদ্ধিকরণের জন্য তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ ব্যতীত গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভবপর হতোনা। আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক স্যারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং উনার এই দিক নির্দেশনা আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছে।

তাছাড়াও গবেষণা কাজে আমাকে বিভিন্ন সময়ে উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, আমার সহপাঠি ও বিভাগের শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. নীলয় রঞ্জন বিশ্বাস সহ রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অনান্য সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। তথ্য উপাত্ত এবং তাত্ত্বিক পরামর্শ প্রদান করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন বিআইডিডি'র গবেষণা পরিচালক ড. শরীফ আহমদ চৌধুরী।

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মূখ্য তথ্যদাতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবসরপ্রাপ্ত লেফট্যানেন্ট কমান্ডার শাহরিয়ার হামিদ রসুল, অবসরপ্রাপ্ত মেজর দেলোয়ার, ডিআইজি আমেনা বেগম, বাংলাদেশ পুলিশ এবং প্রতিষ্ঠানিক তথ্যদানের জন্য সেনা সদর দপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ ও বিপসটের প্রতি কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, বিআইআইএসএস লাইব্রেরী, বিআইডিডি রিসোর্স সেন্টার ও বিপসট লাইব্রেরীর কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান (অবসরপ্রাপ্ত) ও মোঃ বশীর সহ বিভাগের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা কর্মটির শুরু থেকেই যারা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তারা হলেন আমার বাবা, মা। যদিও তারা আজ বেঁচে নেই তথাপিও আমি মনে করি তাদের দোয়ায় এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। সেই সাথে আমার মেয়ে ক্যাপ্টেন নিশিত মাহবুব ও ছেলে মোহিত মাহবুব সর্বদা আমাকে এই গবেষণা কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছে তাই তাদের প্রতি রইলো আমার কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে জনাব জুলফিকার আলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কম্পিউটার কম্পোজে সহায়তা করার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ তালিকা

(List of abbreviations)

সংক্ষিপ্ত রুপ	বিস্তারিত
BIPSOT	Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training
CPA	Comprehensive Peace Agreement
DOS	Department of Operational Support
DPA	Department of Political Affairs
DPO	Department of Peace Operations
DPPA	Department of Political and Peacebuilding Affairs
EAD	Electoral Assistance Division
ECOWAS	Economic Community of West African States
IDP	Internally Displaced Persons
IGAD	Inter-Governmental Authority on Development
MINUJUSTH	United Nations Mission for Justice Support in Haiti
MINURCA	United Nations Observer Mission in the Central African Republic
MINURSO	United Nations Mission for the Referendum in West Sahara
MINUSCA	United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic
MINUSMA	United Nation Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
MINUSTAH	United Nations Stabilization Mission in Haiti
MONUC	United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo
MONUSCO	United Nation Organization Stabilization Mission in The DR Congo
NEC	National Election Commission
OAS	Organization of American State
OHCHR	Office of the High Commissioner for Human Rights
ONUB	United Nations Operation in Burundi
ONUMOZ	United Nations Operation in Mozambique
ONUSAL	United Nations Observer Mission in El Salvador
OROLSI	United Nations Office of Rule of Law and Security Institutions
PCC	Police Contributing Country
PPAC	Public Protection Advisory Committee
SRSG	Special Representatives of the Secretary-General,
TCC	Troop Contributing Country
UNAMA	United Nations Mission in Afghanistan
UNAMET	United Nations Mission in East Timor
UNAMET	United Nations Mission in East Timor
UNAMID	United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur
UNAMID	United Nations African Union Mission in Darfur
UNAMIR	United Nations Assistance Mission for Rwanda
UNAMIS	United Nations Advance Mission in the Sudan

সংক্ষিপ্ত রুপ	বিস্তারিত
UNAMSIL	United Nations Mission in Sierra Leone
UNAVEM II	United Nations Angola Verification Mission
UNDP	United Nations Development Program
UNEP	United Nations Environment Program
UNGCI/ UNMOVIC	United Nations Guards Contingent in Iraq
UNHQ	United Nations Head Quarter
UNIFIL	United Nations Interim Forces in Lebanon
UNISFA	The United Nations Interim Security Force for Abyei
UNMIBH	United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina
UNMIH	United Nations Mission in Haiti
UNMIH	United Nations Mission in Haiti
UNMIK	United Nations Interim Administration in Kosovo
UNMIL	United Nations Mission in Liberia
UNMIS	United Nations Mission in Sudan
UNMISS	United Nations Mission in South Sudan
UNMIT	United Nations Mission in Timor
UNOCI	United Nations Operation in Cote d'lvoire
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNOMIL	United Nations Observer Mission in Liberia
UNPSO	United Nation Peace Support Operation,
UNSOM	United Nations Mission in Somalia
UNTAC	United Nations Transitional Authority in Cambodia
UNTAES	United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল সমূহের তালিকা

টেবিল নং	টেবিলের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
টেবিল ১	দ্বন্দ্ব উত্তর রাষ্ট্রে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের পরিমাপক সমূহ	২৫
টেবিল ২.১	শান্তিমিশনে মোতায়েনকৃত বাংলাদেশী পুলিশ শান্তিরক্ষী (৩১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত)	৪৬
টেবিল ২.২	শান্তি মিশনের মাঠপর্যায়ের বহুমাত্রিক কার্যক্রম	৬৭
টেবিল ২.৩	শান্তিরক্ষা মিশন কর্তৃক শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কৌশল	৭৬
টেবিল ৩.১	বিগত দশ বছরে শান্তি মিশনে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর অবস্থান	৯৩
টেবিল ৩.২	বাহিনী অনুযায়ী নিহত ও আহত শান্তিরক্ষীর সংখ্যা (সেপ্টম্বর,২০২১ পর্যন্ত)	৯৪
টেবিল ৩.৩	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্নকারী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা	৯৭
টেবিল-৩.৪	মিশন অনুযায়ী বর্তমানে নিয়োজিত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী সংখ্যা	৯৮
টেবিল ৩.৫	পদ মর্যাদা অনুসারে শান্তিমিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশী সেনা সদস্য	৯৯
টেবিল ৪.১	১৯৯১ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত শান্তিমিশন ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ	১০৯
টেবিল ৫.১	এক নজরে ইউএনএমআইএস মিশনে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কার্যক্রম	১২৫
টেবিল ৫.২	ইউএনএমআইএস মিশনে এসআরএসজি ও মিশন প্রধানদের তালিকা	১৩০
টেবিল ৫.৩	ইউএনএমআইএস মিশনের ফোর্স কমান্ডারদের তালিকা	১৩০
টেবিল ৫.৪	ইউএনএমআইএস মিশনের পুলিশ কমিশনারদের তালিকা	১৩১
টেবিল ৫.৫	ইউএনএমআইএস মিশনে অংশগ্রহণকারী শান্তিরক্ষীর ধরণ ও সংখ্যা	১৩৩
টেবিল ৫.৬	সুদানের কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি	১৪৩
টেবিল-৬.১	জাতিসংঘ শান্তিমিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণের দিক হতে প্রধান অর্থ দাতা দেশগুলোর বিপরীতে প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর অবস্থান	১৭৫
টেবিল ৬.২	জাতিসংঘ শান্তি মিশনের ভবিষ্যত (২০২১-২৩) কর্মপন্থা	১৭৭

চিত্র সমূহের তালিকা

চিত্র নং	চিত্রের শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
চিত্র ১.১	সহিংসতার প্রবাহ	১৭
চিত্র ১.২	সহিংসতা ও শান্তি বিস্তৃত ধারণা	১৭
চিত্র ১.৩	তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী কাঠামোঃ গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তি স্থাপন	২৭
চিত্র ২.১	শান্তি মিশনে সেনা, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষকদের দায়িত্ব	৪৬
চিত্র ২.২	শান্তিরক্ষা মিশনের কৌশলগত ক্রমবিকাশ	৪৯
চিত্র ২.৩	২০২০-২০২১ অর্থবছরে শান্তিমিশনে শীর্ষ ১০ অর্থ প্রদানকারী দেশ	৫১
চিত্র ২.৪	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সমন্বিত কার্যক্রম	৫৪
চিত্র ২.৫	OROLSI ভুক্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ও বিশেষ রাজনৈতিক মিশন, ২০১৯	৬৪
চিত্র ২.৬	Organogram: Departments of Political and Peacebuilding Affairs & Departments of Peace Operations	৭৪
চিত্র ২.৭	নির্বাচনী ম্যান্ডেট যুক্ত মিশন সমূহের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম	৭৫
চিত্র ৪.১	বাংলাদেশের অংশগ্রহণকৃত মিশনের ধরণ	১০৭
চিত্র ৫.১	দক্ষিণ সুদানের গণভোট ২০১১ এর ফলাফল (প্রদেশ ভিত্তিক)	১৫৬
চিত্র ৬.১	MINUSCA মিশনে সংঘাতের সংখ্যা (জানুয়ারি-আগস্ট, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯)	১৬৪
চিত্র ৬.২	বিগত এক দশকে সকল মিশনে সেনা ও পুলিশ শান্তিরক্ষীদের উপর সহিংস আক্রমণের হার	১৬৫
চিত্র ৬.৩	বাংলাদেশের অংশগ্রহণকৃত মিশন সমূহে শান্তিরক্ষীদের উপর আক্রমনের হার (জানুযারি ২০১৩- সেপ্টেম্বর ২০১৯)	১৬৬

সূচিপত্র

	ঘোষণাপত্র	i
	অনুমোদন পত্র	ii
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
	শব্দ সংক্ষেপ তালিকা	iv
	টেবিল সমূহের তালিকা	vi
	চিত্র সমূহের তালিকা	vii
	সার সংক্ষেপ	xi
প্রথম অধ্যায়	**ভূমিকা**	১-৩৭
১.১	প্রেক্ষাপট	১
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৫
১.৩	গ্রন্থ পর্যালোচনা	৫
১.৪	গবেষণার যৌক্তিকতা	১৩
১.৫	গবেষণার আওতা	১৪
১.৬	গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তিরক্ষা মিশন	১৫
১.৬.১	গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তিস্থাপনের তাত্ত্বিক কাঠামো	২০
১.৭	গবেষণা পদ্ধতি	২৮
১.৮	গবেষণার ফলাফল	৩২
১.৯	অধ্যায় বিন্যাস	৩৩
	উপসংহার	
দ্বিতীয় অধ্যায়	**জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, ক্রমবিকাশ ও নির্বাচনী ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের কর্মপন্থা**	৩৮-৮২
	ভূমিকা	
২.১	শান্তিরক্ষা	৩৯
২.২	শান্তিরক্ষা মিশনের মূলনীতি	৪২
২.৩	শান্তিরক্ষক	৪৪
২.৪	শান্তিরক্ষা মিশনের কৌশলগত ক্রমবিকাশ	৪৭
২.৫	শান্তিরক্ষা মিশনের অর্থায়ন	৫০
২.৬	শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রম	৫২

২.৬.১	স্থানীয় জনগণকে রক্ষা	৫৪
২.৬.২	সংঘাত প্রতিরোধ করা	৬০
২.৬.৩	আইনের শাসন ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান বির্নিমাণ	৬২
২.৬.৪	মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা	৬৪
২.৬.৫	শান্তি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় নারীর অন্তর্ভুক্তিকরণ	৬৫
২.৬.৬	মাঠপর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান	৬৬
২.৬.৭	শান্তি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় তরুণদের অন্তর্ভুক্তিকরণ	৬৮
২.৬.৮	সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধান	৬৮
২.৭	নির্বাচনী সহায়তা ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনের কাঠামো ও কমর্পন্থা	৭০
	উপসংহার	
তৃতীয় অধ্যায়	**জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ: প্রেক্ষাপট ও অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা**	৮৩-১০২
	ভূমিকা	
৩.১	শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা	৮৪
৩.২	শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ *(১৯৮৮-২০২০)*	৯৩
৩.২.১	জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশের প্রথম দশক *(১৯৮৮-২০০০)*	৯৪
৩.২.২	শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় দশক *(২০০০-২০১০)*	৯৬
৩.২.৩	শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের তৃতীয় দশক *(২০১১- চলমান)*	৯৭
	উপসংহার	
চতুর্থ অধ্যায়	**নির্বাচন পরিচালনা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা**	১০৩-১২২
	ভূমিকা	
৪.১	নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত শান্তি মিশন ও বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ	১০৬
৪.১.১	স্তর ১: নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নির্বাহী কর্তৃত্ব মালিকানা	১০৮
৪.১.২	স্তর ২: নির্বাচন সত্যায়ন ও যাচাইকরণে সরাসরি অংশগ্রহণ	১১০
৪.১.৩	স্তর ৩: জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক পরামর্শ ও সহযোগিতা	১১২
৪.১.৪	স্তর ৪: জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও রসদ সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক নির্বাচনী সহযোগীতার সমন্বয়	১১৫
৪.১.৫	স্তর ৫: সীমিত পরিসরে কারিগরি ও রসদ সহায়তা	১১৭
	উপসংহার	

পঞ্চম অধ্যায়	**গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীঃ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সুদান (UNMIS) এর ভূমিকার পর্যালোচনা**	**১২৩-১৬২**
	ভূমিকা	
৫.১	দক্ষিণ সুদানের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট	১২৪
৫.২	শান্তি প্রতিষ্ঠায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্তি	১২৭
৫.৩	শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি মিশন UNMIS এর গঠন, কার্যক্রম ও ম্যান্ডেট	১২৯
৫.৩.১	মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশ ও সেনা সংখ্যা	১৩১
৫.৪	UNMIS মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ ও নির্বাচনী কার্যক্রম	১৩৪
৫.৪.১	নাগরিক অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষা	১৩৫
৫.৪.২	নির্বাচন অনুষ্ঠান	১৪৮
৫.৫	গণভোট আয়োজন	১৫৫
৫.৬	UNMIS মিশনে ব্যর্থতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	১৫৭
	উপসংহার	
ষষ্ঠ অধ্যায়	**জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়**	**১৬৩-১৯০**
	ভূমিকা	
৬.১	শান্তি মিশনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ	১৬৩
৬.২	শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ ও উত্তরনের উপায়	১৭৫
	উপসংহার	
সপ্তম অধ্যায়	**বিশ্লেষণ ও উপসংহার**	**১৯১-১৯৯**
	পরিশিষ্ট - ১ : মূখ্য তথ্যদাতাদের তালিকা	২০০
	পরিশিষ্ট - ২ : প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংগ্রহের চেক লিস্ট	২০১
	পরিশিষ্ট - ৩ : মূখ্য তথ্যদাতা স্বাক্ষাৎকার চেক লিস্ট (শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী সেনা/পুলিশ সদস্যদের জন্য)	২০৩
	পরিশিষ্ট- ৪ : মূখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার চেক লিস্ট (বেসামরিক ও একাডেমিক বিশেষজ্ঞদের জন্য)	২০৪
	পরিশিষ্ট- ৫ : সংযুক্ত সুদানের ভৌগলিক মানচিত্র	২০৫
	গ্রন্থপুঞ্জি	২০৬

সার সংক্ষেপ

বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশ প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অবদান বা কার্যক্রমের মূল্যায়ণ দুটি বৃহৎ দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করা যায় – প্রথমত: দ্বন্দ্ব নিরসনে সামরিক পন্থায় যুদ্ধবিরতি রক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সহায়ক পরিবেশ তৈরির দিক হতে শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা মূল্যায়ণ। পাবলিক ডিসকোর্সে মূলত এদিকটির মূল্যায়ণ প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক ও প্রশংসা সূচক। বিশ্লেষণের দ্বিতীয় প্রয়াসটি হলো- অসামরিক পন্থায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ তথা নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও চর্চার মধ্য দিয়ে শান্তি স্থাপনে শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ। বর্তমান গবেষণায় দ্বিতীয় দিকটি মূল্যায়ণ করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুনগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে 'বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি' (Content analysis) অনুসরণ করা হয়েছে এবং ঘটনার ব্যপ্তি ও প্রকৃতি বুঝানোর জন্য 'কেস স্টাডি পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়েছে।

তত্ত্বগতভাবে সমাজ বিজ্ঞানী গালতুং 'শান্তি' বলতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের শান্তির যোগফলকে বুঝিয়েছেন। গালতুং এর মতে প্রত্যক্ষ সহিংসতা রোধে সামরিক বা পুলিশি ক্ষমতা নেতিবাচক শান্তি অর্জনে ভূমিকা রাখে। অপর দিকে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহিংসতার ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব নিরসনে রাজনেতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও চর্চা অসামরিক পন্থায় ইতিবাচক শান্তি অর্জনে অবদান রাখে। কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্বন্ধ নিরসনের এ ধারণাটি জাতিসংঘের বহুমাত্রিক শান্তিমিশন এবং গণতন্ত্রায়ণের উদারনৈতিক ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৯১ সালের পর হতে সহিংসতায় লিপ্ত রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রায়ণকে উৎসাহিত করা হয় এবং গণতন্ত্রায়ণ প্রতিষ্ঠা করা জাতিসংঘ শান্তিমিশনের ম্যান্ডেটভুক্ত করা হয়। বৈশ্বিক সহযোগিতায় শান্তিমিশনের এ কাজটি দু'ভাবে সম্পাদিত হয়, প্রথম পন্থা- 'অগ্রাধিকার পদ্ধতি'। এ পদ্ধতি অনুসারে শান্তি আগে গণতন্ত্রায়ণ পরে। যেখানে 'গণতন্ত্রায়ণের' চেয়ে 'শান্তি স্থাপন' কে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এবং দ্বিতীয় পন্থা 'ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি'। এ পদ্ধতি অনুসারে শান্তি ও গণতন্ত্রায়ণ উভয় কার্য সমান্তরালভাবে একই সময়ে পরিচালিত হয়।

গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ শান্তি মিশনে যোগদানের পর হতে মে ২০২০ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ দেশে ৫৪টি মিশনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯১ হতে ২০১২ পর্যন্ত জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী মোট ৩২টি নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত মিশন পরিচালনা করে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ২৬টি (৮১ শতাংশ) নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত মিশনে দায়িত্ব পালন করে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ মিশনে অগ্রাধিকার পদ্ধতি অনুসরণ করে শান্তি স্থাপনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার পরিমাপক সূচকগুলোর উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়নি। সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি অনুসারে শান্তিরক্ষা ও গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া একই সাথে পরিচালিত না হওয়ায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ, নির্বাচনী কাঠামো, আইনের শাসন ইত্যাদি), রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন (অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি চর্চা, নির্বাচন অনুষ্ঠান, ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক

হস্তান্তর ইত্যাদি) এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ, মানবাধিকার, রাজনৈতিক শিক্ষাসহ সামাজিক সংগঠন ও গণমাধ্যমের মিডিয়ার বিকাশ হয়নি। গবেষণায় দেখা যায়, নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত শান্তি মিশনে এ সূচকগুলোর উন্নয়নে কম গুরুত্বারোপ করে সাময়িক একটি রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করে নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে মিশন ম্যান্ডেট পূরণ হয়েছে, শান্তিরক্ষার মাধ্যমে নেতিবাচক শান্তি অর্জিত হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি না হওয়ায় ইতিবাচক শান্তি অর্জিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে আফগানিস্তান বা সুদান মিশন উল্লেখ্যযোগ্য।

গবেষণার কেস স্টাডি সুদানের UNMIS মিশন বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা ছাড়াও মাঠ পর্যায়ের Good Office এর আওতাধীন জাতিসংঘের বিভিন্ন উপ-শাখার সাথে নিরাপত্তা ও কৌশলগত সহযোগিতার ভিত্তিতে দুটি প্রক্রিয়ায় মিশন ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন করে। এক. নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান এবং দ্বিতীয়ত নির্বাচন অনুষ্ঠান। এ লক্ষে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-প্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশি কাঠামো, আইনী বিধিবিধান প্রণয়ন, সংবিধান প্রণয়ন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, ভোটার রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘের Department of Political Affairs বিভাগের আওতায় জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা কাজ করে। এ মিশনে মোট শান্তিরক্ষীর ৯৬.৯৭ শতাংশ ছিলো বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী। ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের সকল স্তরে নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সর্বত্র ছিলো বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা। মিশন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণে দেখা যায়, পদ্ধতিগত ভাবে এ মিশনে ২০০৫ সালের পর হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত 'অগ্রাধিকার পদ্ধতি'তে শান্তিরক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে নির্বাচনের একবছর পূর্বে ২০০৯ সাল হতে 'ক্রমবিকাশমান' (Gradualist Approach) পদ্ধতিতে গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তিস্থাপন প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গণতান্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মিশনের মাঠ পর্যায়ের Good Office এর সকল উপ-শাখার নিরাপত্তা, তাদের কাজের পরিবেশ তৈরি, যাতায়াত এবং কারিগরি বিষয়সমূহ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে। নিরাপত্তা ও কারিগরি সহযোগিতার বাইরে সরাসরি দায়িত্ব পালন করে নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণে, ভোটার তালিকার কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার গঠনে, ভোটের সকল সরঞ্জাম, ব্যালট পেপার, কালি, ব্যালট বক্স ইত্যাদির নিরাপত্তা ও দেশের সকল কেন্দ্রে প্রেরণের দায়িত্ব এবং ভোটের ফলাফল সরাসরি বাহিনীর নিজস্ব রেডিও লিংক ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌঁছে দেয়ার কাজ করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্থানীয় এফএম রেডিও বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম প্রচার করে। ২০১০ সালে জাতীয় নির্বাচন এবং ২০১১ সালের গনভোটের মাধ্যমে সুদান হতে দক্ষিণ সুদান পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সাময়িকভাবে সুদানের দু'অংশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিসমাপ্তি হয়। বলা হয় মিশন ম্যান্ডেট অর্জিত হয়েছে বা জাতিসংঘের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায়, কাঠামোগত তথা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ না হওয়া এবং সাংস্কৃতিক সংঘাত নিরসনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ইতিবাচক শান্তি অর্জিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে, দীর্ঘ মেয়াদে দেশ দুটিতে - সুদান ও দক্ষিণ সুদানে পুনরায় সংঘাত ও

দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ২০১১সালে UNMIS মিশন সমাপ্ত হয়, অথচ এখন পর্যন্ত দক্ষিণ সুদানে একটি মিশন এবং সুদানে তিনটি পৃথক মিশন চলমান রয়েছে। সুদান দেশ ভেঙ্গে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি (দক্ষিণ সুদান) হয়েছে কিন্তু সুদানের জনগণ কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক শাসনের সুফল পায়নি। দেশটিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ না হওয়ায় ২০২১ সালে সুদান সামরিক শাসনের মাধ্যমে পুনরায় সংঘাত গ্রস্ত রাষ্ট্রে পতিত হয়। বলা যায়, বাহির থেকে মিশনের মাধ্যমে গণতন্ত্রণ চর্চা সাময়িক সময়ের জন্য চাপিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মিশনের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা হয় কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশী সেনা ও পুলিশ সদস্যগণ পেশাগত দক্ষতা, দ্বন্দ্বকালীন সমস্যা মোকাবেলা, মানবাধিকারসহ আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া সচল রাখার বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অর্জিত এ দক্ষতা শান্তিরক্ষীরা দেশে নিজ বাহিনীর পেশাদারিত্ব এবং দেশের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্ট করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে শান্তিরক্ষা কর্মসূচিতে প্রধান অর্থদাতা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতিতে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ ভবিষ্যৎ বিশ্বরাজনীতিতে গণতন্ত্র সাহায্যের (aiding Democracy) উদ্যোগ জাতিসংঘ শান্তি মিশনের ম্যান্ডেটে আরো গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে বলা ধারণা করা যায়। পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতি, চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিরক্ষা কৌশল এবং শান্তিরক্ষী প্রেরণে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা বিবেচনা করে বর্তমান প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিভিন্ন বাহিনীর সামরিক ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার উপর অধিকরত গুরুত্বারোপ করা উচিত। এ লক্ষ্যে বাহিনীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পরিবর্তন ও সংস্কার যেমন প্রয়োজন তেমনি বিপসটের ন্যায় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে রাজনৈতিক মতৈক্য প্রয়োজন। অন্যথায় বিশ্বশান্তি রক্ষায় শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের কৃতিত্ব ঝুঁকিতে পড়বে।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ হতে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকাসহ ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (২৮ জুলাই ১৯১৪ - ১১ নভেম্বর ১৯১৮ ইং) পরবর্তী পৃথিবীব্যাপী দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিরসন এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে 'লীগ অব ন্যাশনস' গঠিত হয়। কিন্তু সংগঠনটি শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় এবং এ ব্যর্থতার সূত্র ধরে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো জোটবদ্ধভাবে দ্বিতীয় বার (১৯৩৯-১৯৪৫) যুদ্ধে জড়ায়[১]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার মানব সভ্যতাকে স্তব্ধ করে দেয়। মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে যুদ্ধের নির্মম ভয়াবহতা। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এ সময়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের বলয়ে যুদ্ধে সমর্থন দানের জন্য নতুন এক প্রস্তাব প্রদান করে যদি যুদ্ধে সমর্থন করে পরবর্তীতে এ রাষ্ট্রগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। যুদ্ধে পরাশক্তিগুলোর অংশগ্রহণ, জয়ের উম্মাদনা, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের নেতৃত্ব শূন্যতা ও অরাজকতাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু থেকে পৃথিবীব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের টানা চার বছরের প্রচেষ্টায় নতুন করে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সংঘ হিসেবে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র এ সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠার এ দীর্ঘ পরিক্রমায় জাতিসংঘ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার আন্তঃ ও অন্তঃ সংঘাত, বৈরিতাসহ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। আন্তঃ রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসনে জাতিসংঘ যেমন শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, দারিদ্রতা নিরসনে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

কিন্তু, 'যুদ্ধ নয় শান্তি' এ লক্ষে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঔপনিবেশিক শৃংঙ্খল থেকে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সমস্যা নিরসন, বৃহৎ শক্তি কর্তৃক অপর রাষ্ট্র

আক্রমণ এবং দখলদারিত্বের বিষয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে বিভিন্ন সময় দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক সংকট, অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা আন্তঃ রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব। এই সংকটের বিভিন্ন কারণ থাকলেও প্রকৃত অর্থে শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব এবং সম্পদের উপর আধিপত্য এসব দ্বন্দ্বের পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির উপর পশ্চিমা উন্নত রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা গেলেও জাতিসংঘ বহুক্ষেত্রে সমস্যা নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। যেমন– পূর্ব তিমুর, সুদান, নেপাল, কঙ্গো, সিয়েরালিয়ন, আইভরীকোস্ট, কুয়েত, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কসভো, লাইবেরিয়া, বসনিয়া, রুয়ান্ডাসহ বিভিন্ন দেশে জাতিগত কিংবা আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সংঘাত নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জাতিসংঘ। আবার বিভিন্ন দেশে সংঘাত নিরসনে বিশেষ করে বসনিয়া, ইরাক, সোমালিয়া, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া, হাইতি, কাশ্মীর, ভিয়েতনামসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে জাতিসংঘের ভূমিকা সমালোচিত ও বিতর্কিত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু অঞ্চলে দেশ বিভাজন প্রক্রিয়ায়, জাতিগত ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপও অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে প্রথাগত শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, যা সাধারণত যুদ্ধ বিরতি পর্যবেক্ষণ, নিরপেক্ষ অঞ্চল রক্ষা, সংঘর্ষে লিপ্ত দু'পক্ষকে যুদ্ধবিরতিতে বিভক্ত রাখা ইত্যাদি নিয়ে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর জটিল শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রশ্নাতীত হয়। সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও বিতর্কিত ভূমিকার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের ভূমিকা ও কার্যাবলীতে সংস্কারের দাবী উঠে। গত শতকের আশির দশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যার পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। এসব প্রস্তাবনা জাতিসংঘের নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা শাণিত করার গুরুত্বকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসে। জাতিসংঘের কার্যক্রমকে নতুন করে সাজানোর লক্ষে ১৯৯২ সালের ৩১ জানুয়ারি তৎকালীন মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালি সাধারণ পরিষদে "An Agenda for Peace" উত্থাপন করেন। তিনি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পাঁচটি – বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন[২]- প্রতিরোধমূলক কূটনীতির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা; সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জাতিসংঘ বাহিনীর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা (peacemaking); একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সংকট নিরসনের জন্য জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন রাখা (peacekeeping); চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘাতত্তোর শান্তি প্রতিষ্ঠা (post conflict peace-building); আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে চুক্তি

সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা অঞ্চল গড়ে তোলা। বুট্রোস বুট্রোস ঘালির এ প্রস্তাব জাতিসংঘ শান্তি কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। বর্তমান জাতিসংঘ শান্তি কার্যক্রম বুট্রোস বুট্রোস ঘালিরই প্রস্তাবিত উদ্যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তি অর্জনের এ কার্যক্রমে গতানুগতিক সামরিক শক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি অসামরিক পন্থায় শান্তি অর্জনকে অন্তর্ভুক্ত করে। অসামরিক পন্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি অর্জনের একটি কাঠামো গড়ে তোলা হয় এবং পরবর্তীতে এর চর্চার মাধ্যমে স্থিতিশীল শান্তি অর্জিত হয়। শান্তি সৃষ্টি, শান্তি রক্ষা, এবং শান্তি তৈরি (peacemaking, peacekeeping, peace-building)- এই তিনটি কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে জাতিসংঘের নিজস্ব কোন বাহিনী কাজ করে না। এখানে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সেনা, নৌ, বিমান, পুলিশ ও বেসামরিক বাহিনী ও সংস্থাসমূহ এক যোগে কাজ করে থাকে। বহুমাত্রিক এ শান্তিরক্ষা মিশনগুলো একই সাথে রাজনৈতিক, সামরিক এবং মানবিক কার্যক্রমের সমন্বয়ে গঠিত। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে উন্নত বিশ্বের সামরিক শক্তিশালী দেশগুলোর পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণ ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়। বিশেষ করে অসামরিক পন্থায় শান্তি অর্জনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এ সময়ে উন্নত বিশ্বের পরাশক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে হ্রাসপায় এবং মাঠ পর্যায়ে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত, বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা, ইথিওপিয়া, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশ শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে স্বীকৃতি পায়[৩]। একবিংশ শতকের শুরু হতে বাংলাদেশ প্রথম সারির শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অংশীজন।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বিশ্বের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশ্ব শান্তি রক্ষার এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথা বাংলাদেশ সংবিধানে উচ্চারিত হয়েছে[৪]। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হচ্ছে– 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব এবং কারো সাথে বৈরিতা/শত্রুতা নয়' (friendship to all and malice to none)। বিশ্বশান্তির প্রতি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির আলোকে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ প্রথম জাতিসংঘ শান্তিমিশনে যোগদান করে। বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ একযোগে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করে আসছে। ১৯৪৮ সাল হতে জাতিসংঘের ৭১টি[৫] শান্তি মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ (১৯৮৮ হতে ২০২১ পর্যন্ত) ৫৪টি[৬] শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান শান্তি মিশনে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ১৯৮৯ সালে নামিবিয়া মিশনে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ এবং ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনী জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদান করে। বর্তমানে (জুলাই ২০২১) বাংলাদেশ জাতিসংঘে ৬৪৩৫ জন শান্তিরক্ষী প্রেরণ করে প্রধান শীষস্থানীয় শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ[৭]। উল্লেখ্য যে, ২০১১, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশ প্রথম শীর্ষ স্থানীয় সেনা প্রদানকারী দেশ ছিল। ভৌগোলিক কিংবা আবহাওয়াগত পার্থক্য, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আঞ্চলিক বৈষম্যকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা বিশ্ব মানবতার সেবায় নিজেদের পেশাদারিত্ব প্রমাণ করে চলেছে। হাইতি হতে পূর্ব তিমুর, কঙ্গো এবং লেবানন পর্যন্ত বিশ্বের সকল সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের প্রভাব রয়েছে। বসনিয়ার তীব্র শীত, সাহারা মরুভূমির দুঃসহনীয় গরম, পূর্ব এশিয়ার ক্লান্তিকর আর্দ্রতার সাথে মানিয়ে নিয়ে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পেশাগত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, সততা, মানবিক আদর্শকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলছে।

এ প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকার ধরন কী? এটা কি শুধুই সহিংস সংঘাত নিরসন নাকি সংঘাত পরবর্তী স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত? বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি কি রাজনৈতিক কৌশলগত, নাকি মানবাধিকার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে স্থায়ী শান্তি স্থাপন ও স্বশাসনের দায়িত্ব অর্পনের মধ্যে নিহিত? এসব প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রবন্ধে[৮] বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের সামরিক কৌশলগত, দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রেক্ষাপট কিংবা সুনির্দিষ্ট অপারেশন পরিচালনাগত বা আর্থিক সুবিধাগত কিংবা বাহিনীর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার চিত্র ফুটে উঠলেও স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির আলোচনা অনুপস্থিত। বিশেষ করে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্থায়ী শান্তি অর্জনের নিয়মতান্ত্রিক ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে বর্তমান গবেষণায় শান্তিরক্ষা মিশনে নির্বাচন পরিচালনা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা

পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণায়, নিম্নোক্ত গবেষণা প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা হয়েছে-

ক. স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনী কীভাবে ভূমিকা রেখেছে?

খ. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সুদানে UNMIS (United Nations Mission in Sudan) মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কি ভূমিকা পালন করেছে?

গ. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ভবিষ্যতে আরো কিভাবে অধিকতর কার্যকর হতে পারে?

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো –

ক. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মূলনীতি, কর্ম কৌশল এবং নির্বাচনী ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের কর্মপন্থা বিশ্লেষণ;

খ. শান্তিরক্ষা মিশনে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রায়োগিক ক্ষেত্র ও ভূমিকা নিরুপন;

গ. শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনীর এ ভূমিকার আলোকে ভবিষ্যৎ মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ।

১.৩ গ্রন্থ পর্যালোচনা

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও তার প্রভাব নিয়ে একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক লেখালেখিকে আমরা দুটিভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করতে পারি। প্রথম দিকটিতে রয়েছে মিশনে অংশগ্রহণের ফলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা, সক্ষমতা অর্জন ও আর্থিক বিষয়াদি বিশ্লেষণমূলক প্রকাশনাসমূহ। এ পর্যায়ে রয়েছে অংশগ্রহণকারী শান্তিরক্ষীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মিশন ভিত্তিক অভিজ্ঞতা, সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা সংস্কৃতি ও জনগণের জীবনাচরণ এবং সাথে শান্তিরক্ষীদের

ব্যক্তিগত ও সুনির্দিষ্ট অপারেশনের অভিজ্ঞতার মিথস্ক্রিয়া। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি হলো – শান্তি মিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক দিক নিয়ে রচিত বই পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহ। এ গ্রুপের লেখালেখিগুলোকে আবার দুটিভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়। এক. সশস্ত্র বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সামরিক সক্ষমতা এবং মিশন কেন্দ্রিক বাংলাদেশের কৌশলগত অভিজ্ঞতা ও বৈশ্বিক তুলনামূলক সামরিক বিশ্লেষণ। যেটি সামরিক পন্থায় শান্তি অর্জনের পন্থাকে নির্দেশ করে। এভাগে বেশ কিছু স্টাডি লক্ষ্য করা যায় – যা সাধারণত সামরিক বাহিনী বা মিশনের সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন। একাডেমিক আলোচনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণও লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে অসামরিক পন্থায় শান্তি অর্জনের দিক নিয়ে আলোচনা। বিশেষত বহুমাত্রিক মিশনে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থিতিশীল শান্তি অর্জনে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা। শান্তি মিশনের এ দিকটি নিয়ে দেশীয় লেখালেখি লক্ষ্য করা যায়না। যদিও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে এ নিয়ে একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিছু প্রতিবেদন বা লেখালেখি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের মিশনে অংশগ্রহণের ইতিহাস দীর্ঘ তিন দশকের বেশি হলেও এ নিয়ে একাডেমিক অধ্যয়ন সাম্প্রতিক সময়ের। ২০১৮ সালে দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত "শান্তিরক্ষী" গ্রন্থটিতে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় ৩০ বছরে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। মোট ৩৩ জন শান্তিরক্ষী বিভিন্ন মিশনে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে ৩৩টি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সুদানের দারফুরে ইউনাইটেড মিশন ইন দারফুর (ইউনামিড) মিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে মোঃ মনিরুল হক তার *"দারফুরের এক মা"* প্রবন্ধে দেখান যে, সুদানের পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ দারফুরের UNAMID মিশনে সামরিক দায়িত্বের বাহিরে গিয়ে অসামরিক পন্থায় তথা সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সুদানের পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ দারফুরে দুটি ভাষাগত জনগোষ্ঠীর তথা অনারাবীয় ও আরাবীয়দের দ্বন্দ্বে ২০০৩ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অনারাবীয় ও আরাবীয় গোত্রগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধে ৩ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে আশ্রয় নেয় পাশ্ববর্তী চাঁদ প্রজাতন্ত্রে। ২০০৭ সালের ৩১ জুলাই বাংলাদেশসহ প্রায় ৫০টি দেশ এ মিশনে (UNAMID) অংশগ্রহণ করে। এ

শান্তি মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের চিকিৎসা শাখা নিজেদের সেনা সদস্যদের চিকিৎসা সহায়তার পাশাপশি অসহায় শরণার্থীদের জন্যও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে। স্থাপন করা হয় ভ্রাম্যমান হাসপাতাল। কমিউনিটি কেন্দ্রিক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলে। চিকিৎসার পাশাপশি স্থানীয় জনগণ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এইচআইভি, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়। অসহায় ও যুদ্ধাহতদের হুইল চেয়ার, সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। লেখক বলতে চেয়েছেন কার্যতঃ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অসামরিক পন্থায় কমিউনিটি কেন্দ্রীক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জন এবং স্থানীয় রাষ্ট্রীয়পক্ষ সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি অসামরিক পন্থায় শান্তি অর্জনের পথকে সুগম করে।

লেখক মন্তব্য করেন যে, সামরিক জান্তার শাসন হতে দক্ষিণ সুদানের গোত্রগুলোর স্বাধীনতা এবং প্রত্যাশা তাদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বোধ শক্তির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক চাপে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের স্বার্থে দক্ষিণ সুদান বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ নিয়ে লেখক অন্য জায়গায় বলেছেন – ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও এখানে বিনা সুদে ঋণ দেয়। কিন্তু স্থানীয়রা ঋণ পরিশোধে একেবারেই সচেতন নয়। তারপরও এনজিওগুলো ঋণ দেয়। অবকাঠামো বলতে কিছুই নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুন্দর সুন্দর সব গীর্জা। এমিনিষ্টরা খুব দ্রুত খ্রিষ্টান ও ইহুদি হচ্ছে। দক্ষিণ সুদান জুড়ে নানা অজুহাতে পশ্চিমাদের অবাধ আনাগোনা। কেউ মাইন সরায়, কেউ উদবাস্ত সামলায়, কেউ গভীর নলকূপ বসায়, কেউ রিসোর্ট চালায়, কেউ চালায় স্কুল আবার কেউবা হাসপাতাল। এসবের আড়ালে থেকে যায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবসার মালিকানা। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সুদানে কমিউনিটিভিত্তিক চিকিৎসা, শিক্ষা অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করে এবং এ কাজ তাদেরকে স্থানীয় পর্যায় আস্থা অর্জনে সহায়তা করে। গণভোট আয়োজনে বাংলাদেশের সক্ষমতা স্থানীয় জনগণকে এই বার্তা দেয় যে, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আয়োজনে সচেষ্ট হবে। শান্তি অর্জনের কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে সহায়তা করবে। এ কাজটি সামরিক পন্থার চেয়ে অসামরিক পন্থায় বেশি কার্যকর ও সফল হয়। শফিকুল ইসলাম তার "জোন অব কনফিডেন্স" প্রবন্ধে ইউনাইটেড নেশনস মিশন ইন আইভরি কোস্ট এর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখান যে, প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি আইভরি

কোস্টে কাঠ, হীরা, সোনা, ইউরেনিয়াম, কোকোসহ অফুরন্ত সম্পদের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বে কিভাবে শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের স্কুলগুলো অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। একটি জাতিকে ধ্বংস করতে শিক্ষা ও যুব সমাজকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট। এ কাজটি ফ্রান্সও তার উপনিবেশ আইভরি কোস্টে ভালোভাবেই করেছিল। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের মিশন ম্যান্ডেটের মধ্যে থেকে আইভরি কোস্টের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয় বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সাথে নানাবিধ আলাপ আলোচনা এবং বহু শান্তকরণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা স্থানীয়দের মন জয় করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত পরিবর্তন ও সংস্কারের পথকে উন্মুক্ত করে।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন তার *"সাভান্নায় এক রাত"* নামক প্রবন্ধে দক্ষিণ সুদানের গণভোট পূর্ববর্তী মিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে দক্ষিণ সুদানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণ সুদান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আর্বিভূত হতে যাচ্ছে, অথচ স্বাধীন রাষ্ট্রের লক্ষ নিয়ে জনগণ সচেতন ছিলো না। ২০১০ সালে জাতীয় নির্বাচনের পর সুদান হতে ধাপে ধাপে সুদান পৃথকীকরণের জন্য গণভোটের আয়োজন করা হয়। লেখক দেখান যে, দক্ষিণ সুদানে পঞ্চাশ উর্ধ্ব গোত্র রয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক ও পশুপালন তাদের মধ্যে আভিজাত্যের প্রতীক। এসব গোত্রদের মধ্যে রাষ্ট্র ভাবনা বা আইন শৃংখলা বলতে কিছু নেই। প্রায় ৬০ বছর ধরে পুরো একটি প্রজন্ম এখানে উত্তর সুদানের সাথে লড়ে চলেছে। অবকাঠামো বলতে কিছুই নাই। রাজধানী জুবার কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে গোটাঁ দক্ষিণ সুদানের সব রাস্তাই ছিল কাঁচা। সুপেয় পানির বোতলের চেয়ে বিয়ার সস্তা। পুরুষরা বিয়ার খেয়ে সারাদিন বুঁদ হয়ে থাকে। লেখক স্বাধীনতাপূর্বের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন – আসন্ন গণভোটে দেশটা ভাগ হবে। "সাউথ – সুদান" নামে নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিবে। সে বিষয়টা প্রায় নিশ্চিত। অথচ নতুন দেশের নাম কী হবে, পতাকা কেমন হবে, সেসব নিয়ে তাদের কেউ তেমন কিছুই ভাবেনা।

মোঃ তারেক মাহমুদ সরকার তার *"অ্যাভেবায় রক্তারক্তি "* প্রবন্ধে ইউনাইটেড নেশনস মিশন ইন কঙ্গো অভিজ্ঞতার আলোকে দেখিয়েছেন সিয়েরা লিওনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের যত সহজে দোভাষী ছাড়া স্থানীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব ছিলো কঙ্গোতে তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাষাগত

সমস্যা থাকায় স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জনে অনেক সময় লেগেছে। ২০০৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কঙ্গোর এ মিশনে একজন ক্যাপ্টেনসহ নয়জন বাংলাদেশী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে মারা যায়। দোভাষীরা কতটুকু সঠিতভাবে তাদের ভাষা অনুবাদ করছে সেটাও অনেক সময় সমস্যা তৈরি করে। ভাষাগত এই সমস্যাকে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশী শান্তি মিশন পরিচালনায় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এ. কে.এম তাওহীদুল ইসলাম (২০১৭) রচিত *"শান্তির দূত বসনিয়ার দিনগুলি"* গ্রন্থে বসনিয়ার জাতিসংঘের ইউনাইটেড নেশনস প্রোটেকশন ফোর্স মিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে তার স্মৃতিচারণ করেছেন। লেখক বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো থেকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের শুরু হয়েছে বলে ঐতিহাসিকভাবে এ মিশনের গুরুত্বারোপ করেছেন। সারায়েভোতে সার্বিয়ান মুসলমান রায়টের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং সারায়েভোর রাস্তায় অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান ক্রাউন প্রিন্সকে হত্যার মাধ্যমে পুনরায় শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বসনিয়ার যুদ্ধ মূলত ছিল বসনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে বসনীয় ও ক্রোয়েশিয় সার্ব বাহিনীর সংঘাত (সার্ব হচ্ছে খৃষ্টান, সার্বজাতি তিনটি দেশে রয়েছে – সার্বিয়ার সার্ব বাহিনী, বসনিয়ার সার্ব বাহিনী ও ক্রোয়েশিয় সার্ব বাহিনী)। বসনিয়ার বিহাচ অঞ্চলে মুসলমানদের সাথে সার্বদের সহিংস সংঘাতের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের আহ্বানে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী ব্যাটালিয়ন বিহাচের জনগণের সুরক্ষায় নিয়োজিত হয়। লেখক স্থানীয় বসনিয়ার জনগণের সাথে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের মৈত্রীর আবহ তৈরির বিভিন্ন কমিউনিটি কার্যক্রম তুলে ধরেছেন, তেমনি শান্তি মিশনকে পশ্চিমা বিশ্বের ভূ-রাজনীতি, সামরিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। বসনিয়ার মুসলমানদের সাথে সার্বদের নৃশংসতা এবং বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের মানবিক আচরণ, যেমন – চিকিৎসা, শীতকালীন জ্বালানী সংগ্রহ করে দেওয়া, জানাজা বা মিলাদ মাহফিলের জন্য মিশনের ইউনিটের পেশ ইমামকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কমিউনিটির সাথে যে ঐক্যতান গড়ে উঠে তা উল্লেখ করেছেন। এ আস্থা ও বন্ধন বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে অসামরিক পন্থায় শান্তি মিশনে সফলতার অন্যতম কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

সাইফুদ্দিন আহমেদ ও মোঃ জাহিদুল ইসলাম (২০১৯) রচিত "শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন" গ্রন্থে শান্তি ও দ্বন্দ্বের কারণ ও তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন। তবে লেখকদ্বয় শান্তি স্থাপনে জাতিসংঘের শান্তি মিশন কার্যক্রম কে সুনির্দিষ্টভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক শান্তি অর্জনের পদ্ধতির আওতাভুক্ত করেননি। তেমনি জাতিসংঘের বহুমাত্রিক মিশনগুলো যেখানে অসামরিক পন্থায় নির্বাচন আয়োজন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের যে টেকসই পন্থা অনুসরণ করেছে তা তাত্ত্বিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে শান্তি অধ্যয়নের ধারণাগত বিষয়াদি লেখকদ্বয় উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন।

মোঃ হুসাইন Bangladesh Army Journal এ প্রকাশিত তার "*Role of Bangladesh in UN Peace Keeping Operation*" প্রবন্ধে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর শান্তি মিশনে বিভিন্ন ভূমিকার কথা চিহ্নিত করেছেন। এ সকল ভূমিকার প্রতিটি বিষয় হচ্ছে সামরিক কৌশলগত দিক হতে কিন্তু অসামরিক পন্থায় কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ও মানবাধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে শান্তি অর্জনে ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়নি[৯]।

টি.এ জিয়ারত আলী (১৯৯৭) তার "*The Changing Nature of United Nations Peace Keeping Operations*" প্রবন্ধে ঐতিহাসিক পরিক্রমায় শান্তিরক্ষা মিশনের ক্রমবিকাশ ও কাঠামোগত বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক শান্তি মিশনের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের আর্থিক সংকট ও স্থায়ী সদস্যদের উপর নির্ভরশীলতাকে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন[১০]। তবে শান্তিরক্ষা মিশনের এ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর করণীয় বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায় না।

রাশেদুজ্জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস তাদের "*জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ : প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভবনা*" শীর্ষক প্রবন্ধে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা, ভবিষ্যতে সেনা প্রেরণে বাংলাদেশের জন্য দেশীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরেছেন[১১]। লেখকদ্বয় বর্তমান বহুমাত্রিক ও চতুর্থ প্রজন্মের মিশনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লজিস্টিকে যথাযথ মজুদ, বহুমাত্রিক মিশনে বেসামরিক বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের হার খুবই নিম্ন এবং

শান্তিরক্ষী প্রেরণে সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা অতি মাত্রায় প্রভাবিত হওয়া এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ দুঃসাধ্য হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য সব চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ণ প্রক্রিয়ায় পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র বাড়ানোসহ কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও ক্ষেত্র বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ইলিয়াস ইফতেকার রাসুল (২০১০) তার *"Bangladesh Contribution to United Nations Peace Keeping Missions in Africa"* প্রবন্ধে লেখক উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৯ সালে সিয়েরা লিওনে ভয়ানক পরিস্থিতিতে যখন অনেক রাষ্ট্র মিশন পরিত্যাগ করে চরমভাবে দায়িত্বে অবহেলার পরিচয় দেয়, বাংলাদেশ তখন সেখানে অল্প সময়ের নোটিশে UNAMSIL – এ যোগদান করে এবং বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা গেরিলা নিয়ন্ত্রিত পুনরুদ্ধার ও শান্তি শৃংঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখে[১২]। বাংলাদেশীদের এই ভূমিকায় সিয়েরালিওন সরকার বাংলাকে সে দেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। লেখক আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে আফ্রিকার গুরুত্ব আরোপকে জোর দেয়ার সুপারিশ করেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঐসব দেশে তৈরি পোষাক, ঔষধসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানীর নতুন দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

মোঃ আমিনুল ইসলাম (২০০১) তার "Peace keeping Operations and its Legal Consideration" প্রবন্ধে শান্তিরক্ষা মিশনের আইনানুগ কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন পাশাপাশি মিশনের প্রকারভেদ এবং আইনানুগ কাঠামো উল্লেখ করেছেন। লেখক আর্থিক বিষয়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর অবদান এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সদস্য ফি বাবদ অর্জিত অর্থ ও মিশনের ক্রমবর্ধমান ব্যয় এ দুয়ের ফারাক চিহ্নিত করে মিশনের সফলতার সাথে আর্থিক বিষয়ের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করেছেন[১৩]।

কাজী আশফাক আহমেদ (১৯৯৫) "United Nations Peace Keeping Operations– Lessons Learned, Bangladesh Army Journal" প্রবন্ধে ভবিষৎ মিশনের জন্য চারটি বিষয়কে মিশনের

সাফল্যের জন্য চিহ্নিত করেছেন[১৪]। রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা প্রতিশ্রুতি ,ক্ষমতার শূন্যতা যেন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখা, নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের পুনরায় একত্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শান্তি বাস্তবায়নের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট থাকা। লেখক শান্তি মিশনের সফলতার জন্য আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোর আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী শান্তিরক্ষীদের কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে উল্লেখ করেছেন। শান্তি মিশনের সফলতার জন্য মানবাধিকার রক্ষার প্রতি সদিচ্ছা, জাতিসংঘ কর্মী/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মিডিয়া ব্যবস্থাপনা এবং মিশনে জড়িত শান্তিরক্ষীদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ এবং সর্বোপরি স্থানীয় জনগণের মনোভাব গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন ও তাদের আস্থা অর্জনের জউদ্দ্যোগ গ্রহণকে গুরুত্বারোপ করেছেন।

Derek Carnegie, Marie Doucey ও অন্যান্য (২০১২) তাদের *"The Role of Peace Keeping Operations in Electoral Process"* গবেষণা প্রবন্ধে অসামরিক পন্থায় সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানে শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে বিষয় ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনকালীন সময়ে মিশনের বিভিন্ন শাখার ভূমিকাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে রাষ্ট্র ভেদে আলোচনা বা কোন একক রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ বা মিশন ভিত্তিক ভূমিকা বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্বাচনকালীন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিরাপত্তা টহল ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনী মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য নতুন দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, মিশন এবং জাতিসংঘের অন্যান্য এজেন্সিসমূহের মধ্যে মানবাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে সমন্বয় জোরদারকরণ, নির্বাচনকালীন সময়ে আমন্ত্রণকারী দেশের জাতীয় নির্বাচন কমিশন, নির্বাহী বিভাগসহ মানবাধিকার কমিশনকে জনসম্পৃক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়[১৫]।

উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী কর্তৃক সামরিক পন্থায় শান্তিস্থাপনের বিভিন্ন সামরিক কলা কৌশল, দক্ষতা, মিশনের আইনানুগ ও কারিগরি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন লেখক ও গবেষক বিভিন্নভাবে আলোকপাত করছেন। কিন্তু, শান্তি মিশনের অসামরিক পন্থার তথা বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং সংঘাতময় রাষ্ট্রে নির্বাচন পরিচালনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে

সহায়তার ভূমিকা চিহ্নিতকরণের শূণ্যতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান গবেষণায় নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে কি এবং কিভাবে অবদান রেখেছে তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

স্বাধীনতা পরবর্তী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অর্জনে দেশের তৈরি পোষাক খাত, শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ এবং ক্রিকেট খেলায় সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের জন্য শান্তিরক্ষা মিশনটি রাজনৈতিক, নিরাপত্তা সম্পর্কিত, অর্থনৈতিক এবং সামরিক বাহিনীর মান নির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সাথে জড়িত। গুরুত্বপূর্ণ এ কার্যক্রম সম্পর্কে সামরিক অঙ্গনে বিচার-বিশ্লেষণ করা হলেও এর উপর সামাজিক গবেষণায় আলোচনার স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়। যে সকল বইপত্র পাওয়া যায় তা মূলত শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত সমর কৌশল, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা সংস্কৃতি ও ভাষার প্রচলন সংক্রান্ত গল্প, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণে বিভিন্ন টেকনিক্যাল দিক, নির্মাণ কৌশল, অস্ত্র উদ্ধার, মাইন অপসারণ বা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা সংক্রান্ত কিংবা মিশনসমূহের প্রশাসনিক ও সামরিক সফলতার বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। কিন্তু, শান্তি মিশনের মূল যে লক্ষ শান্তি স্থাপনপূর্বক একটি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা– যেখানে আইনের শাসন, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়নসহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাভাবিক কার্য পরিচালনার মাধ্যমে স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বা হবে এ দিকটি নিয়ে গবেষণার অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান গবেষণা এ দিকটি নিয়ে আলোচনার করার দাবি রাখে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্লেষণে মিশনে অংশগ্রহণের পটভূমি, যৌক্তিকতা, কার্যক্রমের ধরন বিশেষ করে একটি সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সুষ্ঠ নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের হাতে দায়িত্ব অর্পনের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিরোধের সমাধানের জন্য স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা এবং কৌশল বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনার একটি নির্মোহ আলোচনা এ গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে। শান্তিরক্ষা মিশনে নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অবদান বিশ্লেষণের পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর আগামী চতুর্থ প্রজন্মের শান্তি মিশনের সম্ভাবনার দিকটির সমন্বিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক

উন্নয়ন, সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও শান্তি মিশনে টেকসই অংশগ্রহণের সাথে এ গবেষণা কর্মটি যুক্তিযুক্ত।

১.৫ গবেষণার আওতা

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি বহুজাতিক ও একাধিক কার্যক্রমের সমষ্টি এবং একটি সমন্বিত উদ্যোগ। এ কাজের ব্যাপকতা বিস্তৃত এবং বহুমাত্রিক। জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুসারে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বৃহৎ দৃষ্টিতে ছয়টি – কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা; সংঘাত প্রতিরোধ করা; আইনের শাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; মানবাধিকার উন্নত করা; নারীর ক্ষমতায়ন ও মাঠ পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান করা। শান্তিরক্ষায় সেনা প্রেরণকারী যে কোন রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা নিরূপন ও বিশ্লেষণ করা একটি বৃহৎ, জটিল এবং সময় সাপেক্ষ বিষয়। কেননা, উপরোক্ত প্রতিটি কার্যক্রমই এক একটি বিস্তৃত কর্মযজ্ঞ এবং এসব কাজের সাথে সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক রাজনীতিসহ সমরবিদ্যার ক্ষেত্র জড়িত। ফলে, গবেষণার সময়, তথ্যের প্রাপ্ততা ও সহজলভ্যতা, গবেষণার উদ্দেশ্য এবং রাজনীতি বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে এ গবেষণায় নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান র্নিমাণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকাকে শুধু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং আলোচনার প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়গুলোকে যৌক্তিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে বহুজাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রে সকল পক্ষকে আস্থায় নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যন্ত দুরুহ কাজ। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো, প্রাক-নির্বাচন, নির্বাচনকালীন (নির্বাচনের দিন) এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক চর্চারও পরিবেশ নিশ্চিত করতে হয়।

এ পর্যায়ে আমরা ‘গণতন্ত্রায়ণ’ এবং ‘শান্তিরক্ষা’ ধারণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে চলমান গবেষণাটির জন্য একটি তাত্ত্বিক কাঠামো উত্থাপন করবো।

১.৬ গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তিরক্ষা মিশন

গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তি স্থাপনের তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই কিছু প্রত্যয় (concept) সর্ম্পকে ধারণা প্রয়োজন। যেমন– শান্তি, শান্তিরক্ষা, বহুমাত্রিক শান্তিরক্ষা, গণতন্ত্র, গণতন্ত্রায়ণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এ বিষয়গুলি সর্ম্পকে ধারণা প্রয়োজন।

শান্তি

শান্তি সমাজ সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সংঘর্ষ বা সাংঘর্ষিক আচরণ থাকবেনা। এটি সামাজিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি থেকে সমাজকে মুক্ত রাখে। জোহান গালতুং এর মতে, শান্তি হচ্ছে একটা সম্পর্ক। এই সম্পর্কটা হতে পারে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে। পক্ষগুলো ব্যক্তি, জাতি, জাতিরাষ্ট্র, কিংবা অঞ্চলের মধ্যে হতে পারে। এটি কোন একক পক্ষের সম্পদ নয়। যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সবারই সম্পদ। গালতুং শান্তির ক্ষেত্রে 'সম্পর্ক' নিরুপনে তিন ধরনের সম্পর্কের কথা বলেছেন[১৬]-

ক. ইতিবাচক সম্পর্ক – ইতিবাচক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হৃদ্যতা থাকে। এটি একজনের জন্য ভালো হলেও সবার জন্য খারাপ।

খ. নেতিবাচক সম্পর্ক – নেতিবাচক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হৃদ্যতা কম থাকে। এটি এমন একটি সম্পর্ক যা একজনের জন্য খারাপ কিন্তু সবার জন্য ভালো।

গ. উদাসীন সম্পর্ক – উদাসীন সম্পর্কটা কারো জন্য ভালোও নয় আবার মন্দও নয়। তাই এটি তেমন একটা গ্রহণযোগ্য সম্পর্ক নয়।

সম্পর্কের ভিন্নতার নিরিখে শান্তি অধ্যয়নে আমরা তিন ধরনের অধ্যয়ন দেখতে পাই, নেতিবাচক শান্তি অধ্যয়নে কীভাবে নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করা যায় সেটিকে গুরুত্বারোপ করে, ইতিবাচক শান্তি অধ্যয়ন কীভাবে ঐক্যভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি করা যায় সেটিকে গুরুত্বারোপ করে এবং সন্ত্রাস যুদ্ধ অস্ত্র অধ্যয়ন কীভাবে ক্ষতির পরিমাণটা কমানো যায় তার সক্ষমতা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে।

গালতুং দেখিয়েছেন কীভাবে সংঘাত থেকে শান্তি এবং শান্তি থেকে আবার সংঘাত সংগঠিত হয়[১৭]। গালতুং সংঘাতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংঘাত এ দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রত্যক্ষ সংঘাতে ব্যক্তি সরাসরি শারীরিকভাবে আক্রমণের শিকার হয়। এ ধরনের সংঘাত হলো – রায়ট, দাঙ্গা, সন্ত্রাস, জঙ্গি ও ব্যক্তিগত আক্রমন ইত্যাদি। একে ব্যক্তিগত সংঘাত বলা হয়। অপর দিকে পরোক্ষ সংঘাত হলো সমাজের কাঠামোগত বিন্যাসের কারণে ব্যক্তি যখন সন্ত্রাসের শিকার হয়। এ ধরনের সংঘাতের উদাহরণ হলো – সমাজে বিদ্যমান দারিদ্রতা, ক্ষুধা, বৈষম্য, সামাজিক অবিচার, সম্পদের অসম বন্টন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসন, বর্ণ বৈষম্য ইত্যাদি কারণে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সমাজ যখন সংঘাতের শিকার হয়। এ ধরনের সংঘাত কাঠামোগত সংঘাত হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যক্ষ/ব্যক্তিগত সংঘাতের অনুপস্থিতিকে নেতিবাচক শান্তি এবং পরোক্ষ/কাঠামোগত সন্ত্রাসের উপস্থিতিকে ইতিবাচক শান্তি বলে গালতুং আখ্যায়িত করেছেন। এ দুয়ের কোন একটির অনুপস্থিতিকে শান্তি বলা যায় না[১৮]। অর্থাৎ, ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ের সংমিশ্রণে শান্তি অর্জিত হয়। বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায় –

নেতিবাচক শান্তি + ইতিবাচক শান্তি = শান্তি।

সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্য হতে সৃষ্ট পরোক্ষ দ্বন্দ্ব কাঠামোগত সংঘাতে পরিণত হয় এবং চূড়ান্তভাবে ব্যক্তি সরাসরি এ কাঠামোগত সংঘাতের শিকার হয়। অর্থাৎ যা ছিলো সাংস্কৃতিক (পরোক্ষ) সংঘাত এবং ব্যক্তি এ সংঘাত থেকে দূরে ছিলো কিন্তু সাংস্কৃতিক এ সংঘাত যখন কাঠামোগত সংঘাতে রূপান্তরিত হলো তখনই ব্যক্তি সরাসরি এ সংঘাত দ্বারা আক্রমণের শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ পরোক্ষ সংঘাত প্রত্যক্ষ সংঘাতে রূপান্তরিত হলো। অন্যভাবে বলা যায়, কাঠামোগত সন্ত্রাস থেকে সরাসরি সংঘাত সৃষ্টি হয়। আজ যা পরোক্ষ সংঘাত বলে মনে হচ্ছে আগামীতে তা প্রত্যক্ষ সংঘাত হতে পারে, যদি না কাঠামোগত রূপান্তর বন্ধ করা বা আটকানো না যায়। পৃথিবীব্যাপি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে যে সন্ত্রাস তা কাঠামোগত সন্ত্রাস। এতে ব্যক্তি সরাসরি আঘাতপ্রাপ্ত হয়না কিন্তু কাঠামোগত কারণে সে সন্ত্রাসের স্বীকার হয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য সমাজের/রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন তথা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ ও সক্ষমতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে এ শান্তি অর্জিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি অধিকতর অসামরিক। আবার এ সংঘাত যখন সরাসরি সংঘাতে রূপান্তরিত হয় তখন

ব্যক্তি মানুষকে রক্ষার জন্য সামরিক পন্থা শান্তি অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাংস্কৃতিক সংঘাত বা সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ সংঘাতে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে আমরা নিম্নোক্ত ভাবে দেখাতে পারি[১৯]-

চিত্র ১.১: **সহিংসতার প্রবাহ**

চিত্র ১.২: সহিংসতা ও শান্তির বিস্তৃত ধারণা

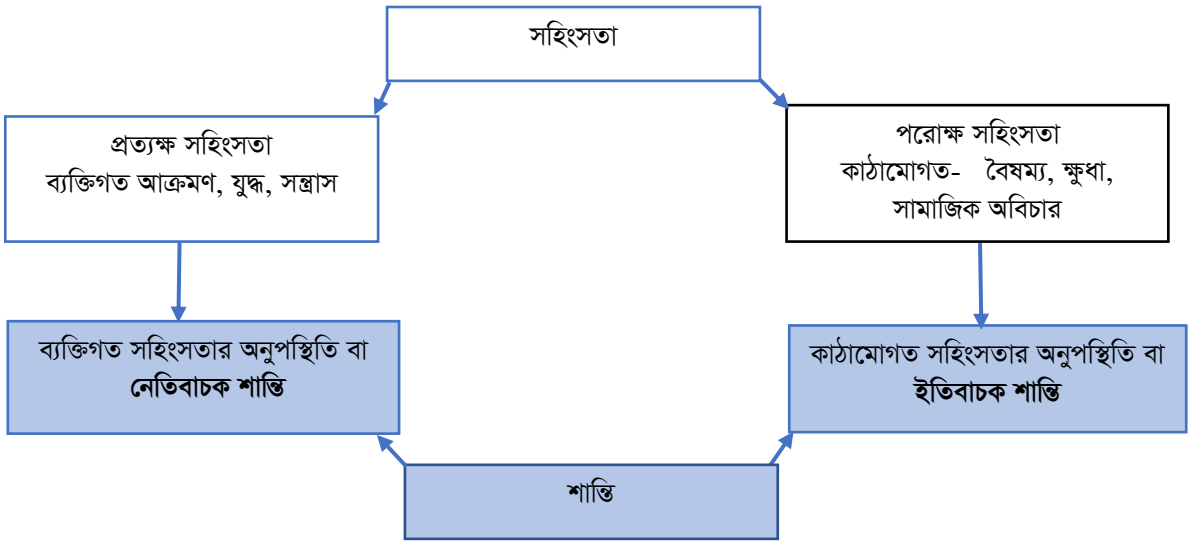

সুত্র: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

গালতুং প্রত্যক্ষ, কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক সহিংসতার ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক বুঝাতে গিয়ে ক্ষমতা'র ধারণা ব্যবহার করেন এবং চার ধরনের ক্ষমতার মাত্রা (সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক) চিহ্নিত করেন যা ইতিবাচক ও নেতিবাচক শান্তিকে প্রভাবিত করে। আর সহিংসতার এ ত্রিভুজ সম্পর্ক নিরসনের

ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় কাঠামোগত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের কাঠামোকে পরিবর্তন করবে এবং কাঠামোগত শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবে। এভাবেই অসামরিক পন্থায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাঠামোগত সহিংসতা রোধ করে ইতিবাচক শান্তি অর্জিত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ সহিংসতা রোধে সামরিক পন্থা অবলম্বন বিকল্পহীন।

বর্তমান বিশ্বে মালি, কঙ্গো, সুদান এবং দক্ষিণ সুদানসহ বিভিন্ন দেশে সংঘাত সহিংসতার মূলে রয়েছে সম্পদের ভাগাভাগি, ধর্মীয় বিভেদ, সংস্কৃতিগত পার্থক্য কিংবা অন্যভাবে বলা যায় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব । এ দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণে যেমন কাঠামোগত সহিংসতা রোধে প্রাতিষ্ঠানিক পন্থা (অসামরিক) অবলম্বন করা হয়, তেমনি ব্যক্তিগত সহিংসতা রোধে সশস্ত্র পন্থাও ব্যবহৃত হয়।

শান্তিরক্ষা (peacekeeping): সংঘর্ষ থেকে শান্তি অর্জনের লক্ষে সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে জাতিসংঘ শান্তি বাহিনী মোতায়েন করে গ্রুপ/দলগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বিরতি বজায় রেখে দেশটিতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে শান্তিরক্ষা বলে। প্রথাগত শান্তিরক্ষা সাধারণত যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ, নিরপেক্ষ অঞ্চল রক্ষা, সংঘর্ষে লিপ্ত দুই অংশে বিভক্ত রাখা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বহুমাত্রিক শান্তিরক্ষা (multidimensional peacekeeping): বহুমাত্রিক শান্তিরক্ষা অভিযান কেবল শান্তি ও নিরাপত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং বৃহৎ দৃষ্টিকোণ হতে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রক্রিয়া সচল করা, নিরস্ত্রীকরণ, পুনর্নির্মাণ ও প্রাক্তন যোদ্ধাদের পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, নির্বাচন অনুষ্ঠান সমর্থন, মানবাধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন পুনরুদ্ধারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

শান্তি স্থাপন (peacebuilding): শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আইনানুগ কাঠামো গড়ে তোলাকে বুঝায়, যা চর্চার মাধ্যমে সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্র জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ/ সাহায্য ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদী ও টেকসই স্থিতিশীল শান্তি অর্জন করে। এ কাঠামো

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মানবিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে।

গণতন্ত্র: বিংশ শতাব্দির গোঁড়ার দিক থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক সরকার বিশ্বে সর্বত্র জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্র বলতে কোন জাতিরাষ্ট্রের এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে নীতিনির্ধারণ ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের সমান ভোটাধিকার থাকে। এ শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন, মানবাধিকার, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের স্বাধীনতা রাষ্ট্র সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করে। এ শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা এক বা মুষ্ঠিমেয় লোকের হাতে না থেকে জনগণের নির্বাচিত বা সমর্থিত প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত থাকে ।

এ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ। রাষ্ট্র ক্ষমতায় জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে যে প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় তাই গণতন্ত্র। এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় জনমত দ্বারা। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে গঠিত ও পরিচালিত সরকার। গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক সাম্যের মতো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য, মানবাধিকার, আইনের শাসন, নারীর সমঅংশগ্রহণ এবং নাগরিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

গণতন্ত্রায়ণ (Democratization): গণতন্ত্রায়ণ হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কর্মকান্ডের অনুশীলন হচ্ছে গণতন্ত্রায়ণ। গণতন্ত্রকে সুষ্ঠ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করাকে গণতন্ত্রায়ণ বলে। জনগণের সার্বভৌমিকতা, রাজনৈতিক সাম্য ও জনগণের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়াটি হলো গণতন্ত্রায়ণ। গণতন্ত্রায়ণের ফলে জনগণ সরকার গঠনসহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। জনগণের ভোটাধিকার, প্রার্থী হওয়ার অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার, আন্দোলন, বিক্ষোভ, সভা সমিতির অধিকার প্রতিষ্ঠার চর্চার সুযোগ থাকে তখন আমরা বলতে পারি ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রে গণতন্ত্রায়ণের পথ সুগম রয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে গণতন্ত্রায়ণ হচ্ছে কিনা

তা তিনটি পরিমাপক দ্বারা যাচাই করা হয়ে থাকে – ক. নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান; খ. রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (নির্বাচন কমিশন, আইনসভা, বিচার ব্যবস্থা, গণমাধ্যম ইত্যাদি) উপস্থিতি এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার স্বক্ষমতা আছে কিনা এবং গ. সংবিধান মেনে চলা তথা আইনের শাসন ও মানবাধিকার চর্চা হচ্ছে কিনা[২০]।

গণতন্ত্রায়ণের লক্ষ যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে তা হলো সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়ের সাথে যুক্ত রয়েছে জনগণের উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের আগ্রহ। রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনসম্পৃক্তা এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার আন্তঃ ও অন্তঃরাষ্ট্রীয় সকল সমস্যা সামধানে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ গণতন্ত্রায়ণকে নিদের্শ করে। জনগণের এই অধিকার বাস্তবায়নের ফলেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্রায়ণ ঘটে। সাংবিধানিক শাসনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ করার মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ণের সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রায়ণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী হলো – সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, প্রতিনিধিত্বকমূলক সরকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সরকারের দায়িত্বশীলতা, আইনের অনুশাসন ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। এগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই গণতন্ত্রায়ণ কার্যকর করা সম্ভবপর। অর্থাৎ গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা, কার্যকর করা, গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে ফলপ্রসূ করে তোলাই হলো গণতন্ত্রায়ণ।

১.৬.১ গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তিস্থাপনের তাত্ত্বিক কাঠামো

সংঘাতে লিপ্ত দেশগুলোকে সংর্ঘষ থেকে শান্তির দিকে যাত্রায় জাতিসংঘের অন্যতম কার্যকর পদক্ষেপ হলো শান্তিরক্ষা (Peacekeeping)। শান্তিরক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো – বৈধতা, দায় বা বোঝা ভাগাভাগি এবং বিশ্বজুড়ে সেনা ও পুলিশ মোতায়েন এবং বেসামরিক শান্তিরক্ষীদের একীভূত করে শান্তিরক্ষার বহুমাত্রিক ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন। দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত দেশগুলোকে সংঘাত থেকে শান্তিতে আনয়ন প্রক্রিয়া কঠিন ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন নিরাপত্তা, রাজনৈতিক চর্চার সুযোগ সৃষ্টি এবং শান্তি নির্মাণ এর মাধ্যমে এ কঠিন ও ভঙ্গুর পথ অতিক্রম করে। বিগত শতাব্দীর ঠান্ডাযুদ্ধ পরবর্তী এ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংঘাতপরবর্তী রাষ্ট্রে শান্তিরক্ষা, রাষ্ট্রগঠন, গণতন্ত্রায়ণ ও নির্বাচন

অনুষ্ঠানে সহযোগিতার বিস্তৃতি লক্ষণীয়। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক ভাবে গণতন্ত্রায়ণে সহযোগিতা সশস্ত্র দ্বন্দ্বের পরে রূপান্তর পর্যায়গুলোর একটি অন্যতম মূল উপাদান। এ সহায়তায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের গণতান্ত্রিক সহযোগিতা একটি চলমান কার্য যা বিভিন্ন রাষ্ট্র গ্রহণ করে। এ সহযোগিতা সংঘর্ষ ও সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্র বা স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হতে গণতান্ত্রিক উত্তরণে হতে পারে, তেমনি বিকাশমান গণতান্ত্রিক দেশে নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানে এ সহযোগিতা হতে পারে। সদস্য রাষ্ট্রের নিকট হতে জাতিসংঘে নির্বাচন কেন্দ্রিক সহযোগিতার প্রস্তাব প্রেরণ এবং এর প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সমর্থন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, জাতিসংঘের দুটি সংস্থার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও তত্ত্বাবধানে বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক উত্তরণে জাতিসংঘ সহযোগিতা করে[২১]। প্রথমটি হলো – জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর (United Nations Development Program, UNDP) আওতায় এবং দ্বিতীয়টি হলো নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেটের আলোকে সংঘাতপূর্ণ দেশে Department of Political and Peacebuilding Affairs এর তত্ত্বাবধানে শান্তি মিশন কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক উত্তরণে সহযোগিতা। বিশ্বব্যাপী নির্বাচন পরিচালনায় UNDP'র সহযোগিতা বিকাশমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের চলমান প্রচেষ্টা। যা বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয়ভুক্ত নয়। বর্তমান গবেষণায় DPPA এর তত্ত্বাবধানে জাতিসংঘ শান্তিমিশন কীভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণের সহযোগিতা করছে তা আলোচনার প্রতিপাদ্য।

১৯৯০- এর দশক থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সময়ে মিশনগুলির প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম দিকে শান্তি মিশনের লক্ষ ছিল শান্তিরক্ষা কিন্তু বর্তমান শান্তি মিশন শান্তিরক্ষার চেয়ে শান্তি স্থাপনে (Peace building) অধিকতর মনোযোগী, এ লক্ষে সামরিক শক্তির পরিবর্তে ব্যাপক ও বিস্তৃত অসামরিক পদ্ধতি অনুসরণ করে [২২]। বর্তমান বহুমাত্রিক মিশনগুলো শুধুমাত্র সহিংসতা সমাপ্ত করে না বরঞ্চ একটি কাঠামো তৈরি করে সহিংসতার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক তা নিরসন করে স্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপন করে। শান্তি স্থাপনের জন্য অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, মানবাধিকার সুরক্ষা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ তৈরি, আইনের শাসন এবং শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে এসে পুর্নমিলন এবং সশস্ত্র যোদ্ধাদের সশস্ত্র সংঘাত হতে ফিরিয়ে স্বাভাবিক সমাজে বসবাসের একীকরণ (Integration) এর মাধ্যমে একটি টেকসই শান্তি কাঠামো বির্নিমাণ করে[২৩]। বহুমাত্রিক মিশনের

কার্যক্রমে আমরা এমন কিছু উপাদান পাই যেগুলো গণতন্ত্রায়ণের উপাদানের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। যেমন – মানবাধিকার রক্ষা, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবেশ তৈরি, আইনের শাসন ইত্যাদি।

গণতান্ত্রিকীকরণ শান্তি স্থাপনের একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান[২৪]। এ উপাদানটি শুধুমাত্র যুদ্ধপরবর্তী সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে শান্তিতে রূপান্তরকে বুঝায় না, অধিকতরভাবে অগণতান্ত্রিক শাসন থেকে অধিকতর গণতান্ত্রিক শাসনে উত্তরণকে বুঝায়। শান্তি স্থাপনের এ কৌশলটিতে ধরে নেয়া হয় যে সরকারের অন্যান্য ধরনের চেয়ে (forms of government) গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির অনুশীলন অধিকতর শান্তিপূর্ণ। এ ধরনের সরকার পদ্ধতিতে বহুমত, মানবাধিকার, সমঅংশগ্রহণসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে। এ ব্যবস্থা উদারনৈতিক শান্তি তত্ত্ব (Liberal peace theory) দ্বারা সমর্থিত। ১৯৯২ সালে বুট্রোস বুট্রোস ঘালি প্রস্তাবিত Agenda for Peace প্রস্তাবনায় শান্তি স্থাপন (Peace building) প্রত্যয়টির অর্ন্তভুক্তির মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের চর্চা শুরু হয়। সে থেকে গণতন্ত্রকে জোরদার করা শান্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে রাজনীতি ও সমরবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৯১ সালে সাধারণ পরিষদে 'নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচি' গ্রহণের পর হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা সংঘাত-পরবর্তী দেশে নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরি, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা জোরদার করতে সুশীল সমাজকে সমর্থন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রচার, সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। এ লক্ষ অর্জনে শান্তিরক্ষা মিশনের অন্যতম প্রচেষ্টা থাকে তাদের উপর অর্পিত ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংঘাতপূর্ণ সমাজে সরকার, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনগণকে গণতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা[২৫]। ১৯৯১ সালের পর হতে কোসোভো, পূর্ব তিমুর, আফগানিস্তান, সুদান, কঙ্গো, হাইতিসহ ৩২টি মিশনে গণতান্ত্রিকীকরণকে মিশনের ম্যান্ডেটভুক্ত করা হয়েছে।

এ শান্তিমিশনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকরণের পদ্ধতির সমালোচনায় বলা হয়, গণতন্ত্র শান্তি স্থাপনের একমাত্র কৌশল নয়। গণতান্ত্রিকীকরণ অনেক সময় সাপেক্ষ, যা শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাঁগ্রস্ত করে। তাছাড়া, নির্বাচনে জয়ী ও পরাজিত গ্রুপগুলোর মধ্যে শত্রুতা ও সহিংসতা বৃদ্ধি পায় যা পুনরায় সংঘাত সৃষ্টি করে

এবং গৃহযুদ্ধের কারণ হয়। তবে এটি সত্য যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই একমাত্র শাসন ব্যবস্থা যা অন্যান্য সকল শাসন ব্যবস্থা থেকে অধিকতর শান্তি স্থাপক[২৬]। কারণ, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত নিরসনই গণতন্ত্র।

বিগত তিন দশকের নির্বাচন ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনগুলোর প্রকৃতি ও কৌশল বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন গবেষক ও সমাজবিজ্ঞনী দ্বন্দ্বে লিপ্ত দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দুটি পদ্ধতি চিহ্নিত করেছেন[২৭]-

১. অগ্রাধিকার পদ্ধতি (prioritize approach): সংঘাত পরবর্তী রূপান্তর পর্যায়ে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধে বাইরের সমর্থন গণতন্ত্রের উপরে শান্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে ।
২. ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি (gradualist approach): সংঘাত-পরবর্তী রূপান্তর পর্যায়ে, কার্যকরভাবে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধে বাইরের সমর্থন গণতন্ত্রের উপর শান্তিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সমান্তরালভাবে শান্তি এবং গণতন্ত্র উভয়কেই সমর্থন করে।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে শান্তি মিশন সর্বাগ্রে শান্তিরক্ষাকে গুরুত্ব আরোপ করে। অর্থাৎ আগে শান্তি পরে গণতন্ত্রায়ণ। এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে, সংঘাতপূর্ণ দেশে অনেকগুলো গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী, দল, উপদল ও সন্ত্রাসীগোষ্ঠী সংঘাতে লিপ্ত থাকে। এসব দল ও গোষ্ঠীগুলোকে সহজেই নির্বাচনে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। এটি সময় সাপেক্ষ এবং সাধারণ জনগণের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। প্রথমে শান্তি অর্জিত হলে অর্থাৎ সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ হলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন পরবর্তীতে অর্জিত হবে। তবে, শান্তি ও রাষ্ট্র গঠনে স্থিতিস্থাপকতা অবশ্যই দরকার কিন্তু তা গণতন্ত্রায়ণের একমাত্র শর্ত নয়[২৮]। এ পদ্ধতিটি দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি স্থাপনে টেকসই নয় বলে সমালোচিত। কেননা, এ পদ্ধতি দ্বন্দ্বপূর্ণ রাষ্ট্রে নিজস্ব কোন শান্তি কাঠামো গড়ে উঠে না, যার মাধ্যমে স্থানীয় অংশগ্রহণে নিজস্ব শান্তি কাঠোমো ও শান্তি চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই শান্তি অর্জিত হবে।

অপর দিকে, দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে শান্তি ও গণতন্ত্রায়ণ একই সাথে ধীরে ধীরে অর্জনের পক্ষপাতি। এ ঘরানার তাত্ত্বিকদের মতে, গণতন্ত্র শান্তির একটি মূল উপাদান। গণতন্ত্র শক্তিশালী হলে শান্তি টেকসই

হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্র স্বাধীন চলক এবং শান্তি পরাধীন চলক। এ লক্ষে গণতন্ত্র শক্তিশালী করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। শান্তি অর্জনের জন্য যেমন সংঘাতে লিপ্ত দল ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শান্তিরক্ষা (যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা) জরুরী, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সংঘাতের কারণ অনুসন্ধান ও নিরসন জরুরী। এ জন্য উভয় কার্য - গণতান্ত্রিকীকরণ ও শান্তি স্থাপন একই সাথে ধীরে ধীরে পরিচালনা করা হয়। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে গড়ে উঠা নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সংঘাত সমাধানের মাধ্যম হিসেবে গণতান্ত্রিকীকরণ কাজ করে।

এ ক্ষেত্রে নির্বাচন হচ্ছে রাজনৈতিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দ্বন্দ্বে লিপ্ত দেশের জনগণকে নিজস্ব নেতৃত্ব এবং সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করে। নির্বাচনের মাধ্যমে সমর্থিত সরকার ব্যবস্থায় মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্র গঠন ও গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে, প্রতিষ্ঠিত হয় টেকসই শান্তি কাঠামো[২৯]। নির্বাচন গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বন্দ্বোত্তর রাষ্ট্রে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণে তিনটি বিষয়ের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে[৩০] -

১.রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন (Development of Political System)

২. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (State Institution Building)

৩. নাগরিক সমাজ শক্তিশালীকরণ (Strengthening of Civil Society)

এ তিনটি অধিক্ষেত্রের আওতায় যেসব বিষয়কে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার পরিমাপক টেবিলে-১ এ দেখানো হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায়, দ্বন্দ্ব বা সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে শান্তি মিশন কর্তৃক নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত মিশন বাস্তবায়নে অনুসৃত কৌশলের (নাগরিক অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষা এবং নির্বাচন

অনুষ্ঠান) আওতাভুক্ত কার্যক্রম এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণে বাহ্যিক সমর্থনের অধিক্ষেত্রের কার্যক্রমের মধ্যে সাদৃশ্য ও উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে। শান্তি মিশন কর্তৃক শান্তিরক্ষা তথা যুদ্ধ বিরতি বজায় রেখে একই সাথে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন নির্বাচন কমিশন গঠন, মানবাধিকার, আইনের শাসন, প্রশাসনিক কাঠামো বিনির্মাণের কার্যক্রম পরিচালনা কার্যত উদারনৈতিক শান্তি তত্ত্বের ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি (Gradualist approach) কে নির্দেশ করে। বর্তমান বহুমাত্রিক শান্তি মিশনে শান্তি রক্ষার চেয়ে স্থায়ী শান্তি স্থাপনকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে, সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে নিজস্ব একটি শান্তি কাঠামো গড়ে উঠে এবং এ কাঠামোতে স্বীয় পছন্দনীয় পন্থায় শান্তি চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী টেকসই শান্তি অর্জিত হয়।

টেবিল – ১

দ্বন্দ্ব উত্তর রাষ্ট্রে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের পরিমাপকসমূহ[৩১]

	Starting point	**পরিমাপক (Measures)**
গণতন্ত্রকরণের বাহ্যিক সমর্থনের অধিক্ষেত্র	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ	• সংবিধান রচনায় পরামর্শদান (advice in writing constitution) • আইনের শাসনকে জোরদার করা: আইন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারে সহায়তা, আইন বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ • প্রশাসনকে সহায়তা: আমলাতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান • মানবাধিকার জোরদার করা: পর্যবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা নিরাপত্তা খাত সংস্কার সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সংস্কার ও বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ
	রাজনৈতিক ব্যবস্থা	• নির্বাচন সমর্থন: ভোটার নিবন্ধনে সহায়তা, নির্বাচন কমিশন তৈরি, নির্বাচন অফিসারদের প্রশিক্ষণ, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, রাজনৈতিক দলের উন্নয়ন
	নাগরিক সমাজ ও মিডিয়া	• নাগরিক সমাজকে উৎসাহিত করা: নারী ও যুব সংস্থাগুলির পাশাপাশি মানবাধিকার গ্রুপ, স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন এবং মিডিয়া সমর্থন; রাজনৈতিক শিক্ষা; এবং বিনিময় কর্মসূচী

এ প্রেক্ষিতে নিম্নের ছকে শান্তি স্থাপন কার্যক্রম এবং গণতন্ত্রায়ণ কার্যক্রমের সমন্বয়ে বর্তমান গবেষণার জন্য একটি বিশ্লেষণধর্মী কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ধরে নেয়া হয়েছে, গণতান্ত্রিকীকরণ শান্তি স্থাপনের একটি মৌলিক উপাদান। গণতান্ত্রিকীকরণ স্বাধীন চলক, এটির চর্চা ও অনুসৃত কার্যক্রম তথা – নির্বাচন কমিশনসহ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, রাজনৈতিক দল শক্তিশালীকরণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন,

নির্বাচন অনুষ্ঠান, ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক স্থানান্তর, আইন শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার সুরক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের টেকসই বাস্তবায়ন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক। সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উত্তরণে সাহায্য করবে এবং মিশনের সমাপ্তি ঘটবে। বলা যায়, শান্তি মিশনের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের সক্ষমতার মাত্রার উপর দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপন নির্ভর করে। অপর দিকে শান্তি মিশন এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, ফলে মিশন ব্যর্থ হয় এবং পুনরায় নতুন করে সংঘাতের সূত্রপাতের ফলে নতুন মিশনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

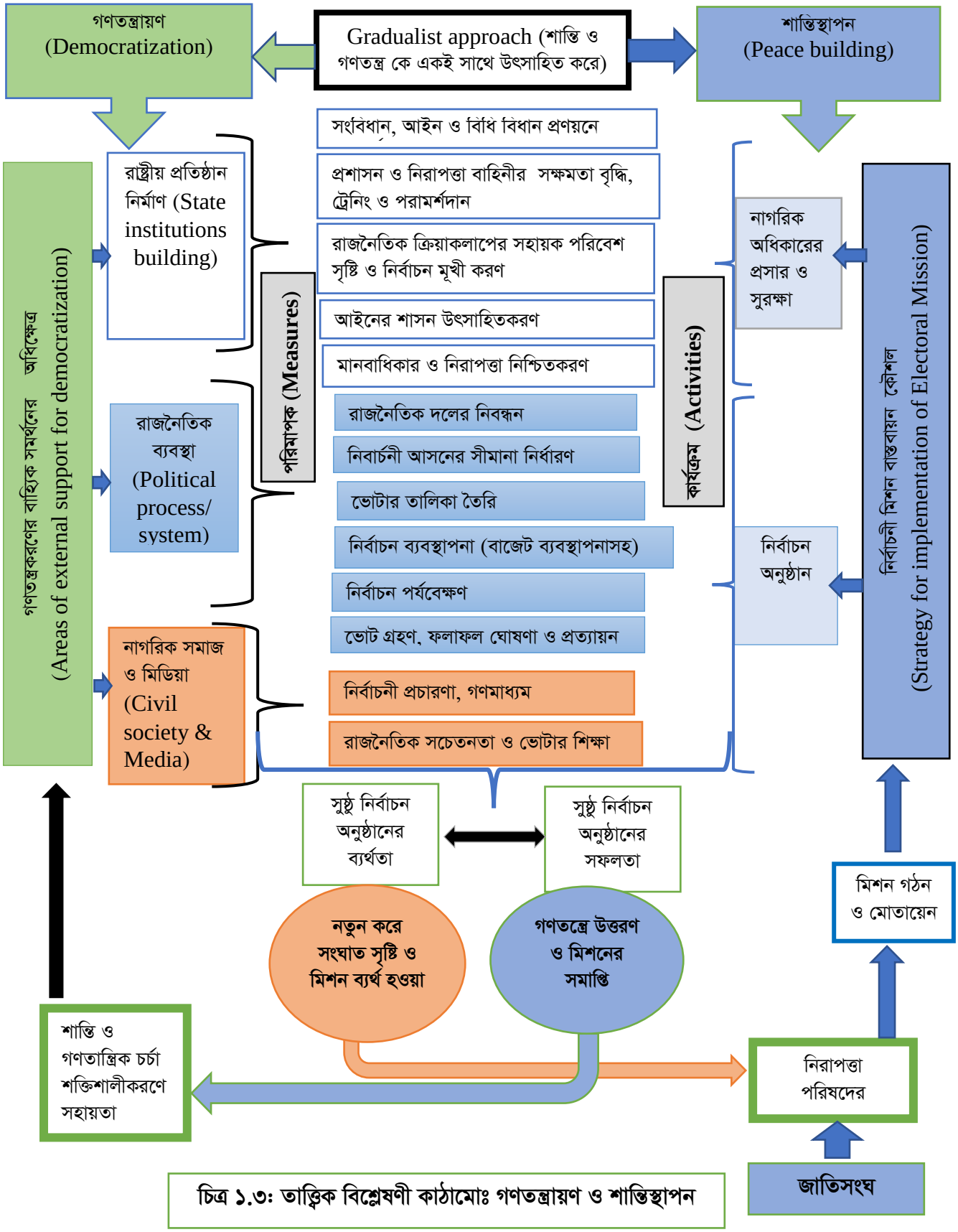

চিত্র ১.৩: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী কাঠামোঃ গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তিস্থাপন

১.৭ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার তথ্য সংগ্রহে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে 'বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি' (content analysis) অনুসরণ করা হয়েছে এবং ঘটনার ব্যপ্তি ও প্রকৃতি বুঝানোর জন্য 'কেস স্টাডি পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা দেশের বাহিরে পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত। ঐ সকল সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্র, সমাজ তথা সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী হতে সরাসরি প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ বা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ঝুঁকিপূর্ণ, ব্যয়বহুল, সময়-সাপেক্ষসহ কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বাঁধা-নিষেধের কারণে বাস্তব সম্মত নয়। তাই, গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মাধ্যমিক উৎস (secondary source) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তথ্যের উৎস (primary source) হিসেবে শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তিনটি পৃথক ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম ধাপঃ গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিবেদন, প্রস্তাবনা, মিশন বিবৃতি ও ম্যান্ডেট, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন নথি, প্রতিবেদন, একাডেমিক প্রবন্ধ, বই-পুস্তক, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত ও পরিবেশিত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য 'বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি' অনুসরণ করে শ্রেণীবদ্ধকরণ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপঃ বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৫৪টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। এই মিশন হতে যেসকল মিশন নির্বাচন পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠান বির্নিমাণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তারই মধ্যে ২৬টি[৩২] মিশন নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন মাধ্যমিক তথ্য হতে বাছাইকৃত মিশনসংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসকল মিশন হতে ১টি মিশনকে কেস (UNMIS) হিসেবে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেস নির্ধারণের ক্ষেত্রে

মিশনের ব্যাপ্তি, গুরুত্ব, কার্যক্রমের ধরণ, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের দায়িত্বের ব্যাপ্তি এবং তথ্যের সহজলভ্যতা বিবেচনা করে হয়েছে।

তৃতীয় ধাপ: কেস হতে প্রাপ্ত তথ্য ও মাধ্যমিক তথ্য বিশ্লেষণ পরবর্তী প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের জন্য শান্তিমিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ সদস্য (বর্তমানে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত) ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২৬ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (তালিকা, পরিশিষ্ট-১)। এছাড়া, সেনা সদর দপ্তর হতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লিখিত আকারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অডিও রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকারসমূহকে লিখিতভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির আলোকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহকে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ, কেস স্টাডি, মাধ্যমিক তথ্যের ফলাফল এবং বিশেষজ্ঞ তথ্য দাতাদের মতামত triangulation করে গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বিশ্লেষণপূর্বক অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে।

কেস নির্ধারণ

বর্তমান গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো – শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে (যেমন- নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, আইনসভা ইত্যাদি) নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। সংঘাতগ্রস্ত রাষ্ট্রে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন পরিচালনা ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক গুলো ধাপ বা কার্য অনুসরণ করতে হয় – যেমন, মুক্ত রাজনীতি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা; সংঘর্ষে লিপ্ত গ্রুপ বা দলগুলোকে নির্বাচনমুখী করা; যুদ্ধ বিরতি স্থিতিবস্থা বজায় রাখা; বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ – যেমন নির্বাচন কমিশন গঠন; ভোটার তালিকা প্রণয়ন; নির্বাচনী আসনের সীমা নির্ধারণ; নির্বাচনী প্রচারণা ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা; অবাধ ও সুষ্ঠূ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি; নারী, প্রতিবন্ধি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণসহ নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় কেস নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য দু'টি নির্ণায়ক হলো[৩৩]- কেসটি গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট কী না এবং এক বা একাধিক কেসগুলো গবেষণার সাধারণীকরণের জন্য যথেষ্ট কী না? বর্তমান গবেষণার কেস পছন্দের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রথমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণকৃত নির্বাচনী ম্যান্ডেট যুক্ত মিশনগুলোকে শ্রেণিকরণ করে দেখা যায়। বিগত ১৯৯১ সাল হতে ৩২টি নির্বাচনী ম্যান্ডেট যুক্ত মিশনের মধ্যে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা ২৬টি মিশনে অংশগ্রহণ করে[৩৪]। এ ২৬টি মিশনের মধ্যে কোন কোন মিশনে নির্বাচনী বিভিন্ন ধাপ বা কার্যগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সম্পৃক্ত ছিল। এখানে দেখা যায়, ২৬টি মিশনের মধ্যে অধিকাংশ মিশনে প্রাক-নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। আবার ১১টি মিশনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষে শান্তিরক্ষা মিশন চলমান। যেসব মিশনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে (যেমন – পূর্ব তিমুর, কঙ্গো, মালি, হাইতি) সেসব মিশনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা শুধু নির্বাচনকালীন মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছে (যেমন – কঙ্গো মিশনে নাগরিক সুরক্ষা ও যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পাশাপাশি শুধু নির্বাচনকালীন মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা) কিন্তু শুরু থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। মিশন ভেদে নির্বাচন পূর্ববর্তী বা নির্বাচনের দিন বা নির্বাচন পরবর্তী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা কোন কোন মিশনের দায়িত্ব থাকে। আবার কোন মিশনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব থাকে না, শুধু নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতের ম্যান্ডেট থাকে। এসব বিবেচনায় দেখা যায় বাংলাদেশ নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত যেসব মিশনে কাজ করেছে এর মধ্যে আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য ছিল, সুদান, কঙ্গো, পূর্ব তিমুর, মালি এবং হাইতি মিশন। সুদান ও পূর্ব তিমুরে গণভোটের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি, আইনের শাসন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বিষয় ম্যান্ডেটভুক্ত। কিন্তু, মালি ও কঙ্গোর নির্বাচন ছিল সাংবিধানিক জাতীয় নির্বাচন পরিচালনায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতার ম্যান্ডেটভুক্ত। আবার আইভরী কোস্টের নির্বাচনে মূল ভূমিকা পালন করে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) যেখানে শান্তিরক্ষীদের দায়িত্ব ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় দেশীয় বাহিনীকে সহযোগিতা এবং স্থিতিবস্থা বজায় রাখা। এ প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে এমন একটি কেস নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়, যে কেসে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মিশনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন পর্যন্ত কাজে সম্পৃক্ত ছিল এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান পরবর্তী গণতান্ত্রিক উত্তরণের মাধ্যমে মিশনের সমাপ্তি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখা

যায়, সুদানে তথা সুদান হতে দক্ষিণ সুদানের পৃথকীকরণের মিশন UNMIS এ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এছাড়া, এ মিশনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও নির্বাচন পরিচালনা উভয়ই ম্যান্ডেটভুক্ত।

শান্তিরক্ষা মিশনের প্রত্যেকটি মিশন পৃথক পৃথক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দিকটি বিশ্লেষণে কেস হিসেবে একাধিক কেস গ্রহণ করা হলে দেখা যায় সমজাতীয় কেস না হওয়ার কারণে তুলনামূলক বিশ্লেষণে পদ্ধতিগত দুর্বলতার ঝুঁকি থেকে যায়। আবার একাধিক মিশনে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে বাস্তবায়ন পর্যন্ত কাজে সম্পৃক্ততার ব্যাপ্তির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা নির্বাচনের মাঠ পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা ও সার্বিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করেছে, সেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অভিজ্ঞতার সুযোগ ছিল না।

এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণায় একাধিক কেস (multiple case study) এর পরিবর্তে একক কেস (single case study) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত মিশনটি সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণী একক (unit of analysis) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং কেস এর বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি (selecting the depth of the case) বিশ্লেষণে সমন্বিত কেস অধ্যয়ন পদ্ধতি[৩৫] (holistic case study approach) অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ, Embedded case study approach[৩৬] অনুসারে একাধিক মিশনের মধ্য হতে শুধু নির্বাচনী ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ করে গবেষণার সাধারণীকরণের চেষ্টা করা হলে এ ক্ষেত্রেও গবেষণার পদ্ধতিগত সমালোচনার ঝুঁকি থাকে। যেহেতু, নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত মিশনগুলোর প্রকৃতি এক নয় তেমনি মিশনগুলোতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের দায়িত্বের ধরন, অংশগ্রহণের হার, সময়, নির্বাচনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ততার বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তিও একই ধরনের নয়।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে একক কেস (single case study) হিসেবে সুদান হতে দক্ষিণ সুদানের পৃথকীকরণের মিশন UNMIS - কে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সমন্বিত কেস অধ্যয়ন পদ্ধতিতে

(holistic case study approach) কেসটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। UNMIS মিশনের শুরু হতে শেষ অবধি বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সম্পৃক্ত ছিল। অংশগ্রহণের দিক হতে মোট শান্তিরক্ষীদের প্রায় ৯৬.৯৭% ছিল বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী[৩৭]। সময়ের ব্যাপ্তিতে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে ছয় বছর বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা এ মিশনে কাজ করে। এ মিশনের বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন পর্যায় হতে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচনত্তোর আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও নিয়ন্ত্রণে জড়িত ছিল। নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে সুদানের গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দক্ষিণ সুদানের গণতান্ত্রিক যাত্রার মধ্য দিয়ে এ মিশনের পরিসমাপ্তি হয়। তাই একক কেস হিসেবে এ মিশন বিশ্লেষণের মাধ্যেমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকার সাধারণীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৮ গবেষণার ফলাফল

গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা শুধু অস্ত্র বা সামরিক শক্তি বা কৌশলের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তিরক্ষায় ভূমিকা রাখেনা বরঞ্চ সংঘাত পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এ ভূমিকাটি হলো পরোক্ষ। গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে না বা পায় না। এছাড়া নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রটি রাজনৈতিক ও বেসামরিক নেতৃত্বের উপর ন্যস্ত। তবে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের শান্তিপূর্ণ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে মূখ্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। যেমন নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোটার রেজিস্ট্রেশন, নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচন পরিচালনা, পর্যবেক্ষণসহ নির্বাচনকালীন ও নির্বাচনত্তোর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণে ভূমিকা রেখেছে। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জনে সচেতনতা তৈরি, বিভিন্ন গ্রুপগুলোকে সংঘাতের পরিবর্তে নির্বাচনমূখী করা, নির্বাচনী সরঞ্জামের সঠিক হেফাজত, অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণপূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে মাঠ পর্যায়ে সহায়তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে। সংঘাতপূর্ণ অবস্থা থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণে আপাত দৃষ্টিতে মিশন ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে শান্তিরক্ষীদের এ সফলতা লক্ষ্য করা

গেলেও দীর্ঘ মেয়াদে গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে শান্তি মিশনের এ অবদান মূল্যায়ণে আরো অধিকতর ও পুনঃপুন গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, বর্তমান গবেষণার কেস স্টাডি সুদানের আলোকে দেখা যায়, ২০১০ সালের জাতীয় নির্বাচন ও ২০১১ সালের গণভোটের মাধ্যমে ঐ সময়ে সুদান ও দক্ষিণ সুদান গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। যা ঐ সময়ে জাতিসংঘের UNMIS মিশনের সফলতা তথা বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সফলতা হিসেবে প্রশংসিত হয়। কিন্তু বিগত একদশকে সময়ের পরিক্রমায় সুদানে ২০২১ সালে পুনরায় সামরিক শাসন জারি হয়েছে এবং দক্ষিণ সুদানে উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার অন্তঃদ্বন্ধ ও সংঘাতের প্রেক্ষিতে দেশটিতে জন্মলগ্ন থেকে এখনও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তাই, ঠান্ডাযুদ্ধত্তোর বিশ্বে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা মূল্যায়ণে আরো গবেষণার দাবি রাখে।

১.৯ অধ্যায় বিন্যাস

গবেষণা কর্মটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ, যৌক্তিকতা ও অধ্যায় বিন্যাস আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মূলনীতি, শান্তিরক্ষীদের দায়িত্ব, কার্যক্রম, কার্যপদ্ধতি এবং নির্বাচন ম্যান্ডেট যুক্ত মিশনের কাঠামো, কর্ম-কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা, প্রেক্ষাপট এবং বিগত তিন দশকের প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্জনসমূহকে তিনটি ভিন্ন দশকে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণার মূল প্রশ্ন গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন পরিচালনা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা নিরূপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম নিবিড় বিশ্লেষণের জন্য কেস স্টাডি হিসেবে সুদানের UNMIS মিশন বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্বাচনী ম্যান্ডেট যুক্ত শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং

সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উপসংহার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উপসংহার

অসামরিক পন্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের একটি কেন্দ্রীয় দিক যে বিষয়টি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণায় অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের কৃতিত্ব সশস্ত্র বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা, অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির আলোকে বিভিন্ন ভাবে আলোচিত। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, প্রথাগতভাবে শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা সশস্ত্র পদ্ধতিতে সংঘাত নিরসন ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। যেখানে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধে বাহ্যিক সমর্থন গণতন্ত্রের উপরে শান্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমান বহুমাত্রিক শান্তিরক্ষা মিশন অনেক বেশি প্রযুক্তি নির্ভর এবং সংঘাত-পরবর্তী রূপান্তর পর্যায়ে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধে গণতন্ত্রের উপর শান্তিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সমান্তরালভাবে শান্তি এবং গণতন্ত্র উভয়কেই সমর্থন করে। বর্তমান গবেষণায় ক্রমবিকাশমান পদ্ধতির (gradualist approach) আলোকে গুনগত মাধ্যমিক তথ্য বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার পর্যালোচনার মাধ্যমে কীভাবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেস স্টাডি হিসেবে সুদানের জাতিসংঘ শান্তি মিশন UNMIS - কে কেন্দ্র করে এই গবেষণাটিকে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষে প্রথমে নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনগুলো চিহ্নিত করে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী এসকল মিশন হতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণের মাত্রা, কাজের ব্যাপ্তি এবং মিশন ম্যান্ডেটের সাথে মিল রেখে একটি মিশন চিহ্নিত করে কেস হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ফলে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদান উন্মোচনে এবং অসামরিক পন্থায় দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই শান্তি অর্জন বিষয়ে নতুন একাডেমিক আলোচনা ও গবেষণার আগ্রহ তৈরিতে সহায়ক হবে।

তথ্যসূত্র

[১] https://www.history.com/topics/world-war-ii/world-war-ii-history, প্রবেশ ২২ অক্টোবর, ২০২০।

[২] UN (1992), An Agenda for Peace, United Nations, New York, available at https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf, প্রবেশ ১২ অক্টোবর, ২০১৯।

[৩] জুলাই, ২০২১ এর তথ্য অনুসারে দেখা যায় জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে উন্নত বিশ্বের চেয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শান্তিরক্ষীর সংখ্যা বেশি। যেমন- এ সময়ে মোট কর্মরত শান্তিরক্ষীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৩২জন, রাশিয়ার ৭৪জন, যুক্তরাজ্যের ৫৩২জন, ফ্রান্সের ৬০৮জন, সুইডেনের ২৩৪জন, ডেনমার্কের ১৩ জন, চীনের ২২৪৯ ছিল। অপর দিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ৬৪৩৫জন, ভারতের ৫৫০৬জন, ইথিওপিয়ার ৫৪৭৮জন, নেপাল ৫০৪৩জন, রুয়ান্ড ৫১১২জন, পাকিস্তানের ৩৮৩৭জন শান্তিরক্ষী মোতায়েন ছিল। শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী সকল দেশের বিস্তারিত তালিকা ও সংখ্যার জন্য দেখুন- https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors প্রবেশ- ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১।

[৪] The Foreign Policy of Bangladesh emanates from the following provisions of the Constitution.
Article 25: Promotion of international peace, security and solidarity
1[***] The State shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter, and on the basis of those principles shall -
(a) Strive for the renunciation of the use of force in international relations and for general and complete disarmament;
(b) Uphold the right of every people freely to determine and build up its own social, economic and political system by ways and means of its own free choice; and
(c) Support oppressed peoples throughout the world waging a just struggle against imperialism, colonialism or racialism.

[৫] https://www.thedailystar.net/opinion/perspective/bangladesh-peacekeeping-30-years-service-and-sacrifice-1582756, প্রবেশ ২০অক্টোবর, ২০২০।

[৬] https://www.army.mil.bd/PeaceKeeping-Work, accessed on 21 February, 2020 এবং আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০১৯ এর ক্রোড়পত্র, দৈনিক সমকাল, ২ মে, ২০১৯, ঢাকা।

[৭] https://www.thedailystar.net/bangla/, accessed on 14 September, 2021.

[৮] বর্তমান থিসিসের গ্রন্থ পর্যালোচনা হতে এ ধারণা পাওয়া যায়। বিস্তারিত দেখুন, প্রথম অধ্যায়ের গ্রন্থ পর্যালোচনা অংশ ।

[৯] মোঃ হুসাইন "*Role of Bangladesh in UN Peace keeping Operation*" Bangladesh Army Journal.

[১০] T.A. Zearat Ali (1997), The Changing Nature of United Nations Peacekeeping Operations, BIISS Journal, VOL-18, N0 2.

[১১] রাশেদুজ্জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৬) "*জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ: প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভবনা*", প্রতিচিন্তা,

[১২] Ilyas Iftekhar Rasul (2010), Bangladesh Contribution to United Nation Peacekeeping Mission in Africa, paper presentated in saminar on 'Look Africa: An emerging Foreign Policy Option for Bangladesh', organized by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, 2 December, 2010.

[১৩] কর্ণেল মোঃ আমিনুল ইসলাম (২০০১), "*Peace keeping Operations and its Legal Consideration",* Bangladesh Army Journal

[১৪] ব্রিগেডিয়ার কাজী আশফাক আহমেদ (১৯৯৫), *"United Nations Peace keeping Operations – Lessons Learned*", Bangladesh Army Journal

[১৫] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), The Role of Peacekeeping Operations in Electoral Process, School of International and Public Affairs, Columbia University (https://www.sipa.columbia.edu)|

[১৬] Johan Galtungs' Theory of Peace, at www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2014/11/Mini-Theory-of-Peace.pdf, প্রবেশ ২০অক্টোবর, ২০২০।

[১৭] Baljit Singh Grewal (2003), *Johan Galtung: Positive and Negative Peace*, Auckland University of Technology, available at www.activeforpeace.org/no/fred/Positive_Negative_Peace.pdf, প্রবেশ ৪ অক্টোবর, ২০২০।

[১৮] প্রাগুক্ত।

[19] Baljit Singh Grewal (2003), প্রাগুক্ত।

[২০] Diamond, L. (2004): What is Democracy? https://diamond-democracy.stanford.edu/speaking/lectures/what-democracy, প্রবেশ ১৩ জুলাই, ২০২০ এবং Nwogu, G.A.I (2015), *Democracy: Its Meaning and Dissenting Opinions of the Political Class in Nigeria: A Philosophical Approach*, Journal of Education and Practice, Vol.6, No.4, 2015.

[২১] UN (2011), Strengthening The Role of the United Nations in Enhancing the Effectiveness of the Principle of Periodic and Genuine Elections and the Promotion of Democratization, Report of the Secretary-General in General Assembly, Report no-A/66/314, 19 August 2011. Available at https://undocs.org/A/66/314, প্রবেশ ১০ জুলাই, ২০১৯।

[২২] CSS (2010), Post-Conflict Democratization: Pitfalls of External Influence, CSS Analysis in Security Policy, No. 79, September 2010, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.

[২৩] প্রাগুক্ত।

[২৪] Mross, Karina (2019), Democracy Support and Peaceful Democratisation After Civil War, Briefing Paper, No. 7/2019, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn, http://dx.doi.org/10.23661/bp7.2019.v1.1

[২৫] Responsibility of Electoral Assistance Division of DPPA, UN at https://dppa.un.org/en/elections, প্রবেশ ২০ অক্টোবর, ২০২০।

[২৬] Karina Mross (2019) First Peace, then Democracy? Evaluating Strategies of International Support at Critical Junctures after Civil War, International Peacekeeping, 26:2, 190-215, to link to this article: https://doi.org/10.1080/13533312.2018.1557052

[২৭] CSS (2010), Post-Conflict Democratization: Pitfalls of External Influence, CSS Analysis in Security Policy, No. 79, September 2010, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich. এবং Karina Mross (2019), প্রাগুক্ত।

[২৮] Zürcher, Christoph, Carrie Manning, Kristie Evenson, Rachel Hayman, Sarah Riese, and Nora Roehner. Costly Democracy. Stanford: Stanford University Press, 2013.

[২৯] Rafael López-Pintor (2005), Post conflict Elections and Democratization: An Experience Review, Issue Paper No. 8, Bureau for Policy and Program Coordination, USAID.

[৩০] Mross, Karina (2019), Democracy Support and Peaceful Democratisation After Civil War, Briefing Paper, No. 7/2019, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn, at http://dx.doi.org/10.23661/bp7.2019.v1.1

[৩১] CSS (2010), Post-Conflict Democratization: Pitfalls of External Influence, CSS Analysis in Security Policy, No. 79, September 2010, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.

[৩২] ১৯৯১ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অংশগ্রহণে নির্বাচনী ম্যান্ডেট যুক্ত ২৬টি মিশন হচ্ছে- UNAMA (আফগানিস্তান), UNMIBH (বসনিয়া), UNTAC (কম্বোডিয়া), MONUC (ডিআর কঙ্গো), MONUSCO (ডিআর কঙ্গো), UNTAES (ক্রোয়েশিয়া), UNAMET (পূর্ব তিমুর), MINUSTAH-2 (হাইতি), UNMIH (হাইতি), UNGCI/ UNMOVIC (ইরাক), MINUCI/ ONUCI/UNOCI (আইভরী কোস্ট), UNMIK (কসভো), UNOMIL (লাইবেরিয়া), UNMIL (লাইবেরিয়া), ONUMOZ (মোজাম্বিক), UNAMIR (রুয়ান্ডা), UNAMSIL/ UNIOSIL (সিয়োরালিয়ন), UNMIS (সুদান), UNMISS (সাউথ সুদান), MINURSO (পশ্চিম সাহারা), UNAMID (দারফুর), MINUSMA (মালি), UNSOM (সোমালিয়া)।
২০১১ সালের পর নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত যে সকল মিশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে সে সকল মিশনে কোন কোনটি এখনও নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যায়ে যায়নি আবার যে সকল মিশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এ সংক্রান্ত দালিলিক তথ্য প্রকাশিত না হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক জনসাধারণের জন্য এখনও উন্মুক্ত হয়নি বা এখনো সহজ লভ্য হযনি। এ প্রেক্ষিতে নির্বাচনী ভূমিকা নিরুপনে ১৯৯১ হতে ২০১১ পর্যন্ত দু'দশকের অভিজ্ঞতাকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য আলোচনা ও যৌক্তিকতার প্রয়োজনে বর্তমান তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে।

[৩৩] Sharon Crasnow, (2012), *The Role of Case Study Research in Political Science: Evidence for Causal Claims,* Philosophy of Science, Vol. 79, No. 5 (December 2012), pp. 655-666, JOSTOR, The University of Chicago Press.

[৩৪] Vegard Bye, Scanteam, Abdel-Rahman El Mahdi, and John Gachi (2010), *Evaluation of Norwegian Support to Democratic Development through the United Nations*, Report 10/2010, Sudan Case Report, available at - https://www.oecd.org/countries/sudan/48085726.pdf

[৩৫] Matthijs Bogaards (2018), *Case-based Research on Democratization*, Journal of DEMOCRATIZATION, vol. 26, no.1, 61-77, https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1517255

[৩৬] প্রাগুক্ত।

[৩৭] United Nations Mission in the Sudan (UNMIS), at https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unmis/background.shtml, প্রবেশ ১৬ জুন, ২০২০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, ক্রমবিকাশ ও নির্বাচনী ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের কর্মপন্থা

ভূমিকা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন একটি সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম, যা নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রবিধান ও আর্ন্তজাতিক বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত। এখানে প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড পূর্ব নির্ধারিত নীতিমালা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত কর্মপন্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান অধ্যায়ে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন কী, শান্তিরক্ষী কারা, তাদের কার্যক্রম, শান্তিরক্ষার কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ, গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় শান্তি মিশনের কৌশল ও আন্তঃসম্পর্ক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত মিশন বাস্তবায়নের কর্মকৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাঠ পর্যায় হতে জাতিসংঘ সদর দপ্তর পর্যন্ত একটি সুনির্দিষ্ট স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাজিত। নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয় এবং এর আলোকে মাঠ পর্যায়ে শান্তিরক্ষীরা কাজ করে। জাতিসংঘ নীতিগতভাবে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও নির্বাচন পরিচালনা করতে কোন সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে না। সদস্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (যেমন- নির্বাচন কমিশন, নির্বাহী বিভাগ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তিস্থাপনের মালিকানা/কৃতিত্ব সদস্য রাষ্ট্রকে প্রদান করে। মূলত, জাতিসংঘ সহায়ক শক্তি হিসেবে কৌশলগত, কারিগরি ও পরিচালনা সহায়তা দিয়ে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সাহায্য করে। যাহা গতানুগতিক সামরিক পন্থার পরিবর্তে অসামরিক পন্থায় দীর্ঘমেয়াদি শান্তি অর্জন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। তত্ত্বগতভাবে এ কৌশল উদারনৈতিক শান্তিতত্ত্ব এবং পদ্ধতিগত ভাবে সংঘাতপূর্ণ দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ‘ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি’কে (gradualist approach) নির্দেশ করে। জাতিসংঘের শান্তিস্থাপনের সফলতা ও ব্যর্থতা মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সশস্ত্র বাহিনীর এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

২.১ শান্তিরক্ষা (Peacekeeping)

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা একটি অন্যতম চলমান কার্যক্রম, যা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রাণাধীনে যুদ্ধবিদ্ধস্ত ও সংঘাতপূর্ণ দেশসমূহে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। যুদ্ধ আক্রান্ত দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ন্ত্রণ, আর্থ সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সহায়তা প্রদান এর অন্যতম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে শান্তি মিশনের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমান বহুমাত্রিক শান্তি মিশনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ঘটে গত শতাব্দীর নব্বইর দশকে তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালির সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত "An Agenda for Peace" প্রস্তাবের আলোকে। তিনটি পৃথক কার্যক্রমের (peacemaking, peacekeeping, peace-building) মাধ্যমে পরিচালিত ঘালির এ শান্তি উদ্যোগ বর্তমানে জাতিসংঘের অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃত।

সংঘাতে লিপ্ত দেশগুলোকে শান্তির দিকে অগ্রযাত্রায় জাতিসংঘের অন্যতম কার্যকর ও প্রমাণিত মাধ্যম হচ্ছে শান্তিরক্ষা মিশন। এ মাধ্যম সংঘর্ষে জর্জরিত দেশগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পরিস্থিতি তৈরিতে সহায়তা করে। শান্তিরক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – বৈধতা, দায় বা বোঝার অংশীদারিত্ব, সেনা ও পুলিশ মোতায়েন এবং বেসামরিক শান্তিরক্ষীদের একীভূত করে শান্তি স্থাপনের বহুমাত্রিক উদ্দেশ্য অর্জন। বর্তমানের বহুমাত্রিক শান্তিরক্ষা অভিযান কেবল শান্তি ও নিরাপত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং বৃহৎ দৃষ্টিকোণ হতে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা, রাজনৈতিক (প্রতিষ্ঠান নির্মাণ) প্রক্রিয়া সচল করা, নিরস্ত্রীকরণ, পুনঃনির্মাণ ও প্রাক্তন যোদ্ধাদের পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, নির্বাচন অনুষ্ঠান সমর্থন, মানবাধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন পুনরুদ্ধারকে অন্তর্ভুক্ত করে[১]।

শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্ষেত্র ও ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা যায়। মিশনসমূহের জটিল কর্মউদ্যোগ হতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়[২] –

ক. পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষক মিশন (Observation Mission)

খ. গতানুগতিক শান্তিরক্ষী মিশন (Traditional Peace keeping mission)

গ. শান্তি নির্মাণ মিশন (Peace building mission)

ঘ. শান্তি প্রয়োগকরণ মিশন (Peace enforcement mission)

পর্যবেক্ষণ বা পর্যবেক্ষক মিশন যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘন (ceasefire violations) পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট প্রদান করে। গতানুগতিক মিশন বিরোধীদের সম্মতিতে একটি বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখা হয় এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক হালকা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বিরোধীদের যুদ্ধ বিরতিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতিসংঘের উদ্যোগে এ সময় নিরস্ত্রীকরণ, পুনর্নির্মাণ (demobilization) এবং বিদ্রোহী সদস্যদের পুনরায় সমাজের ফিরিয়ে নিয়ে আসার (reintegration) উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত দু'ধরনের মিশনকে একই মনে করেন[৩]।

শান্তি স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা করার মিশন খুবই জটিল ও সময় সাপেক্ষ দীর্ঘ মিশন। এ ধরনের মিশনে মানবিক সহায়তা নিশ্চিত এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব থাকে। শান্তি প্রয়োগকরণ মিশনের দীর্ঘ মেয়াদের উদ্দেশ্য থাকে জাতি গঠনের, এ লক্ষে মিশন ম্যান্ডেটের মধ্যে – অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান, আইনের শাসন, বিচার ও আইন বিভাগ পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ধরনের মিশনে একটি অসামরিক পন্থায় শান্তি অর্জনের চেষ্টা করা হয়। চূড়ান্তভাবে শান্তি প্রয়োগকরণ মিশনের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় জনগণকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে ভারী অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা অর্পন করা হয়। এ ধরনের মিশনে সম্পূর্ণ সামরিক পন্থায় শান্তি অর্জনের চেষ্টা করা হয়। যেমন – হাইতি, বসনিয়া, হার্জেগভিনা বা ইরাকে জাতিসংঘ ও বিদ্রোহীগোষ্ঠীর মধ্যকার শত্রুতা দূর করার জন্য সামরিক বাহিনী সরাসরি সামরিক পন্থায় জড়িত। এ ধরনের মিশন কারিগরিভাবে জটিল, ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। বিরোধী পক্ষগুলোকে দমন ও শান্তি অর্জনের জন্য শান্তিরক্ষীদের যথেষ্ট সশস্ত্র হতে হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এ ধরনের মিশনকে অনেকে তাত্ত্বিকভাবে সমর্থন করেছেন[৪]।

গবেষকগণ শান্তি মিশনের এ চার ধরনের শ্রেণীকরণের সাথে একমত নন। তারা মনে করেন, সাম্প্রতিক সময়ে মিশনগুলোর ম্যান্ডেটের মধ্যে যেমন সুনির্দিষ্টতা লক্ষ করা যায় তেমনি মিশনগুলো অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনীতির উপযোগী বিশেষায়িত। সম্প্রতি শান্তিরক্ষা গবেষক Diehl and Druckman শান্তিমিশনকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করেছেন[৫]-

১. গতানুগতিক শান্তিরক্ষা/যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ (Traditional peacekeeping)

২. মানবিক সহায়তা মিশন (Humanitarian Assistance)

৩. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (Election observation or democracy building)

৪. নিরস্ত্রীকীকরণ (Disarmament)

৫. পুনর্নির্মাণ (Demobilization)

৬. পুনঃসংহতি (Reintegration)

৭. স্থানীয় নিরাপত্তা/ আইন শৃঙ্খলা (Local Security/Law and order)

৮. আইনের শাসন ও নাগরিকসমাজ প্রতিষ্ঠা মিশন (Rule of law and civil society mission) ।

উপরোক্ত শ্রেণি বিভাগে এক ধরনের সমন্বয়হীনতার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। কেননা, বর্তমান শান্তি মিশনের ম্যান্ডেট বহুমাত্রিক এবং একাধিক বিষয়কে ম্যান্ডেটভুক্ত করা হয়। বাস্তবে দেখা যায়, শান্তি নির্মাণ (peacebuilding mission) মিশনে উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগকৃত একাধিক কার্যক্রম ম্যান্ডেটভুক্ত হয়। ফলে এ ধরনের শ্রেণি বিভাগসমন্বিত শান্তি অর্জনের কার্যক্রমকেও জটিল করে তুলতে পারে। তবে, শান্তি মিশনের এ ধরনের বিস্তারিত শ্রেণিকরণ মিশন ম্যান্ডেট ও কাজের ধরন সম্পর্কে বুঝতে সহায়ক।

২.২ শান্তিরক্ষা মিশনের মূলনীতি

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনের মাধ্যমে দেশগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন তিনটি মূলনীতি অনুসরণ করে চলে। মূলনীতিগুলো জাতিসংঘ এবং সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলোর মাধ্যমে নির্ধারিত এবং অনুমোদিত। মূলনীতি তিনটি হচ্ছে[৬] –

ক. অংশীজনের সম্মতি

খ. নিরপেক্ষতা

গ. প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশ ও আত্মরক্ষা ব্যতীত কোনরকম বল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।

ক. অংশীজনের সম্মতি

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন আক্রান্ত দেশের অংশীজনের সম্মতিতে পরিচালিত হয়। এর জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশ নেয়া দেশগুলোর সম্মতি আদায় করা হয়। এ সম্মতি শান্তিরক্ষা মিশনে জাতিসংঘকে রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনাসমূহ প্রয়োগের স্বাধীনতা প্রদান করে। এই সম্মতি ব্যতীত শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যক্রমগুলো অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সৃষ্টি করে এবং শান্তিরক্ষা মিশনকে ব্যর্থতার দিকে ধাবিত করে[৭]।

প্রকৃতপক্ষে অংশীজনের অনুমোদনের অর্থ এই নয় যে, স্থানীয় জনগণ থেকে শান্তিরক্ষা মিশনকে স্বাগত বা আহ্বান জানানো হয়। স্থানীয় সাধারণ জনগণ জাতিসংঘের এই কার্যক্রমকে অনুমোদন দিবে এর কোনো নিশ্চয়তা অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত অনুমোদনও স্থানীয় পর্যায়ে মেনে নেয়া হয় না। দেখা যায় স্থানীয় গোষ্ঠীগুলো শান্তিচুক্তিবদ্ধ অংশীজনের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় অথবা সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল কিংবা বহিরাগত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবার এরকমও হতে পারে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের অধিকারের ব্যাপারে কথা বলার মতো কাঠামোগত কোন সক্ষমতা নেই এবং তারা দ্বন্দ্বের ভুক্তভোগী।

খ. **নিরপেক্ষতা**

অংশীজনের সম্মতি ও সহযোগিতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে নিরপেক্ষতাকে অস্পষ্টতা এবং নিষ্ক্রিয়তার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় না। শান্তিরক্ষীরা অংশীজনদের সহযোগিতা প্রদানে নিরপেক্ষ থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক আদেশ কার্যকরে পেশাদারিত্বের পরিচয় দেয়। একজন ভালো রেফারির মতো শান্তিরক্ষীরা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ কিন্তু আন্তর্জাতিক নীতি ও মূল্যবোধ যা শান্তিরক্ষা মিশন মেনে চলে তার ব্যত্যয়কারীর দণ্ড প্রদানে বা প্রতিকারে কার্যকার ভূমিকা রাখে। অংশীজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষীরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে যাতে নিরপেক্ষতার ব্যাপারে কোনরুপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। নিরপেক্ষতা বজায়ে ব্যর্থ হলে শান্তিরক্ষা মিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বৈধতা হ্রাস এবং অংশীজনদের সম্মতি/অনুমোদন প্রত্যাহারের ঝুঁকি থাকে। এ কারণে শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যকারিতা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ. ম্যান্ডেট ও আত্মরক্ষা ব্যতীত বল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা (Non-use of force except in self defence and defence of the mandate**)**

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন কোন বল প্রয়োগকারি পরিচালনা সংস্থা নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষীরা নিরাপত্তাজনিত অনুমোদন সাপেক্ষে আত্মরক্ষার খাতিরে এবং নির্দেশনাক্রমে বলপ্রয়োগ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারিদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে, স্থানীয় জনগণকে দৃশ্যমান আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে এবং জাতীয় আইন ও নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনকে আরো বলিষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করে থাকে। প্রাথমিকভাবে শান্তিরক্ষা মিশনকে ত্বরান্বিত করা আর বল প্রয়োগ করা এক মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায় দ্বারা (Chapter VII of the United Nations Charter) এ বল প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত[৮]-

- শক্তিশালী বা বলিষ্ঠ শান্তিরক্ষা (robust peacekeeping) মিশনে সংশ্লিষ্ট দেশ, অংশীজন এবং নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে মিশনের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের লক্ষে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলপ্রয়োগ করা হয়; এবং
- অপরদিকে শান্তি প্রয়োগকারী (peace enforcement) মিশনে কৌশলগত ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সামরিক বাহিনী জড়িত থাকলে অংশীজনের অনুমোদন ছাড়া বল প্রয়োগ করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া এ ধরনের বল প্রয়োগ সনদের দফা ২(৪) [article 2(4) of the charter] দ্বারা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য নিষিদ্ধ।

শান্তিরক্ষা মিশনে শক্তিপ্রয়োগ সর্বশেষ পন্থা। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে শক্তি প্রদর্শন এবং যথাযথভাবে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। লক্ষ রাখতে হয়, শক্তি প্রয়োগ যেনো শান্তিমিশন কে ব্যর্থ না করে বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম না দেয়[৯]।

২.৩ শান্তিরক্ষক

শান্তি মিশনে জাতিসংঘের নিজস্ব কোন বাহিনী কাজ করে না। শান্তিরক্ষীরা হতে পারেন সেনাসদস্য, পুলিশ অথবা বেসামরিক লোকজন। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের স্থল, নৌ, ও বিমান সেনা, পুলিশ ও বেসামরিক লোকজন এ কাজে যোগদান করে থাকে। শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও পুনরুদ্ধার এই দৃঢ় অংগীকার রক্ষায় তারা জাতিসংঘের সাথে কাজ করে। অসহায়দের রক্ষা এবং আক্রান্ত দেশগুলোকে সংঘর্ষ থেকে শান্তির পথে নিয়ে আসা শান্তিরক্ষকদের এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য। ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ১০ লক্ষ কর্মী জাতিসংঘের পতাকা বহন করে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। এ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩৫০০ জন শান্তিরক্ষক প্রাণ হারিয়েছেন[১০]। বর্তমানে মোট শান্তিরক্ষীর ১৬.৭ শতাংশ নারী শান্তিরক্ষী। এ সংখ্যা ২০২৮ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে উন্নতি করার পরিকল্পনা রয়েছে[১১]।

সেনাসদস্য

১৯৪৮ সাল থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সেনাসদস্যদের নিয়োগ দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত সারাবিশ্বের প্রায় ১২০টি দেশের ৯৭ হাজার সেনাকর্মী শান্তিরক্ষার কার্যক্রমে জড়িত হয়েছে[১২]। সেনাসদস্যগণ ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আগত সেনাসদস্য বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির

কিন্তু শান্তিরক্ষায় তারা এক হয়ে কাজ করে থাকে। সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ সৈনিক আফ্রিকা বা এশিয়া হতে আসলেও পশ্চিমা দেশগুলো হতে আগত সৈনিকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের সেনাসদস্যরা মাঠপর্যায়ে নীল হেলমেট পরিধান করেন। পুলিশ, বেসামরিক লোকজনের পাশাপাশি সেনাসদস্যরা শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং জন নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করে থাকে। দুর্যোগপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে জাতিসংঘের কর্মীরা দিনের পর দিন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তিমিশনে সেনাসদস্যরা নিম্মোক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে[১৩]-

- বেসামরিক লোকজন এবং জাতিসংঘের কর্মীদের রক্ষা করা;
- অমীমাংসিত সীমানার, যুদ্ধপরবর্তী এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ;
- সংঘর্ষপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা প্রদান;
- নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা প্রদান;
- জাতীয় সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

পুলিশ

বিভিন্ন দেশের নিয়মিত পুলিশ বাহিনীর সদস্য জাতিসংঘ শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষী হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে নিজ দেশে কমপক্ষে পাঁচ বছর নিয়মিত কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ নেই সেটি নিশ্চিত করতে হয়। নারী ও পুরুষ উভয়ই মিশনে যোগ দিতে পারেন। বর্তমানে শান্তি মিশনের ৩০ শতাংশ নারী সদস্য নিয়োগের নীতিমালা অনুসৃত হয়। পুলিশ সদস্য শান্তিরক্ষীগণ নিরস্ত্র অবস্থায় দায়িত্ব পালন করে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে থাকে। পুলিশ শান্তিরক্ষীরা নিয়মিত টহলদারি, স্থানীয় বাহিনীকে সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নের সহায়তা এবং কারিগরি ও পেশাদারি জ্ঞান আদান প্রদান করে থাকে। জাতিসংঘের পুলিশ বাহিনী অপরাধ ও দ্বন্দ্ব নিরসনে বিবাদমান গ্রুপ এবং সরকারি বাহিনীর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে এবং সকল পক্ষকে শান্তি প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে থাকে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের পুলিশ সদস্যবৃন্দ

দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে শান্তিরক্ষা মিশনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। শান্তিমিশনে পুলিশ নিম্মোক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে-

- বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান;
- স্থানীয় বাহিনীকে সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
- নিয়মিত টহলদারির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

টেবিল ২.১

শান্তিমিশনে মোতায়েনকৃত বাংলাদেশী পুলিশ শান্তিরক্ষী (৩১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত)

মিশন নাম	মোতায়েনকৃত পুলিশ সদস্য
UNMISS	৪৯৩
MINUSMA	২৮২
MONUSCO	৩৮৮
MINUSCA	৩৮৩
UNAMID	৫৬৭
UNFICYP	৬৬
BINUH	১৩

সূত্র: https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors

চিত্র- ২.১

শান্তি মিশনে সেনা, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষকদের দায়িত্ব

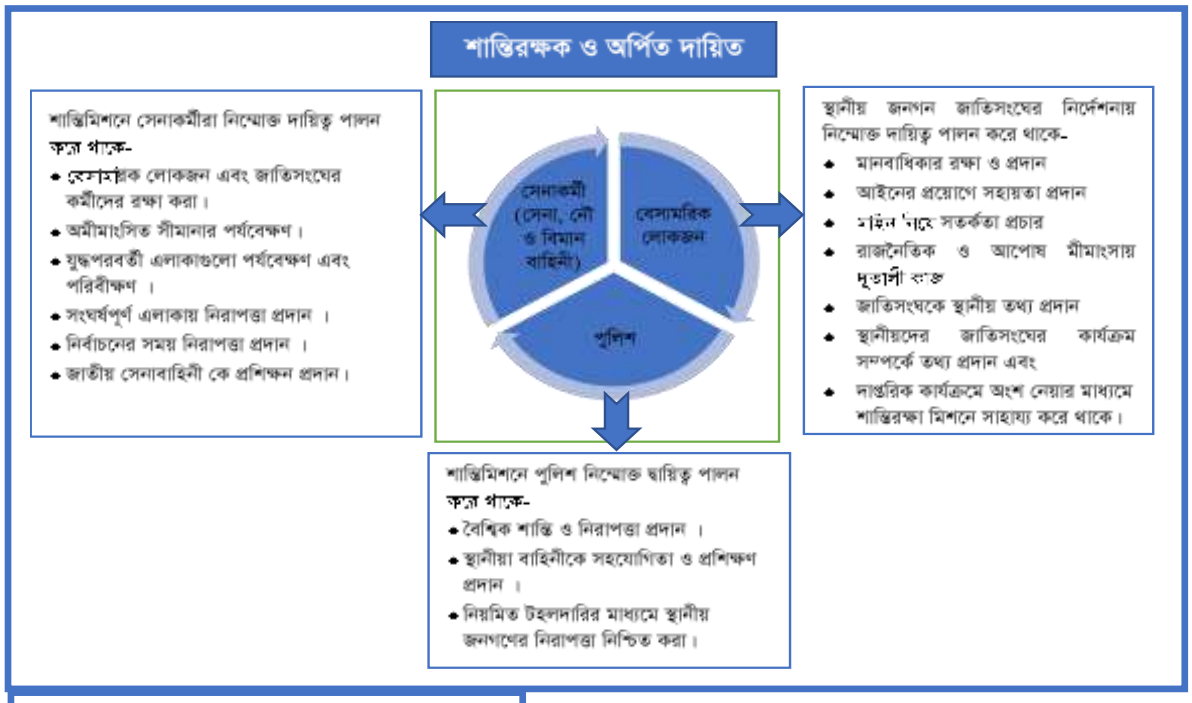

উৎস: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

বেসামরিক জনগণ

বেসামরিক জনগণ তথা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে প্রাণ হিসেবে কাজ করে। শান্তিরক্ষা মিশন যতোই বহুমুখি হচ্ছে ততোই স্থানীয় দক্ষ লোকবলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় জনগণ জাতিসংঘের নির্দেশনায় কার্যক্রম করে থাকে – মানবাধিকার রক্ষা, আইনের প্রয়োগে সহায়তা প্রদান, মাইন নিয়ে সতর্কতা প্রচার, রাজনৈতিক ও আপোষ মীমাংসায় দূতের কাজ এবং জাতিসংঘকে স্থানীয় তথ্য প্রদান এবং স্থানীয়দের জাতিসংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে। এছাড়া স্থানীয় বেসামরিক লোকজন দোভাষী, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, তথ্য-প্রযুক্তি, মানবসম্পদ ও দাপ্তরিক কার্যক্রমে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে সাহায্য করে থাকে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এই কাজে সমানভাবে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশন এগিয়ে যাচ্ছে।

২.৪ শান্তিরক্ষা মিশনের কৌশলগত ক্রমবিকাশ

জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সারা বিশ্বে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। সংঘাত ও সহিংসতার ধরনে যেমন বিবর্তন ঘটেছে, সেটাকে ঠিকমতো মোকাবিলা করার জন্য শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর ধরনেও সংস্কার আনতে হয়েছে। গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোকে মোট চারটি ধাপে ভাগ করা যায় বা বিভিন্ন প্রজন্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

প্রথম প্রজন্মের শান্তিরক্ষা মিশন নিরস্ত্র মিশন হিসেবে পরিচিত। দুটি সংঘাতময় পক্ষকে নিরস্ত্র করার লক্ষে সরাসরি তাদের মাঝখানে অবস্থান করে। এ প্রজন্মের শান্তিরক্ষীদের সংঘাত নিরসনের বাইরে অন্য কোনো কাজ, যেমন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে ইউনাইটেড নেশনস ইনটারিম ফোর্স ইন লেবাননের (ইউএনআইএফআইএল) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শান্তিরক্ষী বাহিনী সরাসরি লেবানন ও ইজরাইলি বাহিনীর মুখোমুখি হয়।

দ্বিতীয় প্রজন্মের মিশন বহুমাত্রিক মিশন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রজন্মের শান্তিরক্ষীরা কেবল যে শান্তি রক্ষার জন্য কাজ করেন তা-ই নয়, বরং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও অনুষ্ঠান, মাইন

উত্তোলন ইত্যাদি কাজেও নিয়োজিত হন। যেমন, ইউনাইটেড নেশনস ট্রানজিশনাল অথরিটি ইন কম্বোডিয়া (ইউএনটিএসি), এটা কম্বোডিয়ার দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গঠন করা হয়েছিল। এই শান্তিরক্ষী বাহিনী পুরো কম্বোডিয়ার প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নিয়েছিল, নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছিল এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। শান্তিরক্ষা মিশনের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এটাই জাতিসংঘের প্রথম সারির বহুমাত্রিক ক্রিয়াকলাপ ছিল।

তৃতীয় প্রজন্মঃ এ প্রজন্মের মিশনগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে জাতিসংঘ সনদের সপ্তম ধারার প্রয়োগ ঘটিয়ে শান্তিরক্ষী বাহিনী বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয়, ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই মিশনগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো ও শক্ত হাতে পরিচালনা করা হয়।

চতুর্থ প্রজন্মঃ চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিরক্ষা মিশনগুলো প্রযুক্তিনির্ভর। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ সফল করার জন্য এতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটানো হয়েছে। সংঘাতকবলিত এলাকা অনুসন্ধান এবং যথাযথ পরিকল্পনা সাজানোর জন্য কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া হয়।

এছাড়া রোবট সেনসর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর প্রতিটা ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

চিত্র ২.২: শান্তিরক্ষা মিশনের কৌশলগত ক্রমবিকাশ

উৎস: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

২.৫ শান্তিরক্ষা মিশনের অর্থায়ন

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক শান্তিরক্ষা মিশন গঠন, মোতায়েন, বজায় রাখা বা সম্প্রসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অর্থায়ন জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মিলিত দায়িত্ব। জাতিসংঘ সনদের ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র আইনী বাধ্যবাধকতার কারণে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য। সাধারণ পরিষদের ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি প্রতিষ্ঠিত একটি জটিল সূত্রের বিশেষ স্কেল অনুসারে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) অনুসারে শান্তিরক্ষা ব্যয় নির্ধারণ করা হয়[১৪]। এককভাবে কোন সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘের মোট বাজেটের ২৫ শতাংশের বেশি দিতে পারবে না। বাংলাদেশ নূন্যতম হারে যে ফি প্রদান করে তা হলো (০.০০১) শতাংশ[১৫]।

গত শতকের আশির দশকে সাইপ্রাসের UNFICYP মিশনের তহবিল স্বেচ্ছা প্রদত্ত অনুদান হতে করা হয়। কিন্তু, ১৯৭৩ সাল থেকে শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য সাধারণ বাজেটের বাহিরে পৃথক তহবিল গঠন করা হয়। শান্তিমিশনের প্রায় ৫৮% ভাগ অর্থ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র প্রদান করে[১৬], যেটা তাদের জাতিসংঘের সাধারণ বাজেটে প্রদত্ত অনুদানের চেয়ে ২২শতাংশেরও বেশি। ১৯৮৪ সালের পর হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তিরক্ষা বাজেটের প্রায় ৩০ শতাংশ প্রদান করে আসছে[১৭]। মিশন ম্যান্ডেট নির্ধারণে স্থায়ী সদস্যদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এবং তাদের রাজনৈতিক লক্ষ কোন কোন মিশনে জড়িত থাকার কারণে আন্তর্জাতিক গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য তাদের বিশেষ দায়বদ্ধতার কারণে সমানুপাতে বাজেটে অংশ হওয়া উচিত, এতে মিশন ম্যান্ডেট নির্ধারণে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে[১৮]।

জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ অর্থবছরের জন্য ইউএন শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের জন্য অনুমোদিত বাজেট ৬.৩৮বিলিয়ন মার্কিন ডলার[১৯]। এই বাজেট জাতিসংঘের ১২টি শান্তিরক্ষা মিশনের মধ্যে ১০টির অর্থায়নসহ UNAMID (United Nations – African Union Hybrid Operation in Darfur) মিশন, সোমালিয়ায় আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশন AMISOM (African Union Mission in Somalia) এর রসদ সরবরাহ, ব্রিডিসি (ইতালি) ও

এন্টেবিতে (উগান্ডা) অবস্থিত আঞ্চলিক পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বৈশ্বিক শান্তি কার্যক্রমের জন্য সহায়তা, প্রযুক্তি এবং রসদ সরবরাহের অর্থায়ন অর্ন্তভুক্ত। এছাড়া, জাতিসংঘের অপর দুটি মিশন UNTSO (UN Truce Supervision Organization) মিশন এবং ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তের UNMOGIP (UN Military Observer Group in India and Pakistan) মিশনের অর্থায়ন জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট হতে করা হয়[২০]।

বিশ্বের সামরিক ব্যয়ের তুলনায় শান্তিরক্ষা মিশনের ব্যয় অর্ধ (.০৫%) শতাংশের কম (২০২০ সালে বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয় ছিলো প্রায় ১৯৮১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। সম্প্রতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে শান্তিরক্ষা মিশন ব্যয় গড়ে ২.১% হ্রাস পেয়েছে[২১]। শতাংশনুসারে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে শীর্ষ ১০ অর্থ প্রদানকারী দেশ হলো[২২]-

চিত্র ২.৩

২০২০-২১ অর্থবছরে শান্তিমিশনে শীর্ষ ১০ অর্থ প্রদানকারী দেশ

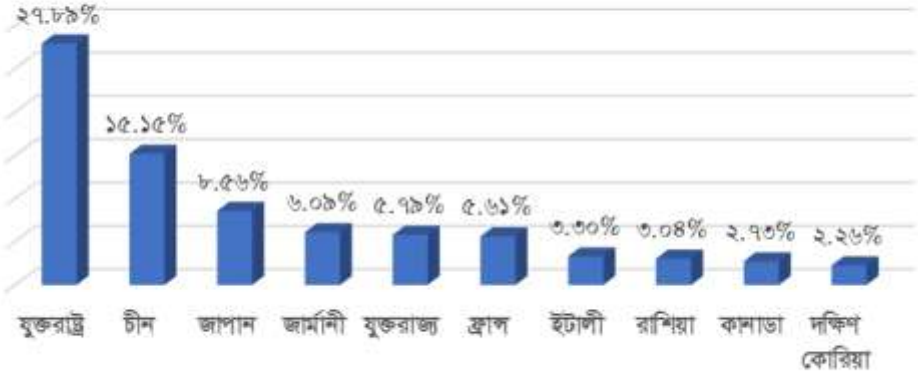

এছাড়া, অনেক দেশ স্বেচ্ছায় তাদের শান্তিরক্ষা ব্যয়ের উপরে নির্ধারিত অংশের বাইরেও ইউএন শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে পরিবহন, রসদ সরবরাহ, কর্মী এবং আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে।

প্রতিটি শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনার জন্য নিজস্ব বাজেট এবং একাউন্ট থাকে, যার মধ্যে পরিবহন, রসদ সরবরাহ এবং কর্মীদের বেতন ব্যয় অর্ন্তভুক্ত থাকে। শান্তিরক্ষা বাজেট চক্রটি ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলে। এই চক্রটি নিরাপত্তা কাউন্সিলের আদেশের সাথে খুব কমই সংযুক্ত; তবে অপারেশনের বর্তমান আদেশের ভিত্তিতে বাজেটগুলি সর্বাধিক ১২ মাসের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সামরিক বাহিনী নেই এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছাসেবীর ভিত্তিতে প্রতিটি শান্তিরক্ষী মিশনের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ও পুলিশ সদস্য সরবরাহ করে। শান্তিরক্ষী সৈন্যদের তাদের নিজস্ব সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় পদমর্যাদা এবং বেতন স্কেল অনুসারে জাতিসংঘ বেতন প্রদান করে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ইউনিফর্ম প্রাপ্ত সৈনিক প্রতি মাসে ১৪২৮ মার্কিন ডলার স্ট্যান্ডার্ড হারে বেতন প্রাপ্ত হন। পুলিশ এবং অন্যান্য বেসামরিক কর্মীদের প্রতিটি মিশনের জন্য শান্তিরক্ষা বাজেট থেকে অর্থ প্রদান করা হয়। সেনা বা পুলিশ বাহিনীকে সরঞ্জাম, কর্মী এবং সহায়তা পরিসেবা সরবরাহ করার জন্য জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলিকে অর্থ প্রদান করে[২৩]।

২.৬ শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রম

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন জাতিসংঘের সবচেয়ে দৃশ্যমান কাজ। এটি শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের একটি সমন্বিত ও সুসংহত বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ বিগত বছরগুলোতে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত ৭০ বছর ধরে শান্তিরক্ষা কর্মীরা বিশ্বের কোটি কোটি অসহায় জনগোষ্ঠীকে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে উন্নত জীবন যাপনে সাহায্য করে আসছে। একইসাথে সহযোগিতা প্রদান করছে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়। বলা বাঞ্ছনীয় যে, শান্তিরক্ষা মিশন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি সহযোগি কার্যক্রম, কোনো রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার বিকল্প নয়।

শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যকারিতা টেকসই রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং উন্নত শান্তিরক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। শান্তিরক্ষা মিশন কোনোভাবেই দেশের রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োগ, ঐক্য এবং অক্ষুন্ন সার্বভৌমত্বের বিকল্প হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা পরিষদ প্রতিশ্রুত নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করে থাকে। শান্তিরক্ষীরা সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান,

হিংসাত্মকমূলক কার্যক্রম হ্রাস এবং সংঘাতপূর্ণ সাহায্যপ্রার্থী দেশকে তাদের নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করে। শান্তিরক্ষা মিশন সংঘাতের মূল কারণ খুঁজে বের করা থেকে শুরু করে সংঘাত হতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সাহায্য করে থাকে। প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ানো, শান্তি কার্যক্রম তরান্বিত করা, মতামতের সুস্পষ্ট ব্যক্তকরণে এই ঐক্যবদ্ধ নীতিমালার গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে জাতিসংঘ সচিবালয়, নিরাপত্তা পরিষদ ও দেশগুলোর মধ্যকার ঐক্যবদ্ধ নীতিমালা ৫৫টি দেশে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা ও সমন্বয় করেছে। এ ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম নিম্মোক্ত আটটি কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে[২৪]-

১) বেসামরিক জনগণকে রক্ষা করা (Protecting civilians)

২) সংঘাত প্রতিরোধ করা (Preventing conflicts)

৩) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (Building Rule of Law and Security Institutions)

৪) মানবাধিকার প্রচার করা (Promoting Human Rights)

৫) শান্তি ও নিরাপত্তায় নারীকে সম্পৃক্ত করা (Promoting Women, Peace and Security)

৬) মাঠপর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান (Operational Support)

৭) সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানে অগ্রসর হওয়া (Advancing Political Solutions to Conflict)

৮) শান্তি ও নিরাপত্তায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা (Promoting Youth, Peace and Security)

চিত্র- ২.৪

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সমন্বিত কার্যক্রম

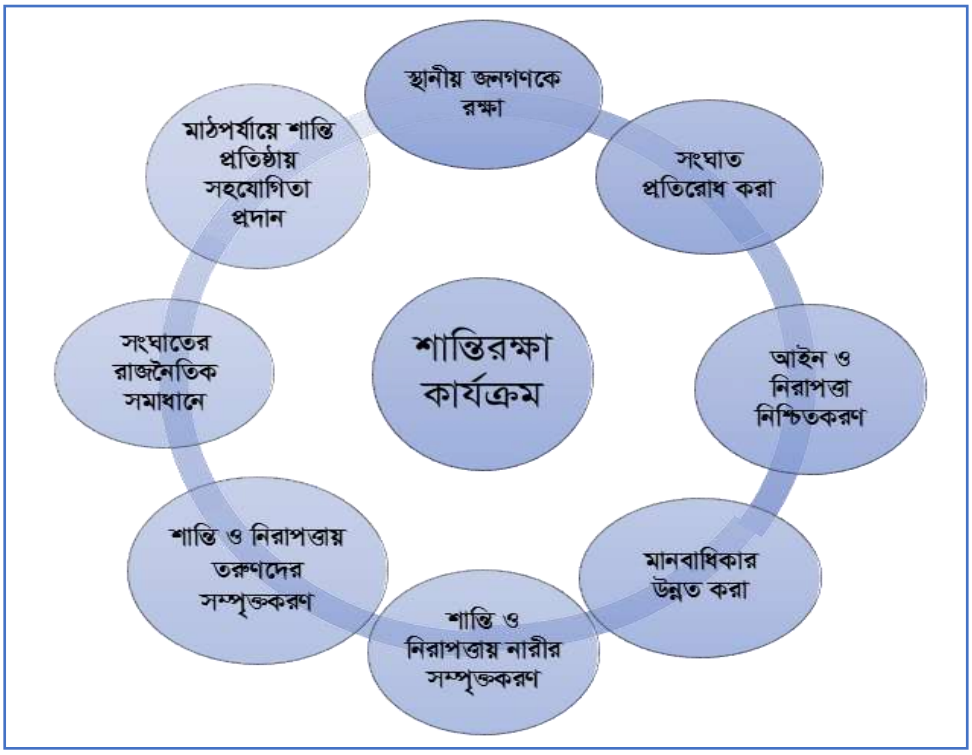

২.৬.১ স্থানীয় জনগণকে রক্ষা

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। কিন্তু যে কোনো সংঘর্ষে সাধারণ নাগরিকরা বেশি ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়। তাই শান্তিরক্ষীদের প্রথম কাজ হলো সংঘাতে লিপ্ত রাষ্ট্রকে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উপদেশ, পরামর্শ ও নিরাপত্তারক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা।

বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের পূর্বে জাতিসংঘ শান্তিমিশন বিবাদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ /যুদ্ধ বিরতি বজায় রাখাকে গুরুত্বারোপ করে শান্তিমিশন পরিচালিত হতো। কিন্তু ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে মাঠ পর্যায়ে শান্তিরক্ষীবাহিনী পর্যবেক্ষণে দেখতে পায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এসব কোন্দলে স্থানীয় জনগণ আক্রমনের শিকার হচ্ছে। যেমন রুয়ান্ডার UNAMIR মিশনে এবং প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার UNPROFOR মিশনে স্থানীয় জনগণের উপরে পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ চালানো হয়, যা প্রাথমিকভাবে শান্তিরক্ষীদের পক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি[২৫]।

এ সংঘর্ষগুলো ছাড়াও সোমালিয়া, পূর্ব-তিমুর, সিয়েরালিয়নে সশস্ত্র বাহিনীগুলো সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য

করে আক্রমণ করে। এছাড়াও যৌন নিগ্রহ ও শিশু অধিকার লংঘনের মতো গুরুতর সব অপরাধমূলক কার্যক্রম চালায়।

এ প্রেক্ষাপটে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা শান্তি মিশনের অন্যতম ম্যান্ডেটভুক্ত দায়িত্ব। আধুনিক শান্তি মিশন কার্যক্রমে নিরাপত্তা পরিষদ স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এজন্য নিরাপত্তা পরিষদ স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তাকে মূল লক্ষ নির্ধারণ করে এবং শান্তিরক্ষীদের এ বিষয়ে আরো প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যা পালনে শান্তিকর্মীরা বাধ্য। এছাড়া, সংঘাত ও সহিংসতা থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। মিশনে নিয়োজিত শান্তিরক্ষীর প্রায় ৯৫% এর উপরে শান্তিকর্মী জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বলা যায় যে, শান্তিরক্ষীরা সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রের জনগণকে শারীরিকভাবে নিরাপত্তা প্রদানে নিয়োগকৃত[২৬]।

শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান, যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ শান্তিকর্মীরা জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও এ লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তিরক্ষা মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মনে করেন জনগণকে রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল দায়িত্ব, শান্তিরক্ষা নয়। নীল হেলমেটধারীদের এই কার্যক্রমগুলো বেশি দৃশ্যমান। এই চ্যালেঞ্জিং কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতিসংঘের শান্তিমিশনের কার্যকারিতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। আধুনিক শান্তিরক্ষা মিশন জনগণকে সহযোগিতা ও নিরাপত্তারক্ষায় বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে করে থাকে[২৭]-

- রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন যারা সংঘর্ষ কমানো এবং রোধে কাজ করে;
- শান্তি স্থাপন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় স্থানীয় বিশেষজ্ঞ, শিশু ও নারী অধিকার কর্মীদের সাথে কাজ করা;
- সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় কাজ করা;
- আইন ও মানবাধিকার রক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বিত কাজ করা।

এ সকল কৌশল বাস্তবায়নে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই জাতিসংঘকে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে নানারকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। যেখানে জাতিসংঘকে সন্ত্রাসী দলগুলোর চেয়ে ছোট কর্মীদল নিয়ে অনেক বড় মিশন পরিচালনা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, MONUSCO মিশনে মাত্র ১৭ হাজার শান্তিকর্মী নিয়োজিত আছে, যেখানে প্রায় ২.৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকার দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ (প্রতি ১৩৫ বর্গ কিলোমিটারে ৪ হাজার ৮০০ জন লোক বসবাস করে)। এটা সহজেই অনুমেয় যে অনেক সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোতে শান্তিকর্মীরা অবকাঠামোগত অসুবিধা, অস্থিতিশীলতা ও সীমিত স্থানীয় নিরাপত্তার অভাবে দুর্ভোগের শিকার হন। এ জন্য শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনায় যথাযথ পরিকল্পনা, পদক্ষেপ ও লক্ষ স্থির করে সর্বোচ্চ সংখ্যক সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করার চেষ্টা করে থাকে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মূলত নিম্মোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে[২৮]-

ক. সাধারণ জনগণের অধিকার রক্ষা;

খ. শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান;

গ. যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই;

ক. সাধারণ জনগণের অধিকার রক্ষা (Protection of Civilians Mandate)

সাধারণ জনগণের অধিকার রক্ষা করা শান্তি মিশনের প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে শান্তিমিশন, বেসামরিক জনগণ, সেনাবাহিনী, পুলিশ অন্তর্ভুক্ত । অনেক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী কর্মীদের জনগণকে শারীরিক আক্রমণ ও নির্যাতনের হাত হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সামর্থ ও আয়ত্ত্বের ভিতরে সাহায্যপ্রার্থী দেশের নীতিমালার বাইরে গিয়ে সাহায্য প্রদান করে । POC মূলত নিম্মোক্ত মূলনীতি অনুসরণ করে[২৯] -

- জনগণকে রক্ষা করা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব;
- যেখানে সরকার জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ব্যর্থ, শান্তিকর্মীরা সেখানে তাদের কাজের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে; এবং
- জনগণকে রক্ষা করা কোন মিলিটারি কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটি পুরো মিশনের মূল লক্ষ ।

জনগণের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে বা হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হলে এ কার্যক্রমটি শান্তি মিশন পরিচালনা করে থাকে। শান্তিরক্ষা শুধুমাত্র বল প্রয়োগ বা যুদ্ধের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। বরঞ্চ শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ আলোচনা, কূটনীতি ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়, এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের অধিকার রক্ষায় শান্তিমিশন নিম্নোক্ত পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করে[৩০]-

- সব শান্তিমিশন সংঘাতে লিপ্ত অংশীজনের মধ্যে বৈঠক, মতবিনিময়, রাজনৈতিক আলোচনা, আপোষ, সহায়তা, শান্তিচুক্তি, সরকারকে প্রয়োজনীয় আইনী ও কূটনৈতিক সহায়তা প্রদান করে থাকে । অনেক ক্ষেত্রেই এসব কার্যাবলী দৃশ্যমান না হলেও শান্তিমিশনে এর গুরুত্ব অনেক।
- প্রয়োজনীয় টহলদারি ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিকর্মীরা জনগণের উপরে আক্রমণে বাধার সৃষ্টি করে।
- সর্বশেষে একটি সার্বিক নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশরক্ষা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

POC মিশনের অন্তর্ভুক্ত সকল স্টাফ, মিলিটারি, পুলিশ সদস্যরা এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সরকারি উপদেশ দাতাও এ কার্যক্রমের সমান অংশীদার ।

খ. শিশুদের নিরাপত্তা

শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী মিলিটারী, পুলিশ কর্মকর্তা, সরকারি-বেসরকারি লোকজন সবাই শিশুদের রক্ষায় অবদান রাখেন। শান্তিরক্ষীরা শিশুদের নিরাপত্তার স্বার্থে সংঘর্ষের বলয় চূর্ণ করে শিশুদের জন্য নিরাপত্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। সাংঘর্ষিক পরিবেশ শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশকে রোধ করে। যা সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ, কেননা আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই তাদের স্বাভাবিক বিকাশ, যুদ্ধের কঠোরতা থেকে রক্ষা, যুদ্ধে শিশুদের অংশগ্রহণ রোধ করতে শান্তিরক্ষীরা কাজ করে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদ বিগত শতকের নব্বই দশকে শিশুদের বিষয়টি অনুধাবন করে এবং ১৯৯৯ সালে ১২৬১ নং সনদে গৃহীত হয়, বলা হয়- "personnel involved in United Nations peacemaking, peacekeeping and peace-building activities have appropriate training on the protection, rights and welfare of children"[৩১]। ২০০১ সাল

হতে শিশু নিরাপত্তা বিষয়টি শান্তিরক্ষা মিশনের ম্যান্ডেটভুক্ত হয়ে আসছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষামিশন নিম্মোক্ত কার্যাবলীর মাধ্যমে শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে –

- শিশু নিরাপত্তা উপদেষ্টা [Child Protection Advisers (CPAs)] নিয়োগ;
- শিশু নিরাপত্তাকে মিশনের মূল কার্যক্রম হিসেবে পরিচালনা করা;
- শিশু নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও সন্নিবেশন;
- সন্ত্রাসবাহিনীগুলোর সাথে শিশুদের উপর আক্রমণ ও শিশুদের হিংসাত্মক কার্যক্রমে ব্যবহার না করার জন্য মতবিনিময় করা । দক্ষিণ সুদান ও কঙ্গোতে এমন একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে;
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষামিশনের শীর্ষ কর্মকর্তা সরকারের সাথে শিশু নিরাপত্তা ও অধিকার বিষয়ে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি সুদানের দারফুর এ UNAMID মিশন প্রাক্তন শিশু যোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ড রোধে কাজ করেছে।
- জাতীয় পর্যায়ে শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানে ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে জাতিসংঘ কাজ করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ সুদানে UNMISS শিশুদের সংঘর্ষে ব্যবহার রোধে কাজ করছে ।
- শিশু নিরাপত্তায় নতুন আইন প্রণয়ন। ইতোমধ্যে হাইতিতে জাতিসংঘের মিশনের অধীনে শিশুপাচার রোধে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে রেডিও, টিভি ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, MONUSCO মিশনে শিশুদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে 'Plus jamais de Kadogo' নামক ক্যাম্পেইন।
- শিশুদের উপর্যুক্ত শিক্ষা ও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষে শান্তিরক্ষা মিশনের প্রতিটি কর্মীকে উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সুদানের দারফুরে UNAMID মিশন এ লক্ষে ইউনিসেফ ও অন্যান্য সংস্থার সাথে শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করছে।

যেসব দেশে সংঘর্ষের ফলে শিশুদের উপরে বেশি প্রভাব ফেলছে, সেসব দেশে বিশেষ পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হয়। পরামর্শদাতা শান্তিরক্ষা মিশনের প্রধান কর্মকর্তা, শিশু নিরাপত্তা যেন অগ্রাধিকার দেয়া

হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখায়, শান্তিরক্ষী সেনাবাহিনী শিশুদের সংঘর্ষ হতে রক্ষার ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রাধান্যদান , জাতিসংঘ পুলিশ বাহিনী জাতীয় পুলিশ বাহিনীর সাথে শিশুদের নিরাপত্তায় কাজ করাসহ আইনি সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় আইন পাস ও সহায়তা দিয়ে শিশুদের জন্য নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করেন। বর্তমানে চলমান ৪টি মিশনে- UNMISS, MONUSCO, MINUSMA, MINUSCA শিশু নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিয়োজিত আছেন[৩২]।

গ. যৌন সহিংসতা সর্ম্পকিত সংঘাত (Conflict-Related Sexual Violence)

২০১৭ এর ১৯ মার্চ জাতিসংঘের চেয়ারম্যান বলেন –" যৌন সহিংসতা হলো কোন ব্যক্তির সম্মান, জীবন এবং সমন্বিত শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে হুমকিস্বরূপ"[৩৩]। শান্তিরক্ষামিশনে যৌন সহিংসতা বলতে ছেলে, মেয়ে বা মহিলাদের সাথে ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, যৌন ব্যবসাতে বাধ্য করা, অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ, নির্বাসনে বাধ্য করা অথবা যৌন সহিংসতার সাথে সমতুল্য সংঘটিত কোন অপরাধ[৩৪]। এসকল অপরাধ সংঘর্ষ পূর্ব বা পরবর্তী ঘটতে পারে। শান্তিরক্ষামিশন সাধারণ জনগণের মেন্ডেট বাস্তবায়নে নিরাপত্তা পরিষদের ১৮৮৮ (২০০৯) সনদ অনুসরণ করে একজন Senior Women's Protection Advisor (SWPA) নিয়োগ করা হয়। SWPA যৌন সহিংসতার রোধে যৌন সহিংসতামূলক কাজগুলো পর্যবেক্ষণ ও পরিবেক্ষণ, শান্তি মিশনের মূলধারায় যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াইকে অন্তর্ভুক্তকরণ, সাহায্যপ্রার্থী দেশ ও জাতিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। এসকল কার্যক্রমের ফলে বিগত কয়েক বছরে শান্তিমিশন যৌন সহিংসতারোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। যেমন, MINUSMA মিশনে SWPA দলগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে যৌন সহিংসতার কারণ ও ভুক্তভোগীদের খুঁজে বের করে এবং উদ্ধারকৃতদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার ব্যাপারে সহায়তা করে। ২০২০ সালে সশস্ত্রগোষ্ঠী গুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে ৪৯৭ জন, দক্ষিণ সুদানে ৪৪ জন, মালিতে ২৩ জন এবং কঙ্গোতে ১ হাজার ৩১৩জন শিশুকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসা হয়[৩৫]।

২.৬.২ সংঘাত প্রতিরোধ করা

শান্তিরক্ষী কর্মীরা জনগণের দুর্ভোগ কমাতে সংঘর্ষ প্রতিরোধে সহায়তা করে। স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ একটি সমাজ বিনির্মাণে জনগণকে তাদের সর্বাত্মক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। জাতিসংঘের কর্মীরা সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের সংঘাতপূর্ণ এলাকায় কাজ করে। যেখানে পুলিশ এবং সেনাকর্মকর্তারা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রদানে কাজ করে, অপরদিকে অন্য শান্তিরক্ষী কর্মীরা সংঘর্ষপূর্ণ এলাকায় শান্তি স্থাপনের আবশ্যকীয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে কাজ করে। তৃণমূল পর্যায় থেকে সংঘর্ষের মূল কারণগুলো – বিভাজন, অনৈক্য খুঁজে বের করে সংঘাত প্রতিরোধে কাজ করে। মিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষ ও শান্তিমিশনের কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে সহায়তা প্রদান করেন। শান্তিমিশন সুসংগত পদ্ধতিতে (Coherent method) স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে সংঘাত নিরসনে কাজ করে। যেমন- UNMISS, MINUSCA, MONUSCO মিশন সম্পূর্ণভাবে কমিউনিটিভিত্তিক মিশন[৩৬]। এসব মিশনে অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীগত সংঘাত নিরসনে স্থানীয়দের চাহিদা ও মিশন ম্যান্ডেট এর আলোকে সংঘাত ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের দিকে মিশন অগ্রসর হয়।

স্থানীয় অংশীদারদের অন্তর্ভুক্তকরণ

স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় সংঘাত হ্রাসকরণে মিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তাগণ ব্যাপকভাবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন। স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগ মিশনের নির্দেশনাবলীর প্রয়োগ ও মিশনের কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে তোলে। এ কার্যক্রম সাধারণ জনগণের ঝুঁকি কমায় এবং জীবনযাপন সহজ রাখতে সাহায্য করে[৩৭]। মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে MINUSCA মিশনে বিভিন্ন সাম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ মিশনকে সাফল্য এনে দিতে সাহায্য করেছে।

স্থানীয় সংঘাত ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সংঘাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে জটিল এবং জাতীয় রাজনীতি দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় যা শান্তি মিশনের কার্যক্রমকে ব্যাহত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে থাকে। জমি, পশুপালনসহ বিভিন্ন কারণে

এসব সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। শান্তিরক্ষীগণ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আপোষ-মীমাংসা, মতবিনিময়, সমঝোতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় সংঘাত কমানোর চেষ্টা করেন।

বর্ধিত রাষ্ট্রকে বর্ধিত সহায়তা দান

রাষ্ট্রপক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধি সংঘাত নিরসনের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি। শান্তিরক্ষামিশন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসনের উত্তম অনুকরণীয় কার্যগুলো সম্পাদনে বর্ধিতভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করে। মালি, কঙ্গো, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র মিশনে এ বর্ধিত কার্যক্রম সংঘাত নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। সংঘাত নিরসন মূলত দুটি প্রক্রিয়াতে সম্পন্ন হয়[৩৮]-

ক. সম্প্রদায়গুলোর জন্য দ্রুত ফলাফল নিয়ে আসে এরকম প্রকল্প গ্রহণ এবং

খ. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

ক. দ্রুত ফলাফল প্রকল্প গ্রহণ (Quick Impact Projects, QIPs)

মিশনের কার্যক্রম ও নির্দেশনাবলীতে স্বনির্ভরতা সৃষ্টির লক্ষে এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। QIP এরকম একটি উদ্যোগ। এটি ক্ষুদ্র পরিসরে, স্বল্প ব্যয়ে মিশনের অর্থায়ন দ্বারা স্বল্প সময়ে পরিকল্পনানুযায়ী বাস্তবায়িত হয়। QIP স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন পূরণ করে। এই কার্যক্রমটি মূলত স্থানীয় জনগন, বেসরকারি সংস্থা, দাতব্য সংগঠন, নেতা কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮টি শান্তিরক্ষা মিশনে ১৩.৯ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। QIP কার্যক্রমের উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা দক্ষিণ সুদানে UNMISS মিশনে অস্ত্র বিবর্জিত এলাকা জুবা'তে QIP কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই প্রজেক্টের আওতায় সৌরশক্তি ব্যবহার করে পানি সরবরাহ এবং জুবাতে শাকসব্জি চাষ ও সবুজায়ন করা হয়। মালিতে পরিচালিত MINUSMA মিশন স্থানীয় সংস্থাগুলোকে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে সাহায্য করে। MINUSMA মিশনে ৩টি শ্রেণিকক্ষ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় পুরুষ-মহিলাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়[৩৯]। কোভিড - ১৯ কালীন স্থানীয়দের মধ্যে করোনা রোগ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে মাস্ক ও হাত ধোয়ার সাবান তৈরি করে। MONUSCO মিশনে

প্রতিদিন ২০০০ মাস্ক তৈরি করে স্থানীয়দের মধ্যে বিতরণ করে। যা শান্তি মিশনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, আস্থা অর্জন এবং সর্বোপরি মিশন ম্যান্ডেট অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে [৪০]।

খ. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

পরিবেশগত দিকগুলো খুব কম সংঘর্ষের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু এটা পরিস্কার যে পরিবেশ হতে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার সংঘর্ষের জন্ম দিয়ে থাকে। জাতিসংঘের United Nations Environment Programme (UNEP) এর মতে, গত ৬০ বছরে প্রায় ৪০টি অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ । ১৯৯০ সাল থেকে প্রায় ১৮টি সংঘাতের কারণ গাছ, হীরক , তেল, স্বর্ণ, জ্বালানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ[৪১]। অপরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের কারণে পরিবেশ বিপর্যের ঘটনা ঘটছে যা নিরাপত্তা পরিষদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে আসছে। শান্তিরক্ষা মিশন স্থানীয় সম্পদ নিয়ে কোন সংঘর্ষের সুত্রপাত যেনো না হয় সেটি নিশ্চিত করে এবং সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। প্রতি বছর ৬ই নভেম্বর জাতিসংঘ International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict পালন করে।

২.৬.৩ আইনের শাসন ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান বির্নিমাণ

স্থায়ীভাবে শান্তি ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রধান উপাদান। পরিকল্পনা ও লক্ষ স্থির করে সংঘর্ষপূর্ণ এলাকায় এই কার্যক্রম চালানো হয়। জাতিসংঘ শান্তিবাহিনী জনগণের নিরাপত্তাপ্রদান ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলোতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আইনের শাসন বাস্তবায়নে শান্তিরক্ষী মিশন বেশ কিছু বিষয় বা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, খাতগুলো হলো [৪২]-

১. পুলিশী কার্যক্রম
২. মাইন অপসারণ
৩. নিরস্ত্রীকরণ ও পুনঃএকত্রীকরণ
৪. নিরাপত্তা খাত সংস্কার এবং
৫. বিচারিক ও সংশোধন কার্যক্রম।

United Nations Office of Rule of Law and Security Institutions (UNOROLSI) সংস্থাটি শান্তিরক্ষা মিশন বিভাগের অন্তর্গত করা হয় ২০০৭ সালে। UNOROLSI - এর মধ্যে পুলিশ, বিচার এবং সেবা বিভাগ জাতিসংঘের মাইন কার্যক্রম ছাড়াও আরো অনেক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১৫ হাজার কর্মী কাজ করে যাচ্ছেন। পুলিশ, শান্তিরক্ষী কর্মীরা এবং দেশীয় সংস্থাসমূহের কর্মীগণ নিয়মিত সংঘর্ষপূর্ণ এলাকায় টহল দেন এবং পর্যবেক্ষণ করেন। অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা সাধারণ মানুষদের বিস্ফোরণ থেকে বাঁচার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তেমনি, আইনি সহায়তা প্রদানকারি কর্মকর্তাগণ আইনের আওতায় সকল নাগরিকদের সমান অধিকার দেয়ার মাধ্যমে সহায়তা দান করে। UNOROLSI হলো সম্পূর্ণ প্রাথমিক ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম। বর্তমানে ১০টি[১] শান্তিরক্ষা মিশনে এবং ১১টি[২] বিশেষ রাজনৈতিক মিশনে এ অফিস কাজ করছে। UNOROLSI এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সুরক্ষা প্রদান, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে চলেছে। UNOROLSI ভুক্ত দলগুলো সাতদিনের মধ্যে যেকোনো নতুন মিশনে কার্যক্রম শুরু করতে পারে এবং দ্রুততার সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে[৪৩]।

শান্তিরক্ষার বৈশ্বিক কেন্দ্রীয় লক্ষ হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। এই প্রচেষ্টার সাথে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা জড়িত। United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), UN Women এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা অংশীজনের অন্তর্ভুক্ত। ২০১২ সাল থেকে মাঠপর্যায়ের শান্তিরক্ষীদের পুলিশি কার্যক্রম ও মাইন অপসারণ কার্যক্রমকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

[১] MINUSCA (মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র), MINUSMA (মালি), MONUSCO (কঙ্গো), UNMISS (দক্ষিণ সুদান), UNISFA (আবেয়, দক্ষিণ সুদান), UNFICYP (সাইপ্রাস), UNMIK (কসভো), MINURSO (পশ্চিম সাহারা), Ges UNIFIL (লেবানন).

[২] INUH (হাইতি), UNSOM (সোমালিয়া), UNSMIL (লিবিয়া), UNAMI (ইরাক), UNAMA (আফগানিস্তান), UNIOGBIS (গিনি বিসাউ), UNOAU (আফ্রিকান ইউনিয়ন), UNOWAS (পশ্চিম আফ্রিকা ও শাহেল), UNVMC (কলম্বিয়া), OSESG Y (ইয়েমেন), OSESG-B (বরুন্ডি)

চিত্র ২.৫

OROLSI ভুক্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশন ও বিশেষ রাজনৈতিক মিশন, ২০১৯

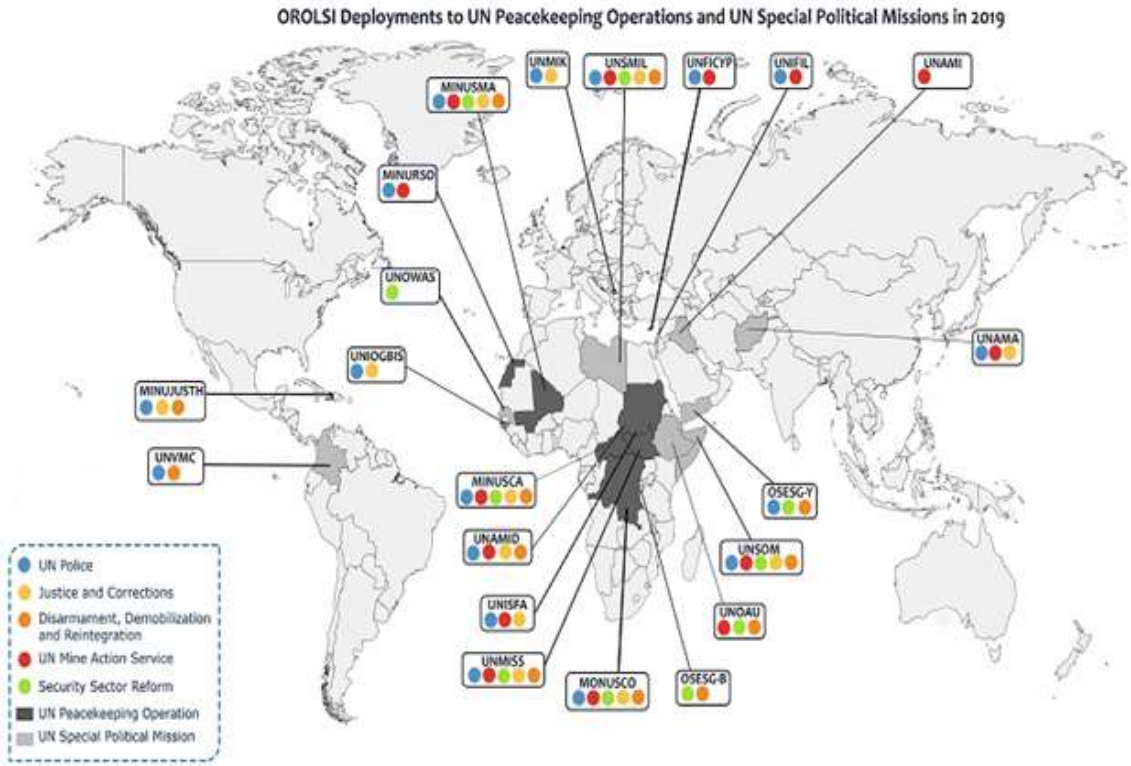

সুত্রঃ https://peacekeeping.un.org/en/building-rule-of-law-and-security-institutions, প্রবেশ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৯।

২.৬.৪ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা

মানবাধিকার হলো জাতিসংঘের মূলভিত্তি। শান্তিরক্ষা মিশনের সকল কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও অন্যতম লক্ষ হচ্ছে তাদের কাজের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা। বেশিরভাগ বহুমুখী শান্তিরক্ষামিশনে মানবাধিকার কর্মীদল পুরো মিশনে মানবাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী প্রণয়ন ও প্রয়োগে কাজ করেন। শান্তিরক্ষামিশনে মানবাধিকার কর্মীদের লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো [৪৪]-

- অস্থায়ী ও স্থায়ীরূপে মানবাধিকার রক্ষা ও প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে কাজ করা
- জনগণের ক্ষমতায়নে কাজ করা;
- রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবাধিকার সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

বর্তমানে মানবাধিকার কর্মীর ৬টি দল শান্তিরক্ষামিশন এবং ৫টি বিশেষ রাজনৈতিকমিশনে কাজ করে যাচ্ছে[৩]। Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) বিশেষজ্ঞ নিয়োগে এবং তাদের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত নির্দেশনাবলী দ্বারা মানবাধিকার রক্ষায় অবদান রাখে। জাতিসংঘের মানবাধিকার অনুচ্ছেদের আওতায় শান্তিরক্ষামিশন নিম্নোক্ত অবিচ্ছেদ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে[৪৫] -

- মানবাধিকার সংরক্ষণ পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও অন্তর্ভুক্তকরণ;
- প্রাথমিক সতর্কতা গ্রহণের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ করা;
- মানবাধিকার সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সক্ষমতা সমর্থন, জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া তৈরি ও শক্তিশালীকরণকে সমর্থন। সাহায্যপ্রার্থী সরকার, জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘনের প্রতিক্রিয়া জানানো;
- অন্যান্য মিশন দলগুলোকে তাদের বাধ্যতামূলক কাজে মানবাধিকার সংহত করতে পরামর্শ দেওয়া এবং সহায়তা করা ।

২.৬.৫ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় নারীর অন্তর্ভুক্তিকরণ

জাতিসংঘ শান্তি ও নিরাপত্তার সকল স্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। এই লক্ষ অর্জনে জাতিসংঘ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বাধা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলা করে, যা শান্তি অর্জন এবং শান্তি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। এটি সুপরিচিত যে, সহিংস সংঘাত নারী ও মেয়ে শিশুদেরকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রাক-বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য এবং সাধারণ বৈষম্যকে আরও তীব্র করে তোলে[৪৬]। ২০০০ সালে নিরাপত্তা পরিষদের ১৩২৫ সনদে জাতিসংঘের সকল শান্তিমিশন কার্যক্রমে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তার (Women, Peace and Security) বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা হয়[৪৭]। শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টার সাফল্য এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘের শান্তিমিশনের সকল ক্ষেত্রে নারীর বিভিন্ন বোঝাপড়া, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার স্বীকৃতি ও

[৩] শান্তি মিশন গুলো হলো- MONUSCO (ডি আর কঙ্গো), MINUSCA (মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র), MINUSMA (মালি), UNAMID (দাফুর), UNMISS (দক্ষিণ সুদান), এবং UNMIK (কসভো)। জাতিসংঘের বিশেষ রাজনৈতিক মিশনগুলো হচ্ছে- UNAMI (ইরাক), UNSMIL (লিবিয়া), UNIOGBIS (গিনি বিসাউ), UNSOM (সোমালিয়া) এবং UNAMA (আফগানিস্তান)।

সংহতকরণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। ডিপার্টমেন্ট অব পিস অপারেশনস (DPO) এবং ডিপার্টমেন্ট অব অপারেশনাল সাপোর্ট (DOS) তাদের সকল নীতিমালা ও কাজে লিঙ্গসমতা এবং নারীদের শান্তি এবং নিরাপত্তা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে[৪৮]।

জেন্ডার পরামর্শদাতাদের কাজের অন্তর্ভুক্তকরণ

জেন্ডারসমতা এবং নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে সিনিয়র নেতৃত্বকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং সকল কর্মীর জবাবদিহিতা ও সম্মতি নিশ্চিতকরণে জেন্ডার পরামর্শদাতাগণ কাজ করে থাকেন। লিঙ্গ সমতা এবং নারী নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য জাতিসংঘের সকল শান্তিরক্ষী কর্মী বেসামরিক, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জেন্ডার পরামর্শদাতাগণ কাজ করে থাকেন।

বিশেষত, জেন্ডার পরামর্শদাতারা লিঙ্গ সমতা, নারীর নিরাপত্তা ও সার্বিক ক্ষতায়নে কাজ করে থাকেন। শান্তি মিশনের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে মিশন শুরুর সময়, কৌশলগত পর্যায়, আদেশ বাস্তবায়ন ও রূপান্তর পর্যায়ে নেতৃত্ব ও নীতিমালা প্রণয়ন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন, সংঘাত প্রতিরোধ, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ, জাতীয় প্রশাসন ও সুরক্ষা খাতে নারীর অর্ন্তভুক্তির পক্ষে কাজ করে। যৌনতা ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা থেকে নারী ও মেয়েদের সুরক্ষার পরিবেশ তৈরি, ন্যায়বিচার এবং সংশোধনকারী সংস্থাগুলিকে শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নের পক্ষে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

২.৬.৬ মাঠপর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান

শান্তিমিশনের কার্যকারিতা অপারেশনে প্রাপ্ত কারিগরি, কৌশলগত ও মানবিক সহায়তার উপর নির্ভর করে। অপারেশনাল সাপোর্ট বিভাগ দ্রুত, কার্যকর, দক্ষ এবং দায়বদ্ধভাবে র্নিবিঘ্নে সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদান করে শান্তি কার্যক্রম সফল করতে সহায়তা করে। বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক পরিবেশে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের বাইরের অংশীজন একসাথে কাজ করে থাকে। মাঠপর্যায়ে সহযোগিতা কার্যক্রম বহুমাত্রিক এবং বিভিন্ন কমিটি ও সাব সেক্টরে বিভক্ত হয়ে কার্য সম্পাদন করে থাকে। বলা হয়ে থাকে শান্তি মিশনের সফলতা মাঠপর্যায়ের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ৩০টি দেশে ২৭০টি স্টেশনে জাতিসংঘের কর্মীগণ এ কাজে সম্পৃক্ত রয়েছে[৪৯]। কর্মীগণ

মাঠ পর্যায়ে নিজস্ব প্রশাসনিক কার্য, বাজেট ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নজরদারি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মতো জটিল ও বহুমাত্রিক কাজ একটি বহুজাতিক কর্ম পরিবেশে সম্পাদন করে, লক্ষ থাকে মিশন ম্যান্ডেট পূরণের মাধ্যমে সংঘাতগ্রস্ত রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপন করা। শান্তি মিশনের মাঠপর্যায়ের বহুমাত্রিক কার্যক্রমকে নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো যেতে পারে ঃ

টেবিল নং-২.২

শান্তি মিশনের মাঠপর্যায়ের বহুমাত্রিক কার্যক্রম

খাত	কার্যক্রম	খাত	কার্যক্রম
বাজেট এবং ফিন্যান্স	● বাজেট উন্নয়ন; অর্থ ছাড়; ● দাবি মিটানো ও ● ট্রাস্ট তহবিল পরিচালনা	বিমান পরিবহন	● বিমান পরিবহন এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ; ● বিমান নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা;
ইউনিফর্মড কর্মী	● সৈন্য মোতায়েন; ● সৈন্যদের সুযোগ সুবিধা দেখভাল করা; ● মৃত্যু এবং শারীরিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত/ অক্ষমতার দাবি মিটানো;	ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা	● মাঠ পর্যায়ে অফিস থাকার ব্যবস্থা; ● ক্যাম্প সুবিধা; ● নির্মাণ সেবা;
সম্পদ ব্যবস্থাপনা	● ক্রয় সহায়তা; সম্পদ এবং ইনভেন্টরি পরিচালনা; ● কৌশলগত লজিস্টিক সরবরাহ ব্যবস্থাপনা	নজরদারি এবং ঝুঁকি	● নিরীক্ষণ ব্যবস্থাপনা; ● ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং ● শৃঙ্খলা বোর্ডগুলোর তদন্ত
তথ্য প্রযুক্তি	● আইটি ও হার্ডওয়্যার অবকাঠামো ● অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন; ● জিও তথ্য পরিসেবা ব্যবহারকারীর সমর্থন	স্থল এবং নৌ পরিবহন	● স্থল পরিবহন; ফ্লিট রক্ষণাবেক্ষণ; ● নৌ- পরিবহন;

সুত্রঃ United Nation Peacekeeping, peacekeeping mission, At https://peacekeeping.un.org/en/ প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২১ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

২.৬.৭ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় তরুণদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

সহিংস সংঘাতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয় যুব সমাজ। তারা শুধু তাদের শিক্ষা, কর্ম , জীবনের স্বপ্নকে হারায় না, অধিকন্তু নিজেদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়। যুবক পুরুষ ও মহিলা উভয়ই সহিংস দ্বন্দ্বের যেমন শিকার তেমনি তাদের অংশগ্রহণ সহিংসতাকে বাড়িয়ে দিতে বা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে রূপান্তরে সাহায্য করে। শান্তি আলোচনায় যুবকদের বাইরে রেখে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের শান্তি মিশনগুলো পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্ম হতে শান্তি মিশন অধিকতর অসামরিক এবং বহুমাত্রিকভাবে সমাজের সকল স্তরের নারী পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুব, শান্তি ও নিরাপত্তা (Youth, Peace and Security) বিষয়ক যুগান্তকারী প্রস্তাব (নং ২২৫০/২০১৫) গৃহীত হয়। বলা হয়, "সংঘাত প্রতিরোধ এবং সমাধানে, শান্তিরক্ষা এবং শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টার স্থায়ীত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং সাফল্যে তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে[৫০]"। নিরাপত্তা পরিষদ এ প্রস্তাব আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা উন্নয়নে তরুণদের ভূমিকাকে ৫টি উপায়ে চিহ্নিত করে – অংশগ্রহণ, সুরক্ষা, প্রতিরোধ, অংশীদারিত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং পূনঃএকত্রীকরণ (Participation, Protection, Prevention, Partnerships and Disengagement & Reintegration)। ২০১৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদের ২৪১৯ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২০২০ সালে নিরাপত্তা পরিষদের ২৫৫৩ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনের এজেন্ডায় তরুনদের শান্তি ও নিরাপত্তা (Youth Peace and Security, YPS) অন্তর্ভুক্ত হয়[৫১]। বর্তমানে নারী ও শিশু বিষয়ের মতো তরুণদের বিষয়টি শান্তিরক্ষা মিশনের ম্যান্ডেটে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

২.৬.৮ সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধান

রাজনীতি হচ্ছে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের একটি অন্যতম ক্ষেত্র। জাতিসংঘ শান্তিমিশন সংঘাতগ্রস্থ রাষ্ট্র জাতীয়ভাবে যে রাজনৈতিক সমাধানটি চায় কিংবা যে প্রক্রিয়াটিকে সমাধানের জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক অংশীজন পছন্দ করে সেটাকে সমর্থন করে এবং এ প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। তৃতীয় প্রজন্মের শান্তিমিশনগুলো সরাসরি শারিরীকভাবে নিরাপত্তার হুমকী বা সংঘাত প্রশমনে সামরিক উপায়ে শান্তি স্থাপনে অনুমতি প্রদান করে, অন্যথায় অসামরিক পন্থায় রাজনৈতিক সমাধানের পন্থাকে সর্বোচ্চ জোর দিয়ে থাকে। শান্তিরক্ষীরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত দলগুলোর মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখে এবং

শান্তিচুক্তিতে দলগুলোকে অন্তর্ভুক্তির জন্য আলোচনা (ডায়লগ) চালিয়ে যায়। এ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিমিশন কমিউনিটি ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত দলগুলোর মধ্যে আস্থা অর্জনে চেষ্টা করে এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় হতে মধ্য স্তরে এবং পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়। তারা একটি টেকসই রাজনৈতিক সমাধানের নকশা প্রণয়ন করে এবং স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক অংশীজনের সমন্বয় ও সহযোগিতায় সংঘাত সমাধান, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইনের শাসন. মানবাধিকার সমুন্নত রেখে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চলমান করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক এ উদ্যোগের সফল ও দৃশ্যমান উপলব্ধি হয় জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণের মধ্যে দিয়ে।

১৯৪৮ সালের পর হতে জাতিসংঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে টেকসই শান্তি স্থাপন করেছে বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সচল করেছে। পূর্ব তিমুর, সুদান, লাইবেরিয়া, কম্বোডিয়া, এঙ্গোলা, ক্রোয়েশিয়া, সিয়েরালিয়নে সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানে শান্তিরক্ষীরা কাজ করেছে। দীর্ঘ স্থায়ী শান্তি অর্জনে কোন কোন ক্ষেত্রে শান্তিমিশন পরবর্তী বিশেষ রাজনৈতিক মিশনও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৫৪টি দেশ এবং ৪টি সহযোগী সংগঠন Declaration of share Commitments on Peacekeeping স্বাক্ষর করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আন্তঃসম্পর্কিত একটি সংস্কার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন, যা Action for Peacekeepers (A4P) নামে পরিচিত। A4P নামক কার্যক্রম শান্তি ও নিরাপত্তা পিলারে কাঠামো ও কার্যগত সংস্কার করা হয়। বলা হয় DPPA ও DPO জাতিসংঘের শান্তি ও নিরাপত্তার সক্ষমতাকে একটি একক রাজনৈতিক কাঠামোর (single political operational structure) আওতায় নিয়ে এসে একটি সাধারণ লক্ষে কাজ করবে, যেখানে সহিংস সংঘাত এবং এর নেতিবাচক প্রভাব রোধ করে একটি শক্তিশালী অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে যা আগামী প্রজন্মকে শান্তির ফলাফল ভোগে সহায়ক হবে। শান্তি প্রক্রিয়ার এ কাঠামোতে নারীদের সমান ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকবে। রাজনৈতিকভাবে সংঘাত নিরসন ও শান্তি অর্জনের এ কাঠামোটির নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে[৫২]-

ক. স্থায়ী শান্তি অর্জনে সহায়তা করা;

খ. রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করা (নির্বাচন অনুষ্ঠান);

গ. বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করা;

ঘ. জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়. মালি, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, সুদান, দক্ষিণ সুদান, পূর্ব তিমুরের সংঘাত নিরসনে শান্তিরক্ষী বাহিনী সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করেছে এবং চূড়ান্তভাবে বিদ্যমান সংঘাত নিরসন হয়েছে। একইভাবে, জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে রাজনৈতিক সমাধানকে গুরুত্বারোপ করে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি ম্যান্ডেটভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯১ হতে ২০১১ পর্যন্ত ২৬টি[৫৩] মিশনে রাজনৈতিক সমাধানের অংশহিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানকে মিশনের ম্যান্ডেটভুক্ত করা হয়। নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় কিন্তু স্থায়ী শান্তি বা গণতন্ত্রায়ন হয়েছে কিনা এ নিয়ে গবেষক ও বিশ্লেষকদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। যেমন, ২০১০ সালের জাতীয় নির্বাচন এবং ২০১১ সালের গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হয়, কিন্তু অদ্য একযুগ পর ২০২১ সালে এসেও দক্ষিণ সুদানে শান্তি মিশন চলমান রয়েছে [৫৪]।

২.৭ জাতিসংঘের নির্বাচনী সহযোগিতা কর্মসূচীর কাঠামো ও কর্মপন্থা

১৯৯১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব[৫৫] অনুসারে জাতিসংঘ কর্তৃক সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে প্রয়োজানুসারে নির্বাচনী সহায়তা (Electoral Assistance) চালু হয়। এ কর্মসূচির বিষয় কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেন রাজনৈতিক বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল (Under-Secretary-General for Political Affairs)। নির্বাচনের নীতি ও সহযোগিতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা তাঁর দায়িত্ব। জাতিসংঘের Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA) এর নির্বাচনী সহায়তা বিভাগ (Electoral Assistance Division, EAD) নির্বাচনী সহায়তার প্রক্রিয়া, নকশা প্রণয়ন, কর্মী নিয়োগ এবং নির্বাচনী কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠানিক রূপদান এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরকে সহযোগিতা করে থাকে[৫৬]।

জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তা কেবল সংশ্লিষ্ট সদস্য রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট অনুরোধে বা নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ পরিষদের আদেশের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট অনুসারে নির্বাচনী সহায়তার বিষয়ে সম্মতি জানানো এবং সহযোগিতা করার আগে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন করে নিশ্চিত হয় যে সহায়তাটি দেশের নির্দিষ্ট প্রয়োজন বা পরিস্থিতি অনুসারে তৈরি হয়েছে কি-না। নির্বাচনী সহায়তা ক্ষেত্রে জাতিসংঘ স্বীকার করে যে নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব সদস্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমুহের অন্তর্গত, এখানে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন পরিচালনার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনী সহায়তার ক্ষেত্রে ইউএন এর Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA) এর নেতৃত্বে UNDP সহ ইউএন পরিবারের অনেকগুলো সংস্থা[৫৭] সমন্বিত ভাবে কাজ করে যা জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিয়েছে।

সাধারণত তিনটি উপায়ে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের নির্বাচনী সহায়তায় সাড়া প্রদান করে থাকে[৫৮] -

১) সদস্য রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ (রাষ্ট্রীয় বিভাগ, যেমন- শাসন বিভাগ, নির্বাচন কমিশন) কর্তৃক নির্বাচনী সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে;

২) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং;

৩) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সনদের ম্যান্ডেট অনুসারে।

প্রথম দুটি ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের আইনানুগ ও প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচনী সক্ষমতা ও প্রয়োজন মূল্যায়ন করে সহায়তায় সম্মতি দেওয়া হয় এবং প্রয়োজান অনুযায়ী টেকনিক্যাল ও লজিস্টিক সহায়তার কর্মসূচি সাজানো হয়। এ ধরনের নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচি বেসামরিক, আর্থিক, কারিগরি ও পর্যবেক্ষক নির্ভর। তথা নিরাপত্তার বিষয়টি এখানে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। এরকম সহায়তা স্বল্পমেয়াদি এবং অনেকটা নির্বাচনকালীন। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (United Nations Development Program, UNDP) নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম উপায়ে সদস্য রাষ্ট্রের নির্বাচনী দায়িত্ব প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা (যেমন – নির্বাচন কমিশন, নির্বাহী বিভাগ, আদালত) ব্যতীত কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ নির্বাচনী সহায়তায় সাড়া প্রদান করে না। অপর দিকে, নিরাপত্তা পরিষদের সনদের ম্যান্ডেট অনুসারে জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তা অনেকটা সমন্বিত

এবং নিরাপত্তা বিষয়টি এ ক্ষেত্রে জড়িত। অর্থাৎ নির্বাচনের কৌশলগত, রসদ সহায়তার পাশাপাশি সামগ্রিক নিরপত্তার প্রশ্নটি জড়িত থাকে। এ ধরনের সহায়তা দীর্ঘমেয়াদি এবং সামরিক ও বেসামরিক কৌশলগত এবং সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট দ্বারা পরিচালিত। শান্তিরক্ষা বা দ্বন্দ্বপরবর্তী সমাজে নির্বাচনী সহায়তা Department of Peacekeeping Operation বা Department of Political Affairs বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত মিশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়[৫৯]। এ দুটি বিভাগের বাইরে সংঘাত বা দ্বন্দ্বে লিপ্ত রাষ্ট্রে নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচিতে UNDP নির্বাচনী আইন, প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণে মূখ্য সহযোগী হিসেবে কাজ করে। এছাড়া, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা[৪] গণতন্ত্রের সমর্থনে কাজ করে থাকে।

১৯৯১ সাল থেকে ১০০টিরও বেশি দেশ জাতিসংঘ নির্বাচনী সহায়তার অনুরোধ করে এবং গ্রহণ করে[৬০]। ১৯৯০-এর দশকে, জাতিসংঘ বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ তিমুর-লেস্টে, দক্ষিণ আফ্রিকা, মোজাম্বিক, এল সালভাদোর এবং কম্বোডিয়ায় অংশগ্রহণপূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ, তদারকি বা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করে। সাম্প্রতিককালে, আফগানিস্তান, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইরাক, নেপাল, সিয়েরা লিওন এবং সুদানসহ অনেক দেশে মাইলফলক নির্বাচনে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত এবং রসদ সহায়তা প্রদান করে। আলোচিত ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ নির্বাচনগুলোর প্রায় সবকয়টি নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত ম্যান্ডেট অনুসারে DPPA'র আওতাধীন শান্তিমিশন দ্বারা পরিচালিত এবং পর্যবেক্ষিত। এসকল নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি, রাষ্ট্রগঠন এবং জাতিগত অন্তঃ ও আন্তঃ দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান ঘটাতে সহায়ক হয়। তাই সহিংস দ্বন্দ্বের অবসান হলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরিবেশ তৈরি হতে পারে। এ পরিবেশ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণে সহায়ক হয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। আপাত দৃষ্টিতে জাতিসংঘ শান্তিমিশন শুধু দ্বন্দ্ব নিরসনে বা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে DPPA'র তত্ত্বাবধানে

[৪] এসব সংস্থার মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হচ্ছে- United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations Democracy Fund (UNDEF), Department of Peacekeeping Operations (DPO), Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), এবং United Nations Entity for Gender Equality, Empowerment of Women (UN Women) ।

নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট অনুসারে শান্তিমিশনগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের স্থায়ী সমাধান প্রতিষ্ঠায় এবং জাতিসংঘের শান্তিমিশনের সফল পরিসমাপ্তিতে ভূমিকা রাখে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সনদ (প্রস্তাব) অনুসারে নির্বাচনী মিশন পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন, জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি (Special Representative of Secretary General, SRSG)। এসআরএসজি'র নেতৃত্বে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশে মাঠ পর্যায়ে অফিস স্থাপন করে যা Good Office[৫] নামে পরিচিত। Good Office এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাব সেক্টরে শান্তিরক্ষীরা কাজ করে থাকে। Good Office এর আওতায় ছয়টি সাব সেক্টর– রাজনৈতিক বিষয়ক, নাগরিক বিষয়ক, মানবাধিকার বিষয়ক, জেন্ডার, তথ্য ও যোগাযোগ এবং আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সাবসেক্টরের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে শান্তিমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের এ সকল কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় অসামরিক পন্থায় ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী নিজস্ব শান্তি কাঠামো গড়ে উঠে। লক্ষণীয় যে, প্রতিটি সাবসেক্টরের কার্যক্রম অপর সাব সেক্টরের সাথে যৌথভাবে জড়িত এবং সমন্বিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের লক্ষে পরিচালিত।

[৫] বহুমাত্রিক শান্তি মিশনে রাজনৈতিক সমঝোতা এবং ঝুঁকি প্রশমনে মাঠ পর্যায়ে Department of Political and Peacebuilding Affairs একটি দপ্তর স্থাপন করে থাকে, যা Good Office নামে পরিচিত। প্রত্যয়টি দ্বারা এমন একটি দপ্তরকে বুঝানো হয় যেখানে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা দ্বন্দ্বে জড়িত পার্টিগুলোকে তাদের দ্বন্দ্ব/সংকট হতে উত্তরণে ও সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে নিরপেক্ষভাবে সহযোগিতা করা হয়। এটি শুধু মধ্যস্থতা নয় বরং আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।যেখানে বিরোধে জড়িত প্রত্যেকটি পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি বা সরকার বিরোধী পক্ষ হতে তথ্য আদান প্রদান এবং যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। এ দপ্তরটি বিশেষজ্ঞ স্টাফ দ্বারা পরিচালিত মিশনের মাঠ পর্যায়ের সমন্বিত অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র - ২.৬

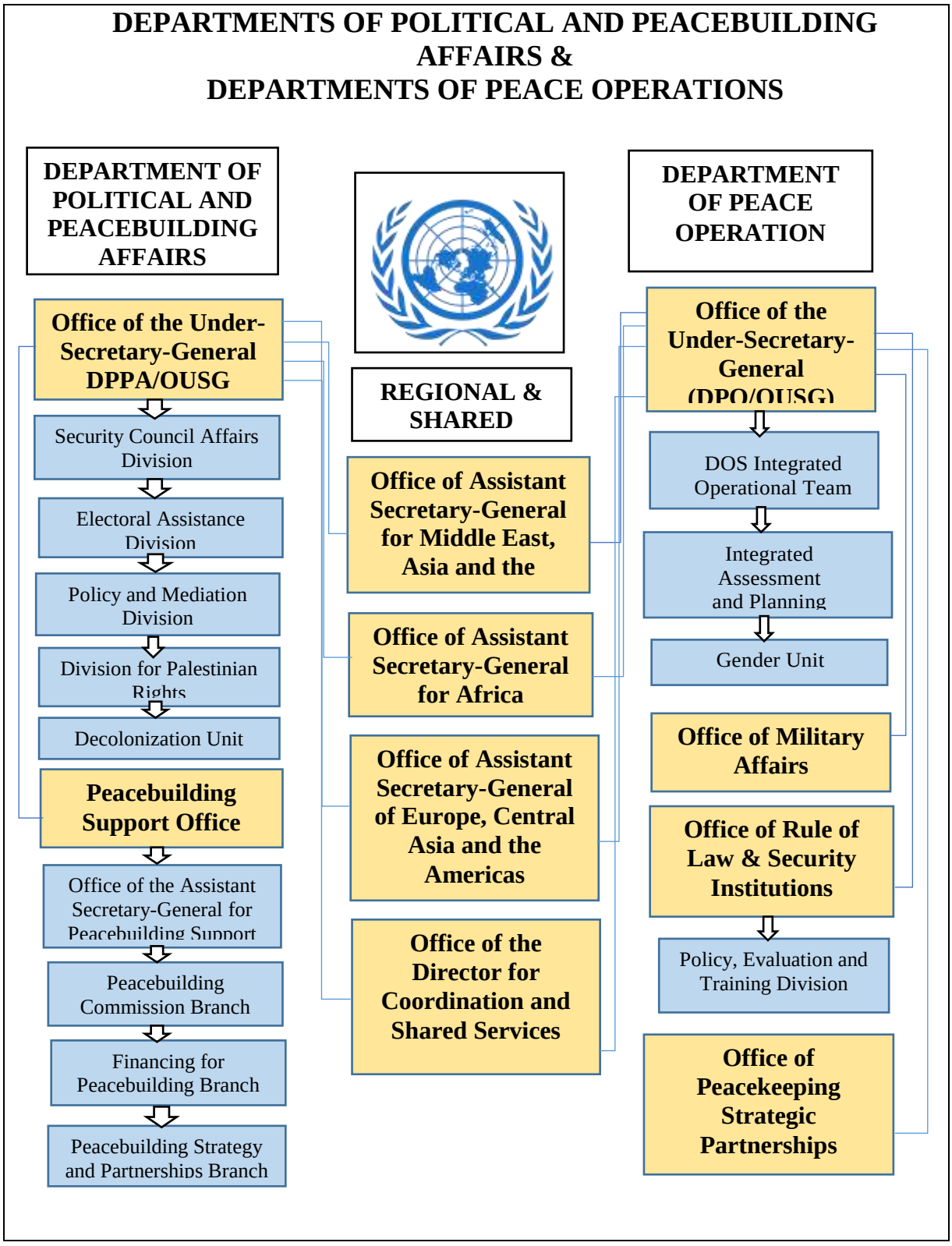

উৎস: https://peacekeeping.un.org/en/department-of-peace-operations, প্রবেশ ২১ নভেম্বর, ২০২০।

নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত মিশনসমুহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের ক্রমবিন্যাস ও দায়িত্ব নিচের ছকে তুলে ধরা হলো -

চিত্র - ২.৭
নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত মিশনসমূহের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম

DPPA & DPO

SRSG

GOOD OFFICE

উপ শাখা	রাজনৈতিক বিষয়ক	নাগরিক বিষয়ক	মানবাধিকার	জেন্ডার	তথ্য ও যোগাযোগ	আইনশৃঙ্খলা
কার্যক্রম	নির্বাচনী আচরণ, বিধিসহ আইন প্রণয়নে সহায়তা	নাগরিক সচেতনতা	ভোট পর্যবেক্ষণ	নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ	পুলিশী কার্যক্রম
	রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ	দ্বন্দ্ব প্রশমন ও মধ্যস্থতা	আইনানুগ রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকরণ	নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা	নির্বাচনী প্রচার ও নাগরিককে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ	মিলিটারী কার্যক্রম
	যোগাযোগ রক্ষণাবেক্ষণ	ঝুঁকি মূল্যায়ন	অন্যান্য ইউনিটের সহিত সমন্বয় করণ	নির্বাচনী সহিংসতা ও জেন্ডার	অন্যান্য ইউনিটের সাথে সমন্বয়	অন্যান্য ইউনিটের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয় এবং সহায়তাদান
	নির্বাচন পরবর্তী ফলোআপ	নির্বাচনী প্রতিধন্দ্বিতায় উদ্বুদ্ধকরণ		নির্বাচনী সচেতনতা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা		
	অন্যান্য ইউনিটের সাথে সমন্বয়	অন্যান্য ইউনিটের সাথে সমন্বয়		অন্যান্য ইউনিটের সাথে সমন্বয়		

উৎস: https://peacekeeping.un.org/en/department-of-peace-operations, প্রবেশ ২১ নভেম্বর, ২০২০- প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

বহুমাত্রিক শান্তি বিনির্মাণ মিশনে (Peace building mission) নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের অসামরিক সমাধান আয়োজনে শান্তিরক্ষীদের শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল অনুসৃত হয়। কৌশল দু'টি হলো [৬১]-

টেবিল ২.৩

শান্তিরক্ষামিশন কর্তৃক শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কৌশল		
ক্র. নং	কৌশল	কার্যক্রম
১	নাগরিক অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষা	সংবিধান, আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নে পরামর্শ; প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রেনিং ও পরামর্শদান; রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও নির্বাচনমুখীকরণ; আইনের শাসন ও মানবাধিকার উৎসাহিতকরণ;
২	নির্বাচন অনুষ্ঠান	রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, ভোটার তালিকা তৈরি, সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা; ফলাফল প্রকাশ ও প্রত্যয়ন।

উপরোক্ত কৌশল দুটির কোন একটির বাস্তবায়ন শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নকে নির্দেশ করে না, যেমন– নির্বাচন আয়োজন না করে শুধু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে দ্বন্দ্ব নিরসন হয় না। দু'টি কার্যক্রমকে একইসাথে পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম কার্যটি তথা নাগরিক অধিকারের প্রসার এবং সুরক্ষার মাধ্যমে নির্বাচনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, আস্থা অর্জন এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধপূর্ণ সকল গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে শান্তিরক্ষীরা কাজ করে। বলা যেতে পারে এ কৌশলটি নির্বাচন পূর্ববর্তী কার্যক্রম (pre-election activities) যাহা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাঠামো গড়ে উঠে। এ কৌশলটি বাস্তবায়ন দীর্ঘমেয়াদি এবং চলমান। দ্বিতীয় কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নির্বাচনকেন্দ্রিক। এ কার্যটি নির্বাচনের মাঠে সবার অংশগ্রহণ, সমপ্রতিযোগিতাপূর্ণ, ভয়ভীতি ব্যতিরেকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজন, নির্বাচনের ফলাফল সকল পক্ষ কর্তৃক মেনে নেয়া এবং নির্বাচন পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা ও সহিংসতা প্রশমনের কার্যাবলীকে অর্ন্তভুক্ত করে। দ্বিতীয় কৌশলটি নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচন পরবর্তী কার্যক্রমকে (election day and post-election activities) নির্দেশ করে। তত্ত্বগত ভাবে এসআরএসজি'র নেতৃত্বে স্থানীয় Good Office ৬টি[৬২] সাব সেকশনের মাধ্যমে সমন্বিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করে। এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা সাবসেকশনটি সরাসরি সেনা ও পুলিশি কাজের সহিত জড়িত থাকলেও অপর পাঁচটি সাব সেকশনের কাজের নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বেসামরিক কর্মীদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের আয়োজন ও স্থায়ীত্ব নিশ্চিতকরণসহ সর্বোপরি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পোশাকধারী শান্তিরক্ষীদের উপর বর্তায়।

অসামরিক পন্থায় শান্তি অর্জনে রাজনৈতিক উদ্যোগ টেকসই শান্তি স্থাপনের অন্যতম। এ পন্থাটি জটিল এবং অন্যান্য সকল পন্থাকে একীভূত করে। সামরিক পন্থায় যুদ্ধ বিরতি বজায় রেখে স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে মানবাধিকার, আইনের শাসন, শিশু ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। যুদ্ধ বিরতি বজায় রেখে একটি স্থিতিশীল নাগরিক সুরক্ষা পরিবেশ নিশ্চিতে সামরিক পোশাকধারী শান্তিরক্ষীদের উপস্থিতি যেমন অপরিহার্য তেমনি শান্তি অর্জনের অসামরিক পন্থা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সচল ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানবাধিকার, আইনের শাসন, নারীর অংশগ্রহণ, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মিডিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণে বহুমাত্রিক কাজ বাস্তাবায়নে বেসামরিক শান্তিকর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য সামরিক পোশাকধারী শান্তিরক্ষীদের উপস্থিতির ও গুরুত্ব অপরিহার্য। সহিংস সংঘাত বন্ধ এবং যুদ্ধবিরতি বজায় না থাকলে অসামরিক পন্থার কোন কাজই পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আর একটি অবাধ নিরপেক্ষ স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব শর্ত হলো একটি নিরাপদ পরিবেশ যেখানে সকল অংশীজন সহিংস ঝুঁকিমুক্ত এবং নিরাপত্তার বিষয় কর্তৃপক্ষের উপর আস্থাশীল।

উপসংহার

শান্তিমিশনের কর্মকাণ্ড, মূলনীতি এবং নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনের কর্মকৌশল আলোচনা হতে দেখা যায়। সংঘাতের ধরনের ভিত্তিতে শান্তিমিশনের ধরন তথা ম্যান্ডেটের তারতম্য রয়েছে। এ পার্থক্যের কারণে বৃহৎ আঙ্গিকে শান্তিরক্ষীরা সামরিক ও অসামরিক এ দু'টি পন্থায় শান্তি স্থাপনে কাজ করে থাকে। উভয় ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা ও মানবাধিকার সুরক্ষা করা অন্যতম লক্ষ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, মানবাধিকার সুরক্ষা, নারী ও শিশুর নিরাপত্তা, স্থানীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় বহুমাত্রিক শান্তিমিশনে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অসামরিক পন্থায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তিচর্চার পরিবেশ তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত শান্তিমিশন সামরিক নয় অসামরিক পন্থায় শান্তি স্থাপনের কৌশল হিসেবে বিবেচিত এবং এক্ষেত্রে শান্তি ও গণতন্ত্র উভয় বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে সমগুরুত্বারোপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে বিবাদমান বিভিন্ন গোষ্ঠী, উপ-গোষ্ঠী ও দলগুলোকে নির্বাচনমুখী করে নিজেদের গড়ে তোলা, স্বীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে জনগণের পছন্দনীয় শান্তি চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি এ প্রচেষ্টায় শান্তিরক্ষা কার্যক্রম জাতিসংঘের বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত এবং শান্তিরক্ষা বাহিনী অন্যান্য এজেন্সির সাথে সমন্বয় করে কাজ করে। চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ে বাংলাদেশ বৃহৎতম শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

[১] United Nation Peacekeeping, at https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping প্রবেশ ১০ জানুয়ারি, ২০২০।

[২] Todd Sandler (2017), International Peacekeeping Operations: Burden Sharing and Effectiveness, The Journal of Conflict Resolution, 61(9): 1875-1897, SAGE.

[৩] Paul F. Diehl & Daniel Druckman (2018) Multiple Peacekeeping Missions: Analysing Interdependence, International Peacekeeping, 25:1, 28-51.

[৪] Nicholas Sambanis (2008), Short- and Long-Term Effects of United Nations Peace Operations, The World Bank Economic Review, Vol. 22, No. 1, 2008

[৫] Diehl, Paul F. and Druckman, Daniel (2010) *Evaluating peace operations.* Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO, United States. ISBN 978-1-58826-733-7.

[৬] Principles of peacekeeping, at https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping প্রবেশ ২৪ অক্টোবর, ২০২০।

[৭] *প্রাগুক্ত।*

[৮] Chapter VII of the United Nations Charter, at https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/ প্রবেশ ২৪ অক্টোবর, ২০২০।

[৯] Principles of peacekeeping, at https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping প্রবেশ ২৪ অক্টোবর, ২০২০।

[১০] https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers, প্রবেশ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৯।

[১১] Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028, Department of Peace Operation, United Nation, New York.

[১২] https://peacekeeping.un.org/en/military, প্রবেশ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৯।

[১৩] *প্রাগুক্ত।*

[১৪] UN (1992), Basic Facts About the United Nations, New York, DPI, p-22.

[১৫] T.A. Zearat Ali (1997), The Changing Nature of United Nations Peacekeeping Operations, BIISS Journal, VOL-18, N0 2, p-114

[১৬] UN (1992), Basic Facts About the United Nations, New York, DPI, p-22 এবং JamiL Majid, DG UN Desk, Ministry of Foreign Affairs, Unpublished paper presented at the DSCSC on 21 January, 1996, p-14

[১৭] August R Norton and Thomas G. Weiss (1990), 'Superpower and Peace keepr', Survival, Vol.XXXII, no.3, May/June, P. 214.

[১৮] শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার এবং বর্তমানে সামরিক বিষয়ক গবেষক মূখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাতকার, ঢাকা, ২২ মে, ২০২০।

[১৯] Approved resources for peacekeeping operations for the period from 1 July 2021 to 30 June 2022 Note by the Secretary-General, Seventy-fifth session, Fifth Committee, Agenda item 154, General Assembly, UN. Available at https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/C.5/75/25, প্রবেশ ২০ জুলাই, ২০২১।

[২০] United Nation Peacekeeping, How We Are Funded, at https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded, প্রবেশ ২০ অক্টোবর, ২০২০।

[২১] *প্রাগুক্ত।*

[২২] Scale of assessments for the apportionment of the expenses of United Nations peacekeeping operations, Report of the Secretary-General, Seventy-third session, Agenda item 149, General Assembly, UN. Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/461/91/PDF/N1846191.pdf? OpenElement, প্রবেশ ২০ জুলাই, ২০২১।

[২৩] *প্রাগুক্ত।*

[২৪] United Nation Peacekeeping, what-we-do, https://peacekeeping.un.org/en/what-we-do প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২০।

[২৫] https://peacekeeping.un.org/en/protecting-civilians, প্রবেশ ২৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[২৬] High-level Independent Panel on Peace Operations review of United Nations peace operations, available at https://peacekeeping.un.org/en/high-level-independent-panel-peace-operations-review-of-united-nations-peace-operations , প্রবেশ ২৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[২৭] United Nation Peacekeeping, protecting civilians, at https://peacekeeping.un.org/en/protecting-civilians প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[২৮] UN (2000), United Nations Peacekeeping Handbook, New York. available at https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_poc_handbook_final_as_printed.pdf

[২৯] *প্রাগুক্ত।*

[৩০] *প্রাগুক্ত।*

[৩১] Security Council Resolution 1261 (1999), available at https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1261(1999), প্রবেশ ১৭ জানুয়ারি, ২০২১।

[৩২] https://peacekeeping.un.org/en/child-protection, প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[৩৩] United Nation Peacekeeping, Promoting Women, Peace and Security, at https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security, প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[৩৪] UNICEF (2014) Guidelines: Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict, available at https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2016/04/MRM_Guidelines_-_5_June_20141.pdf

[৩৫] https://peacekeeping.un.org/en/child-protection, প্রবেশ ২৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[৩৬] https://peacekeeping.un.org/en/preventing-conflicts, প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[৩৭] *প্রাগুক্ত।*

[৩৮] *প্রাগুক্ত।*

[৩৯] https://peacekeeping.un.org/en/quick-impact-projects-communities, প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[৪০] *প্রাগুক্ত।*

[৪১] https://peacekeeping.un.org/en/conflict-and-natural-resources, প্রবেশ ১৮ জানুয়ারি, ২০২১।

[৪২] https://peacekeeping.un.org/en/building-rule-of-law-and-security-institutions, প্রবেশ ২৮ জানুয়ারি, ২০২১।

[৪৩] https://peacekeeping.un.org/en/building-rule-of-law-and-security-institutions, প্রবেশ ২৮ জানুয়ারি, ২০২১।

[৪৪] United Nation Peacekeeping, Promoting Human Rights, at https://peacekeeping.un.org/en/promoting-human-rights, প্রবেশ ১১ জানুয়ারি, ২০২১।

[৪৫] *প্রাগুক্ত।*

[৪৬] United Nation Peacekeeping, Promoting Women, Peace and Security, at https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security, প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[৪৭]Resolution 1325 (2000), Security Council, United Nations, available at https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000), প্রবেশ ২ জুলাই, ২০২১।

[৪৮] United Nation Peacekeeping, at https://peacekeeping.un.org/en/protecting-civilians, প্রবেশ ১৯ জানুয়ারি, ২০২১।

[৪৯] United Nation Peacekeeping, Operational-Support, at https://peacekeeping.un.org/en/operational-support প্রবেশ ২ জুলাই, ২০২১।

[৫০] UN Security Counnil, Resolution 2250 (2015), 9th December, 2015.

[৫১] United Nation Peacekeeping, Promoting Youth, Peace and Security, at https://peacekeeping.un.org/en/promoting-youth-peace-and-security, প্রবেশ ২৫ জানুয়ারি, ২০২১।

[৫২] Secretary General's Initiative on Action for Peacekeeping, at https://peacekeeping.un.org/en/advancing-political-solutions-to-conflict প্রবেশ ৩০ জুলাই, ২০২১।

[৫৩] বিস্তারিত দেখুন এ থিসিসের চতুর্থ অধ্যায়।

[৫৪] গণতন্ত্র ও শান্তি বিষয়ক একজন গবেষক মূখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাতকার, শ্যামলী, ঢাকা, ২৭ অক্টোবর, ২০২১।

[৫৫] UN Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), at https://dppa.un.org/en/elections, প্রবেশ ২০ অক্টোবর, ২০২০।

[৫৬] Strengthening the role of the United Nations in enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections and the promotion of democratization, Report of the Secretary-General in General Assembly, Report no-A/66/314, 19 August 2011. available at https://undocs.org/A/66/314.

[৫৭] The Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), The Department of Peace Operations (DPO), The United Nations Development Programme (UNDP), The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Volunteers (UNV), The United Nations Office for Project Services (UNOPS), The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) Ges The International Organization for Migration (IOM).

[৫৮] United Nations Electoral Assistance, report of the Secretary-General- Strengthening the role of the United Nations in enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections and the promotion of democratization, No- A/74/285, 6 AUGUST 2019. Available at- https://digitallibrary.un.org/

[৫৯] Strengthening the role of the United Nations in enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections and the promotion of democratization, Report of the Secretary-General in General Assembly, Report no-A/66/314, 19 August 2011. Available at https://undocs.org/A/66/314

[৬০] Responsibility of Electoral Assistance Division of DPPA, UN at https://dppa.un.org/en/elections, প্রবেশ ১২ ডিসেম্বর, ২০২০।

[৬১] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), The Role of Peacekeeping Operations in Electoral Process, School of International and Public Affairs, Columbia University (https://www.sipa.columbia.edu).

[৬২] রাজনৈতিক বিষযক, অসামরিক বিষয়ক, মানবাধিকার সংরক্ষণ, নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ (নির্বাচনী প্রচার ও নাগরিক সচেনতা) এবং আইন শৃঙ্খলা বা পুলিশী কার্যক্রম।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশঃ প্রেক্ষাপট ও অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা

ভূমিকা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী নানা জাতি- গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। ভিন্ন সংস্কৃতি আর ভাষার এসব শান্তিরক্ষীর প্রধান লক্ষ্য থাকে ঝুঁকিপূর্ণ মানবগোষ্ঠীকে সহিংসতা থেকে রক্ষা করা। সহিংসতা থেকে শান্তির পথে আসা দেশগুলিকে সহযোগিতায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা বিগত তিন দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছে। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতালাভের অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ প্রাপ্তির এক সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তাঁর ভাষণে কার্যকর ভুমিকা পালনে জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান করে বলেন, "এই সংস্থাটি যাতে কার্যকরভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য সংস্থাটি শক্তিশালী করে তোলা একান্ত দরকার। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে"[১]। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর এ দিকনির্দেশনা জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থানের রাজনৈতিক আদর্শগত ভিত রচনা করে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয় এবং সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রার প্রথম ধাপ পরিসমাপ্ত হয়। দীর্ঘ দেড় শতকের সামরিক শাসনের ফলে দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায়ন সংগঠিত হয়। নব্বই দশকের শেষের দিকে দেশে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৯৮৮ সালে সামরিক শাসকের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি। দেশের অভ্যান্তরে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বিরুপ ধারণা তৈরি হতে থাকে। একই সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান ঘটে। এরকম এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সরকার ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরানের মধ্যে সশস্ত্র সহিংসতা বন্ধে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একটি দলকে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশ অন্যতম বৃহৎ শান্তিরক্ষী জোগানদাতা দেশ। এ অধ্যায়ে শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা, বিগত তিন দশকের অর্জন ও অভিজ্ঞতা আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ শান্তিরক্ষামিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের জন্য শান্তিরক্ষামিশনটি একইসঙ্গে রাজনৈতিক, নিরাপত্তা সম্পর্কিত, অর্থনৈতিক এবং সামরিক বাহিনীর মাননির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকতার সঙ্গে জড়িত[২]। বাংলাদেশের সংঘাতময় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইতিহাস এবং এরসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে নিয়ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ পর্যালোচনা করলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। রাশেদুজ্জামান ও নীলয় বিশ্বাস বাংলাদেশের শান্তিরক্ষামিশনে অংশগ্রহণের ত্রিমুখী প্রেক্ষাপট/কারণ আলোচনা করেছেন[৩] -

ক. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছে এবং একইসঙ্গে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পেরেছে।

খ. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর জন্য এরকম একটি বহুজাতিক পরিবেশে কাজ করার সুযোগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ ধরনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামরিকখাতে বৈশ্বিক অগ্রগতির কারণে সংগঠিত সব নীতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে পারছে। এতে বাহিনীগুলোর পেশাগত দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক প্রণোদনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত অর্থসম্পদ এ দেশের অর্থনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশনের ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিবেচনায় বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর জন্য নতুন সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই চলমান প্রক্রিয়া বাহিনীসমূহের আধুনিকায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বহিঃশত্রুর আক্রমণপ্রসূত হুমকি বা প্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্ভাবনা কম হলেও বাংলাদেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মূলত অভ্যন্তরীণ হুমকিগুলো মুখ্য এবং এগুলো জাতিসংঘে সেনা প্রেরণের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। তবে বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় জাতিসংঘ মিশনগুলোতে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছে। একই সময়ে রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ সামরিক শাসন থেকে বের হয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণ হয়েছে। দৃশ্যত এক প্রকার রাজনৈতিক-

অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার অবতারণা ঘটেছে। এই যৌক্তিক বাস্তবতা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারাবাহিক ঘটনাবলির সংমিশ্রণে উৎপন্ন এবং তা বর্তমানে জাতিসংঘে সেনা প্রেরণের ক্ষেত্রে বহির্মুখী বলপ্রয়োগে সচেষ্ট।

রাজনৈতিকভাবে গত তিন দশকের অধিককাল ধরে গণতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকায় সেনাবাহিনী তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে অধিক মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এই সময়ে একটি পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণ এবং কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নতি মিশন সম্পর্কে সশস্ত্র/পুলিশবাহিনীর সদস্যদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এভাবে অর্থনৈতিক ও পেশাগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাহিনীসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সশস্ত্র বাহিনীর ধরন ও প্রকৃতি নব্বই দশকের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। এখানে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের পরিবর্তে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা সশস্ত্র বাহিনীর প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে[৪]। নিম্নরূপ বিশদভাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা আলোচনা করা হলো :

ক. রাজনীতিক এবং নিরাপত্তা যুক্তিসমূহ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঔপনিবেশিক উত্তাধিকার এবং সদ্য স্বাধীন দেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক মেরুকরণ ও সামরিক শাসন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের পেছনে অন্যতম নিয়ামক ছিলো। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে যে সেনাবাহিনীর জন্ম হয় তা স্বাভাবিকভাবেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দোষে দুষ্ট ছিল[৫]। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে সেনাবাহিনী ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ এই দীর্ঘ ১৫ বছর রাষ্ট্রীয়ক্ষমতা দখল করে রাখে এবং ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রের পুনঃআবির্ভাবের অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দেশের রাজনীতির বিরাজনীতিকীকরণ করার চেষ্টা করা হয় [৬]। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১) মাধ্যমে সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে[৭]। কিন্তু, একথা সত্য যে, আজও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সশস্ত্র বাহিনী একটি শক্তিশালী নিয়ামক। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ সশস্ত্র বাহিনীর শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশ্বাস করে বৈশ্বয়িক পরিমণ্ডলে এ ধরনের অংশগ্রহণ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা বাংলাদেশে গণতন্ত্র সুসংগঠিত করতে সহায়তা করবে। উপরন্তু, বৃহৎ শক্তিসমূহের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ফোরামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও দেশের পরিচিতি ইতিবাচকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে অবদান রেখেছে।

খ. অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা

শান্তিরক্ষামিশনে অংশগ্রহণের ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের যেমন সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি শান্তিরক্ষামিশন থেকে সরকার বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করছে। বর্তমান সরকারের জন্য এটি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশ একটি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ। গত দুই দশকে যথেষ্ট অর্থনৈতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশটি উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের ফলে এখনো কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার বহির্বিশ্বে অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধান করার ব্যাপারে তৎপর এবং স্বাভাবিকভাবেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের বেতন-ভাতা এবং ক্ষতিপূরণের হার বাংলাদেশি সেনা এবং পুলিশদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই শান্তিরক্ষীদের দ্বারা অর্জিত আর্থিক সুবিধা দেশের অর্থনীতিকে চাঙা রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি সূত্র মতে, ২০০১-২০১০ সময়কালে বাংলাদেশ সেনা মোতায়েন, কন্টিনজেন্টের মালিকানাধীন সরঞ্জাম এবং অন্যান্য খাত বরাবর জাতিসংঘ থেকে ১.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে[৮]। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশনসমূহে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় এবং ব্যবহার, সেনাসদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্ভব হতো না। ২০১১-২০১২ সালে জাতিসংঘ শুধু রসদ (গাড়ি, অস্ত্র ইত্যাদি) ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৪৭ কোটি ৮৪ লাখ ৮২ হাজার ৪০২ মার্কিন ডলার প্রদান করেছে[৯]।

শান্তিরক্ষামিশনসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য পরোক্ষ আর্থিক সুবিধাও তৈরি করেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য কৃষি ও ওষুধ খাতগুলোতে নতুন বাজার সৃষ্টি করেছে। ফলে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কৃষিজমি লিজ নিয়ে খামার স্থাপন করে যা খাদ্যচাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

তা ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে সশস্ত্র/পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। শান্তিরক্ষীগণ ডলারে প্রাপ্ত মোট বেতনের অনুমানিক প্রায় ৩৪% পেয়ে থাকেন এবং বাকী ৬৬% সরাসরি বাহিনী পেয়ে থাকে[১০]। এর মধ্যে দিয়ে দু'দিক হতে দেশ লাভবান হয়, প্রথমত বাহিনীগুলোর আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং দ্বিতীয়ত, সরকারি কোষাগারে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমা হয়। এভাবে অর্থনৈতিক ও পেশাগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘমিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাহিনীসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সশস্ত্রবাহিনীর প্রকৃতি নব্বই দশকের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। এখানে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের পরিবর্তে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা সশস্ত্র বাহিনীর প্রকৃতি ও ধরনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। তবে, শান্তিমিশনকেন্দ্রিক বাহিনীর সক্ষমতা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সেনাবাহিনীর সামরিক পেশাদারিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

গ. মাননির্ধারক যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ সবসময় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণসহ জাতিসংঘের নীতির প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে এসেছে। জাতিসংঘে শান্তিরক্ষীবাহিনীতে বাংলাদেশর অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে সহায়তা করেছে। ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার জন্য শান্তিরক্ষীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন[১১]। একই বিষয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন সাপ্তাহিক দি ইকোনমিস্ট ২০০৭ সালে এ প্রসঙ্গে বলে, শান্তিরক্ষীদের নীল হেলমেট পরিধান করে বাংলাদেশিরা বিশ্বের কাছে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনীতি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বাইরেও যে বাংলাদেশের একটি পরিচিতি আছে তা তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে[১২]।

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকতা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশনে অংশগ্রহণ বিষয়ে প্রশাসনিক তথা আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামরিকবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সশস্ত্রবাহিনীর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে সেনাবাহিনীর শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পেশাদারিত্বের উন্নয়ন; দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের সহযোগিতায় এবং মিশন হতে প্রাপ্ত সুবিধায় অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ক্রয় এবং তা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন; তৃতীয়ত, শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত সেনাসদস্যরা কর্মসূত্রে বিদেশি সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, পেশাগত, মিশনব্যবস্থাপনা, আন্তঃব্যক্তিগত দক্ষতাসহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অভিজ্ঞতালাভ করেন এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হন। যা যেকোন নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর জন্য সক্ষমতা, সম্মান ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমঝোতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের শান্তিমিশনের জন্য প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (বিপসট) স্থাপন করা হয়েছে[১৩]। এ ইনস্টিটিউটে দেশি-বিদেশি শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এজন্য জাতিসংঘ শান্তিমিশন উপযোগী এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মিশনকে লক্ষ করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা হয়েছে। কার্যত বাংলাদেশ চাহিদাভিত্তিক শান্তিমিশন (Supply driven peacekeeping) এ অংশগ্রহণ করে। ফলে জাতিসংঘের চাহিদা অনুসারে বিপসট পোশাকদারী শান্তি রক্ষীদের প্রশিক্ষিত করে মিশনে প্রেরণ করে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ সুবিধা বাংলাদেশকে শান্তিমিশনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছে।

ঙ. ব্র্যান্ড বাংলাদেশ

বলা হয়ে থাকে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক এবং শান্তির দূত যোগানদাতা হিসেবে পরিচিত। এ সুনামের পেছনে দু'খাতের অবদান অপরিসীম। অনেক দেশ বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত জানতো না। আজ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে নিজের নাম ও পরিচিতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা মিশন এলাকায় শুধু যে জাতিসংঘ অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন তা নয়, তাঁরা সেখানে বাংলাদেশের দূত হিসেবেও কাজ করে। মিশন এলাকায় স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের

পরিচয় ঘটে। অনেক মিশন এলাকায় বাংলাদেশ ও বাঙালি সংস্কৃতি এতটাই অবধারিত বা গ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে যে কখনো কখনো তা সরকারিভাবে স্বীকৃতিও পায়। সিয়েরা লিয়নে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০২ সালে বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম প্রধান সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোনো কোনো দেশে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সম্মানে সড়কের নামকরণ করা হয়েছে, 'বাংলাদেশ রোড'। বেশ কিছু মিশন এলাকায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার, কালচারাল সেন্টার ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব সেন্টার মিশন থেকে শান্তিরক্ষীরা চলে আসার পর সাধারণত স্থানীয় লোকজন এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। শান্তিরক্ষীরা মিশন এলাকায় বিভিন্ন সেবামূলক কাজেরও উদ্যোগ নেন। কোথাও কোথাও তাঁরা স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। সব মিলিয়ে শান্তিরক্ষীরা বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশকে নতুনভাবে তুলে ধরছেন। ২০১৮ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক শান্তিরক্ষা মিশনের কৌশল পর্যালোচনা বিষয়ক Action for Peacekeeping, A4P প্রণয়ন এবং সদস্য রাষ্ট্রের সাথে শেয়ার করা হয়। এপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন, "আমাদের সর্বাত্মক নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের কারণে শান্তিরক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ একটি ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। তাই আমি শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের কৌশল পর্যালোচনার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা পুনরায় জোরালোভাবে জানাতে চাই। সর্বসময় দ্রুত সমর্থনের মাধ্যমে আমরা তার হাতকে শক্তিশালী করতে চাই"[১৪]।

চ. ধর্মীয় অনুভূতি

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এদেশের ভোটের রাজনীতিতে ধর্মীয় অনুভূতি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিদেশে শান্তিরক্ষী প্রেরণে রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণের ধর্মীয় মনোভাবকে বিবেচনা করতে দেখা যায় এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না - যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমর্থন না থাকে বা তাদের অনুভূতিতে আঘাত হানে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ২০০৩-এর ইরাক দখল-পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট থাকা সত্ত্বেও ইরাকে শান্তিরক্ষামিশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেনি। এ সিদ্ধান্তের পেছনে জনমত একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

ছ. বৈদেশিক শ্রম বাজার ও ভূ-রাজনীতি

বাংলাদেশর বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে রেমিটেন্স। শান্তিরক্ষামিশন হতে শান্তিরক্ষীগণ উচ্চহারে বেতন - ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। তা ব্যক্তিগতভাবে সেনাদের জীবনমান বৃদ্ধি করে তেমনি সরকার বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পেয়ে থাকে। সেবা খাতে শান্তি মিশন হতে আয় দেশের সর্বোচ্চ বৈদেশিক আয় খাত। অপরদিকে, শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদানের কারণে আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শান্তিমিশনে প্রধান চারটি শান্তিরক্ষী যোগানদাতা দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল) দক্ষিণ এশিয়াতে অবস্থিত। এ অবস্থান দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে বাহিনীগুলোর মধ্যে যেমন এক ধরনের সহজাত ঐক্য গড়ে উঠেছে, তেমনি বৈশ্বিক পর্যায়ে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থা সুদৃঢ় করছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সেনা ও পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর পেশাগত উৎকর্ষতার এক সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ। এ অংশগ্রহণ বিশ্বে দেশের সুনাম ও ব্রান্ড বাংলাদেশ হিসেবে খেলাধুলা, জনশক্তি, পোশাক রপ্তানিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কিন্তু, বিগত দু'দশকে অতি মাত্রায় মিশনে অংশগ্রহণ, মিশন কেন্দ্রিক সেনা সদস্যদের প্রশিক্ষণ কাঠামো ও প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু (Content) নির্বাচন সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মিশনে অংশগ্রহণকে অনেকে সশস্ত্র বাহিনীর মৌলিক পেশাদারিত্বের জন্য হুমকি মনে করেন। কারণ, শান্তিরক্ষামিশনের আলোকে প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রম সেনা বাহিনীর প্রচলিত 'জাতীয়' নিরাপত্তা এবং রণকৌশণগত পেশাগত প্রশিক্ষণের পরিবর্তে 'মানব নিরাপত্তা' ধারণার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। যা স্বাভাবিকভাবে সেনাবাহিনীর প্রচলিত পেশাদারিত্বের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়[১৫]। এজন্য অনেকে শান্তিরক্ষা ও প্রতিরক্ষা এ দুই দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন[১৬]। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সাধারণ যুদ্ধকালীন দায়িত্ব পালনে শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের প্রভাব পরিমাপের এখনও কোন অভিজ্ঞতা হয়নি কিংবা এ নিয়ে এ পর্যন্ত কোন গবেষণা লক্ষ করা যায় না। মিশনে অংশগ্রহণ বিষয়ে সেনা সদস্যদের আগ্রহের কারণ নিয়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক মনো-সামাজিক গবেষণার অনুপস্থিতি এ বিষয়ে এক ধরনের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তথ্যগত শূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মুখ্য তথ্যদাতার মতে, "বর্তমানে একজন চৌকস অফিসার দেশের

ভেতরে সার্ভিস দেওয়ার চেয়ে নিজেকে মিশনে অংশগ্রহণ নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ মনে করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সশস্ত্রবাহিনীর সামরিক কোন দ্বন্দ্বে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশের সম্ভাব্য হুমকি (threat) প্রদানকারী দেশগুলোর সাথে রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, এখানে গতানুগতিক নিরাপত্তা কৌশলে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র ব্যবহার ক্ষীণ। অন্যদিকে বর্তমানে দেশে সশস্ত্রবাহিনীর নেতৃত্বে বিভিন্ন বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়ন হচ্ছে, যেমন পদ্মা সেতু প্রকল্প, রোহিঙ্গা শরণার্থী পূর্ণবাসন প্রকল্প, বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি। এসব প্রকল্পে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনায় সামরিক বাহিনী সদস্যগণ নিজেদের মেধা ও মনন দেশের জন্য ব্যয় করছেন। এ সবক্ষেত্রেও গতানুগতিক সামরিক কৌশল প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। এসকল কাজই অসামরিক পন্থা সশস্ত্র বাহিনীর শান্তিপূর্ণ ব্যবহার। দেশের ভেতরে এ ধরনের ব্যবহারের চেয়ে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে জাতিসংঘের নেতৃত্বে শান্তিমিশনে যোগদান করাকে অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং চাকুরি জীবনের জন্য নিরাপদ মনে করেন"[১৭]। একজন সাবেক সেনাসদস্য এবং শান্তিমিশনে অংশগ্রহণকারী মুখ্য তথ্যদাতা বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর মিশনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অপর একটি দিককে ইঙ্গিত করেন। তাঁর মতে "বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর মিশনে অংশগ্রহণের পেছনে মূল কারণ হচ্ছে আমাদের দারিদ্রতা এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেনা ও পুলিশ সদস্যদের সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা। বাংলাদেশের সেনা ও পুলিশবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার হতে আসে। এসব সদস্যগণ নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনে বাড়তি আর্থিক সুবিধা পাওয়ার আশায় জীবনের ঝুঁকি জেনেও মিশনে যেতে দ্বিধা করে না। উল্লেখ্য যে, মিশনে শান্তিরক্ষীগণ নিজেদের উপর আঘাত না আসা পর্যন্ত নিজেদের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন না। এরকম শর্ত জেনে অনেক উন্নত দেশই তাদের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মিশনে প্রেরণ থেকে বিরত থাকে, আবার প্রেরণ করে থাকলেও তা হেডকোয়ার্টার্স বা অফিসিয়াল পর্যায়ে। সচরাচর মাঠপর্যায়ের অপারেশনে এসব উন্নত দেশ সৈন্য প্রেরণ করে না। কিন্তু বাংলাদেশের সেনা সদস্যগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং মাঠ পর্যায়ে মিশনে অংশগ্রহণ করে। একই যুক্তি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল কিংবা আফ্রিকান সেনা প্রেরণকারী রাষ্ট্রগুলোর জন্যও প্রযোজ্য[১৮]।" তবে, এ যুক্তির বাহিরে অনেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিগত তিন দশকের পেশাদারিত্ব ও মিশনে সাফল্যকে গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের মতে, এখন পর্যন্ত শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ যেভাবে মিশনকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ ও লজিস্টিকের সমন্বয়ে নিজেদের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত

করেছে তা শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী অন্য অনেক দেশের নেই। এজন্য চাহিদা ভিত্তিক শান্তিমিশনে (supply driven peacekeeping) বাংলাদেশ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অল্প সময়ে শান্তিরক্ষী প্রেরণ করার সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। যদিও বাংলাদেশ পুলিশের এখনও সেনাবাহিনীর মতো শান্তিমিশন কেন্দ্রিক কোন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার নেই। বর্তমানে মিরপুর পুলিশ স্টাফ কলেজ এবং রাজশাহীস্থ সারদা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে অন্যান্য কোর্সের সাথে শান্তি মিশন কেন্দ্রিক বিষয়গুলো ট্রেনিং- এ অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। টেকসই শান্তিরক্ষী প্রেরণ নিশ্চিতের লক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারের প্রয়োজন।

৩.২ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ (১৯৮৮-২০২০)

বাংলাদেশ গত তিন দশকের অধিক সময়কাল ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। এর মাধ্যমে দেশটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে। এটি বাংলাদেশের নেতিবাচক রূপ যা বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্রের কষাঘাতে প্রভাবিত ছিলো তা অনেকখানি কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরানের মধ্যে সশস্ত্র সহিংসতা বন্ধে পর্যবেক্ষক পাঠানোর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর এক লক্ষ ৭০ হাজার ২৪৩ জন কর্মী ৪০টি দেশে ৫৪টি শান্তি মিশনে কাজ করেছে। বর্তমানে ১১টি শান্তিমিশনে বাংলাদেশের ৬হাজার ৯২১ জন সেনা সদস্য ও সেনাবিশেষজ্ঞ এবং পুলিশ বাহিনীর ১হাজার ৮৫১ জন সদস্য দায়িত্বরত রয়েছে[১৯]। গত তিন দশকে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা কর্ম, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতায় অনন্য হয়ে উঠেছে এবং তাঁদের ভূমিকা বরাবরই প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্ব শান্তির অন্বেষণে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় দেড় শতাধিক শান্তিরক্ষী প্রাণ দিয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে জাতিসংঘের সর্ববৃহৎ সেনা প্রেরণকারী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি নিঃসন্দেহে দেশের জন্য গর্বের বিষয়। কীভাবে বাংলাদেশ এ রকম একটি নেতৃস্থানীয় অবস্থান অধিকারে সমর্থ হলো, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এক্ষেত্রে আমরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে তিনটি পৃথক দশকে ভাগ করে বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারি।

টেবিল নং-৩.১

বিগত দশ বছরে শান্তিমিশনে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর অবস্থান[২০]

বছর	শান্তিমিশনে অবস্থান
২০২১	১ম
২০২০	২য়
২০১৯	৩য়
২০১৮	২য়
২০১৭	২য়
২০১৬	৪র্থ
২০১৫	১ম
২০১৪	১ম
২০১৩	২য়
২০১২	২য়
২০১১	১ম
২০১০	২য়

বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মিশনে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, ১৯৮৮ সাল হতে সেপ্টেম্বর ও ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৫৯ জন শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন এবং ২৪০জন শান্তিরক্ষী গুরুতর আহত হয়েছেন[২১]।

টেবিল-৩.২

বাহিনী অনুযায়ী নিহত ও আহত শান্তিরক্ষীর সংখ্যা (সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত)

উাহিনী	নিহত	আহত
সেনাবাহিনী	১২৪	২২২
নৌবাহিনী	০৪	০১
বিমান বাহিনী	০৯	০৫
ঈুলিশ	২২	১২
সর্বমোট	**১৫৯**	**২৪০**

উৎস: https://www.afd.gov.bd/index.php/un-peacekeeping/sacrifices-made-by-bangladesh প্রবেশ ২০ জানুয়ারি ২০২০; এবং ক্রোডপত্র: আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০১৯, দৈনিক সমকাল, ২৯ মে, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১১, ঢাকা।

৩.২.১ জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের প্রথম দশক (১৯৮৮-২০০০)

স্বাধীনতার ১৭ বছরের মধ্যে ১৯৮৮ সালে ইউএন ইরান-ইরাক মিলিটারি অবজারভেশন গ্রুপ (ইউনিমগ) শান্তিমিশনে ১৫ জন সেনা পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু[২২]। পরবর্তী বছর, ১৯৮৯ সালে, ২৫ জন সেনা ও ৩৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক ইউনাইটেড নেশনস ট্রানজিশন্স অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপ ইন নামিবিয়া মিশনে প্রেরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদি শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ শুরু করে। এটি বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম জাতিসংঘ মিশন। আজ অবধি সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী অধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘের প্রায় সব মিশনে অংশগ্রহণ করেছে।

কোয়ালিশন মিশন হিসেবে ১৯৯০-৯১ সালে প্রথম আরব উপসাগরীয় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ২১৯৩ জন সেনাসদস্য অংশগ্রহণ করে। এটি ছিল জাতিসংঘের বাইরে কোনো একক দেশের নেতৃত্বে শান্তিরক্ষামিশনে বাংলাদেশের প্রথম অংশগ্রহণ। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের কম্বোডিয়া মিশনে প্রথমবারের মতো এক ব্যাটালিয়ন সেনা প্রেরণ করে। বাংলাদেশি সেনাদের পেশাদারি দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতা অল্পদিনের মধ্যেই মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা স্থানীয়দের আস্থা অর্জন

করতে সক্ষম হয়। এই পেশাদারিত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ১৯৯০-এর দশকে জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি মিশনে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়। কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, হাইতি, অ্যাঙ্গোলা, সিয়েরালিয়ন, কঙ্গো, পূর্বতিমুর ও সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় পরিচালিত মিশনগুলো এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০-২০০০ স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী প্রথম দশকে বাংলাদেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মিশনে অংশ নেয়। এগুলো হলো রুয়ান্ডা (অক্টোবর ১৯৯৩-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪), মোজাম্বিক (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩-ডিসেম্বর ১৯৯৪) এবং সোমালিয়া (জুলাই ১৯৯৩-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫)[২৩]। সোমালিয়া মিশনে বাংলাদেশের ১হাজার ৯৬৭ জন সেনা সদস্য অংশ নেন এবং তাঁরা সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে স্থানীয়দের সব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এক ধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হন[২৪]। সোমালিয়ামিশনে বাংলাদেশকে কোনো ধরনের কৌশলগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু রুয়ান্ডা মিশনে বাংলাদেশি সেনাদের কিছু কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। রুয়ান্ডায় জাতিসংঘমিশনে কানাডিয়ান বংশোদ্ভূত জেনারেল ডালায়ার বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের সেনাদের বিরুদ্ধে তাঁর আদেশ অমান্য করার গুরুতর অভিযোগ আনেন। জেনারেল ডালায়ার বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর ও নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চিঠি দিয়ে জানান যে বাংলাদেশি সেনারা অবিরতভাবে রুয়ান্ডার সাধারণ জনগণকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর আদেশকে অবজ্ঞা করে এসেছে[২৫]। বিষয়টি জাতিসংঘ মিশনে বহুজাতিক সেনা দলগুলোতে চেইন অব কমান্ড নিয়ে নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তার অবতারণা ঘটায় এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে একটি সাময়িক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল[২৬]।

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সিয়েরা লিওনে ইউএনএএমএসআইএল মিশনে অংশ নেয়। সিয়েরা লিওনের ভয়ানক পরিস্থিতিতে তখন অনেক রাষ্ট্র মিশন পরিত্যাগ করে দায়িত্বে চরম অবহেলার পরিচয় দেয় বাংলাদেশ সেসময় অল্প সময়ের নোটিশে এক ব্রিগেডসেনা মোতায়েন করে। বাংলাদেশি সেনা ব্রিগেড গেরিলা-নিয়ন্ত্রিত জায়গাগুলো পুনরুদ্ধারে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[২৭]। ২০০৩ সালে এক সরকারি সফরে সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে আসেন এবং তাঁর দেশের শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশিদের ভূমিকা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন[২৮]। প্রথম দশকটিতে বাংলাদেশের

অংশগ্রহণের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি উত্থান-পতনে পরিপূর্ণ ছিল। তবে নিঃসন্দেহে প্রথম দশকের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে এর পরবর্তী দশকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরও সমৃদ্ধ করেছিল।

৩.২.২ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় দশক (২০০০-২০১০)

এ দশকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম অগ্রগামী সেনা প্রেরক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শান্তিমিশনের দ্বিতীয় প্রজন্মে যেটি বাংলাদেশের অংশগ্রহণের প্রথম দশক হিসেবে বিবেচিত, এ দশকে শান্তিমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যর্থ হয়, নতুন করে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা , আস্থার সংকট এবং সক্ষমতার ঘাটতি নিয়ে জাতিসংঘ শান্তি মিশন আর্ন্তজাতিকভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ সময়ে বসনিয়া, সোমালিয়া ও রুয়ান্ডায় গণহত্যা সংগঠিত হয়। এ ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে ২০০০ সালে ব্রাটিমেক্স রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রাতিষ্ঠানিক পুনগঠন এবং আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের আলোকে শান্তিমিশনের তৃতীয় প্রজন্ম (যেটি বাংলাদেশের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় দশক হিসেবে বিবেচিত) শান্তিমিশনে বাংলাদেশ অবদান আরো জোরালো হয়। শান্তি মিশনের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের অবদান সেনা ও পুলিশ প্রদায়ক রাষ্ট্র হিসেবে সমগ্র অংশের আনুমানিক ১০ শতাংশ। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের মধ্যে ৯০ শতাংশ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মিশনগুলোতে কর্মরত এবং এর মধ্যে আইভরি কোস্ট ও লাইবেরিয়ায় সর্বাধিক সংখ্যক বাংলাদেশি সেনা কর্মরত ছিলেন। ২০০০ সাল-পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষামিশনের দ্বিতীয় প্রজন্মের এক দশকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ২৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ৯৩ শতাংশ এবং পুলিশ বাহিনী ৭ শতাংশ অবদান রেখেছে। এই সময়কালের মিশনগুলোতে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ১১০ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী মৃত্যুবরণ করে। এ দশকে আফ্রিকান ইউনিয়ন শান্তি মিশনে যোগদান করে, জাতিসংঘ কর্তৃক শান্তিমিশনের গাইড লাইন প্রকাশ করা হয়, যা কেল্সটন ডকট্রিন নামে পরিচিত। একই সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক পার্টনারশীপ এজেন্ডা প্রণয়ন করা হয়। এসব উদ্যোগ শান্তিমিশনকে আরো সুনির্দিষ্ট লক্ষে পরিচালিত করে, যা বাংলাদেশের মতো উদীয়মান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের জন্য ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা এ সময়ে বিভিন্ন মিশনে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে।

২০১০ সালের মে মাসে হাইতিতে বাংলাদেশ থেকে একটি মহিলা ফর্মড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) প্রেরণ করা হয়। যেকোনো মুসলিম প্রধান জনগোষ্ঠীর দেশ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ প্রথম এবং এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এর আগে শুধু ভারত থেকে ২০০৭ সালে এরকম একটি মহিলা ফর্মড পুলিশ ইউনিট লাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। বাংলাদেশের নারী পুলিশ সদস্যরা হাইতিতে ভূমিকম্প-পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। এছাড়া এই শান্তিরক্ষীর দলটি হাইতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারণা, স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো উন্নয়ন এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে[২৯]। এর ফলে এই দলটিকে ২০১২ সালে ইউনাইটেড নেশনস মেডেল প্রদান করার মাধ্যমে MINUSTAH-এ তাদের অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়[৩০] ।

টেবিল-৩.৩

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশন সম্পন্নকারী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা (৪০টি দেশে ৫২টি মিশন)

বিবরণ	সেনা	নৌ	বিমান	পুলিশ	মোট
মিশন সম্পন্নকারী সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা	৯৪,৭৬৮	২,০৩৯	৩,২০৭	৭,৪১৫	১,০৭,৪২৯
মিশনে মৃত্যুবরণকারী সদস্য	১২৪	৪	৯	২২	১৫৯
মিশনে আহত সদস্য	২২২	১	৫	১২	২৪০

সুত্রঃ https://www.afd.gov.bd/index.php/un-peacekeeping/sacrifices-made-by bangladesh প্রবেশ ২০ জুলাই ২০২১।

৩.২.৩ শান্তিরক্ষামিশনে বাংলাদেশের তৃতীয় দশক (২০১১- চলমান)

বর্তমান চলমান দশকটি জাতিসংঘ শান্তি মিশনের চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিমিশন হিসেবে বিবেচিত। প্রযুক্তিনির্ভর এ শান্তিমিশনে আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ প্রজন্মের মিশনগুলো শান্তি স্থাপন মিশন হিসেবে বিবেচিত। এসব মিশন শান্তিরক্ষার চেয়ে শান্তি স্থাপনের ম্যান্ডেটভুক্ত। নির্বাচন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং মানবাধিকার বিষয়ে অধিক যত্নশীল। ২০১১ সালের মে মাসে একটি নেভি ফ্রিগেট ও একটি বহিঃসমুদ্র পেট্রল নৌযানের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম দলটি জাতিসংঘ পরিচালিত ইন্টেরিম ফোর্সেস ইন লেবানন (ইউএনএফআইএল) মিশনে

অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শান্তিমিশনে বাংলাদেশের তৃতীয় দশকের যাত্রা শুরু করে। একইসময়ে মিশনগুলোতে পুলিশের অংশগ্রহণ বেড়েছে ৯৬৮ শতাংশ, ২০১১-এ সংখ্যা ২০০০ অতিক্রম করে[৩১]। বাংলাদেশ পুলিশ আইভরি কোস্ট, সুদান, দক্ষিণ সুদান, পূর্ব - তিমুর, ডিআর কঙ্গো, হাইতি ইত্যাদি দেশে পরিচালিত মিশনগুলোতে বিশেষজ্ঞ ও ফর্মড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) উভয় ক্যাটাগরিতে সদস্য প্রেরণ করেছে। ২০০০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক 'এজেন্ডা ২০৩০: টেকসই শান্তি ও স্থিতাবস্থা' গৃহিত হয়। এজেন্ডার আলোকে বাংলাদেশকে ২০২৮ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী শান্তিরক্ষী প্রেরণের লক্ষ স্থির করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মোট প্রেরিত শান্তিরক্ষীর মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ এবং বাংলাদেশ পুলিশে মোট প্রেরিত শান্তিরক্ষীর ২৬ শতংশ নারী সদস্য শান্তিমিশনে কাজ করছে বা করেছে[৩২]। তবে, বাংলাদেশ অদ্যাবধি সর্বাধিক বেশি সংখ্যায় নারী পুলিশ সদস্য প্রেরণে সক্ষম হয়েছে এবং দক্ষতার সঙ্গে মিশনগুলোতে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশী সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণের পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় কর্তকর্তাগণ ১১টি শান্তিমিশনে কাজ করছেন।

টেবিল-৩.৪

মিশন অনুযায়ী বর্তমানে নিয়োজিত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী সংখ্যা (মে, ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের নাম	মিশনের নাম	শান্তিরক্ষীর সংখ্যা
ডিআর কঙ্গো	MONUSCO	১৯২৬
লেবানন	UNIFIL	১১৬
দক্ষিণ সুদান	UNMISS	১৬৩৮
সুদান (দারফুর)	UNAMID	১৯১
পশ্চিম সাহারা	MINURSO	২৮
এালি	MINUSMA	১৬১৬
কার	MINUSCA	১০৫৩
হাইতি	MINUJUSTH	০৪
সুদান (আবেয়)	UNISFA	০১
জাতিসংঘ সদর দপ্তর	UNHQ	০৯
	সর্বমোট	**৬৫৮২**

উৎস: ক্রোড়পত্র: আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০১৯, দৈনিক সমকাল, ২৯ মে, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১১, ঢাকা।

টেবিল নং- ৩.৫
পদ মর্যাদা অনুসারে শান্তি মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশী সেনা সদস্য

		জাতিসংঘ শান্তিরক্ষামিশনে নিয়োজিত শান্তিরক্ষী (পদবী অনুসারে), সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সাল পর্যন্ত)									
ক্র. নং	পদবী	UNMISS দ. সুদান	MONUSCO ডিআর কঙ্গো	UNAMID দারফুর, সুদান	MINURSO পশ্চিম সাহারা	UNIFIL লেবানন	MINUSMA মালি	মিনুসকা ম. আফ্রিকান প্রজা.	UNISFA সুদান (আবেয়)	আনমিহ ইয়েমেন	UN সদর দপ্তর
১	মেজর জেনারেল এবং সমতুল্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এবং সমতুল্য	১	২		১	-	-	-	-	-	-
৩	কর্ণেল এবং সমতুল্য	২	৪			১	৩	৩			
৪	লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এবং সমতুল্য	৩২	৩৭	১	৩	৪	২৬	২১		১	৬
৫	মেজর এবং সমতুল্য	৯৪	১১৭	৫	১১	১১	৯৮	৭৫	২		১
৬	ক্যাপ্টেন এবং সমতুল্য	১২	৩৫			৩	২৩	৩০			
৭	সাব-অলটার্ন এবং সমতুল্য	-	-	-	-	-	৩	-	-	-	-
৮	লেফটেন্যান্ট কর্ণেল (এএফএনএস)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯	মেজর (এএফএনএস)	-	-	-	৩			৬	-	-	-
১০	ক্যাপ্টেন (এএফএনএস)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	লেফটেন্যান্ট (এএফএনএস)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১২	অনাররী ক্যাপ্টেন/লেফটেন্যান্ট/মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার এবং সমতুল্য	৬	-	-	-	৭	৩	৪	-	-	-
১৩	সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার এবং সমতুল্য	৩৩	৪৫	-	-	১৭	২১	২৯	-	-	-
১৪	ওয়ারেন্ট অফিসার এবং সমতুল্য	৫২	১১৫	-	২	৯	৪৭	২১	-	-	-
১৫	সার্জেন্ট এবং সমতুল্য	১৯৩	২৮৫	-	১	২০	১৮৫	১২১	-	-	-
১৬	কর্পোরাল এবং সমতুল্য	৩১২	২১৭	-	১	৩৫	২০৬	১৩৪	-	-	-
১৭	লেফটেন্যান্ট কর্পোরাল	৩০১	৩২৯	-		৯	২৫০	১২৯	-	-	-
১৮	সৈনিক এবং সমতুল্য	৫৩৯	৪৩৮	-	৬		৪১৭	৪৪৪	-	-	-
১৯	এনসি(ই)/(ইউ)/অন্যান্য বেসামরিক সমতুল্য	৪৪	৭৪	-	-	-	৪৪	৩৫	-	-	-

সুত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে উক্ত তথ্য প্রদান করেন। বিস্তারিত দেখুন, ২০১৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য সংসদের বৈঠকে লিখিত উত্তরদানের জন্য প্রশ্ন ও উত্তর, প্রশ্ন নং ১৯৬, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

উপসংহার

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্বের ফলে ১৯৮৮ হতে প্রায় সবকটি শান্তিরক্ষামিশনে বাংলাদেশ নিজেদের অপরিহার্য করে তুলেছে। শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সফলতার পেছনে, বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সামাজিক কর্মকাণ্ড, মানবিক গুণাবলি, শৃঙ্খলা এবং স্থানীয় জনগণের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রথাগত শান্তিমিশনে বাংলাদেশের পেশাদারিত্ব সাফল্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিমিশন বহুমাত্রিক, প্রযুক্তিনির্ভর, জটিল বিশ্ব রাজনীতি, মিশন ম্যান্ডেটের বৈচিত্রতা এবং শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের জন্য বর্তমান চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিমিশন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিমিশন শান্তিরক্ষার চেয়ে শান্তি স্থাপনের উপর জোর দিয়ে নির্বাচন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের মাধ্যমে একটি কাঠামোর উপর জোর দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই শান্তি স্থাপনে গুরুত্ব দেয়। এজন্য বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিমিশন উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারে এবং অর্জিত সুনাম অটুট রেখে জাতিসংঘ ঘোষিত 'এজন্ডা ২০৩০: টেকসই শান্তি ও স্থিতাবস্থা' অর্জনে সফল হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জনে নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

[১] জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪। বিস্তারিত ভাষণ দেখুন- জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ওয়েব পেজ- https://bdun.org/1974/09/25/speech-of-bangabandhu-sheikh-mujibur-rahman-on-25th-september-1974-at-the-unga/, প্রবেশ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২০।

[২] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), "আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের দুই দশক একটি মূল্যায়ন", মাসিক প্রতিচিন্তা, ১৬ এপ্রিল ২০১৭, ঢাকা।

[৩] *প্রাগুক্ত।*

[৪] *প্রাগুক্ত।*

[৫] মওদুদ আহমদ (২০০০), গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ, প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন, ইউপিএল, ঢাকা।

[৬] Nurul Islam, The Army, UN Peacekeeping Mission and Democracy in Bangladesh, pp-81-82.

[৭] গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ-.৭ (ক), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১৬।

[৮] 'Role of BD Armed Forces in UN Peacekeeping Missions', Restricted Bangladesh Army document (no date, anonymous author).

[৯] *প্রাগুক্ত।*

[১০] মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত একজন কর্মকর্তার (মূখ্য তথ্যদাতা) সাথে গবেষকের সরাসরি স্বাক্ষাতকার, ঢাকা, ১৭ নভেম্বর, ২০২০।

[১১] Prime Minister Sheikh Hasina's message, 'Special Supplement on International Day of UN Peacekeepers 2011,' 29 May 2011, at http://www.afd.gov.bd/?q=node/, প্রবেশ ২০ মার্চ ২০২০।

[১২] 'Supply-side peacekeeping: The UN finds an unusual way to exert influence,' The Economist, 21 February 2007, at http://www.economist.com/node/8730316, প্রবেশ ২৩ মার্চ ২০২০।

[১৩] বিস্তারিত দেখুন- BIPSOT, http://www.bipsot.net/

[১৪] দৈনিক প্রথম আলো, ২২ সেপ্টম্বর, ২০১৮, ঢাকা।

[১৫] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), *প্রাগুক্ত।*

[১৬] Rahman, 'Impact of Human Security Approach in the Post UN Peace Keeping Mission: A Case Study of Bangladesh', p.11.

[১৭] গবেষকের সাথে একজন মূখ্য তথ্যদাতার সরাসরি স্বাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১৭ নভেম্বর, ২০২০।

[১৮] গবেষকের সাথে সাবেক একজন সেনা ও শান্তিরক্ষী কর্তকর্তার সরাসরি স্বাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৯ নভেম্বর, ২০২০।

[১৯] https://www.afd.gov.bd/un-peacekeeping/position-of-bangladesh-in-un-peace-operation, প্রবেশ ২৩ মার্চ ২০২০।

[২০] https://www.afd.gov.bd/un-peacekeeping/position-of-bangladesh-in-un-peace-operation, প্রবেশ ২৩ আগস্ট ২০২১।

[২১] https://www.afd.gov.bd/index.php/un-peacekeeping/sacrifices-made-by-bangladesh প্রবেশ ২০ জানুয়ারি ২০২০। এবং ক্রোডপত্র: আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০১৯, দৈনিক সমকাল, ২৯ মে, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১১, ঢাকা।

[২২] https://www.afd.gov.bd/index.php/un-peacekeeping/ peacekeeping-history প্রবেশ ২৬ জানুয়ারি ২০১৯।

[২৩] Kabilan Krishnasamy (2003), Bangladesh and UN Peacekeeping: The Participation of a small state', *Commonwealth and Comparative Politics*, 41:1, p.32

[২৪] Ilyas Iftekhar Rasul (2010), Bangladesh Contribution to United Nation Peacekeeping Mission in Africa, paper presentated in saminar on 'Look Africa: An emerging Foreign Policy Option for Bangladesh', organized by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, 2 December, 2010.

[২৫] Paul D. Wlliams (2011), War and Conflict in Africa, Cambridge, Policy Press, pp-199-200.

[২৬] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), জাতিসংঘ শান্তিরক্ষঅ মিশনে বাংলাদেশ: প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা, *প্রতিচিন্তা*, পৃষ্টা ৬৫।

[২৭] Ilyas Iftekhar Rasul (2010), প্রাগুক্ত।

[২৮] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর, ২০০৩, ঢাকা।

[২৯] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), *প্রাগুক্ত।*

[৩০] Daily New Age, 16 May 2012.

[৩১] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), *প্রাগুক্ত।*

[৩২] বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং একাধিক মিশনে অংশগ্রহণকারী একজন মুখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাতকার, সেপ্টেম্বর ১২, ২০২১, ঢাকা।

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচন পরিচালনা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা

ভূমিকা

নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যার মধ্যে রাজনৈতিক রূপান্তর, সরকার গঠন, নতুন রাষ্ট্র গঠন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, গণভোট, স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপান্তর এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিবর্তনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সহায়তায় জাতিসংঘ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্র জাতিসংঘের একটি মূলমন্ত্র। জাতিসংঘ মানবাধিকার, আইনের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করে। জাতিসংঘের সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বিগত ৭৫ বছরে অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার চেয়ে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেছে জাতিসংঘ[১]। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচি গৃহীত হয়। গণতান্ত্রিক সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি ও বিভাগ[1] সদস্য রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রচার, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সংঘাত-পরবর্তী দেশে নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরি, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা জোরদার করতে সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও সুশীল সমাজকে সহযোগিতা করে থাকে[২]। এ লক্ষ্য অর্জনে নির্বাচনী ম্যান্ডেট যুক্ত শান্তিরক্ষা মিশনের অন্যতম প্রচেষ্টা থাকে তাদের উপর অর্পিত ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ সমাজে সরকার, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনগণকে গণতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা[৩]। ১৯৯১ সাল থেকে ১০০টির বেশি দেশ জাতিসংঘে নির্বাচনী সহায়তার অনুরোধ করে এবং গ্রহণ করে[৪]।

[1] জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (United Nations Development Programme UNDP), জাতিসংঘ গণতন্ত্র তহবিল (the United Nations Democracy Fund, UNDEF), ডিপার্টমেন্ট অফ পিস অপারেশনস (the Department of Peace Operations DPO), পলিটিক্যাল অ্যান্ড পিস বিল্ডিং অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট (the Department of Political and Peacebuilding Affairs, DPPA), মানবাধিকার হাইকমিশনারের অফিস (the Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR), জাতিসংঘের লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংস্থা (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Women) ও অন্যান্য বিভাগ।

রাজনীতি ও শান্তিস্থাপন বিষয়ক বিভাগের (the Department of Political and Peacebuilding Affairs, DPPA) অন্যতম প্রধান কাজ হলো নির্বাচনী সহায়তা প্রদান করা। যখনই কোন সংঘাতমূলক রাষ্ট্রে এ ধরনের নির্বাচনী সহযোগিতা প্রদানে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মোতাবেক মিশন ম্যান্ডেট গ্রহণ করা হয়, তখনই DPPA এর আওতায় শান্তিরক্ষা মিশনকে নির্বাচন পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সহায়তা দু'ভাবে হয়ে থাকে- (১) ডিপার্টমেন্ট অফ পিস অপারেশনস (Department of Peace Operations, DPO) এর আওতায় নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট অনুসারে শান্তি মিশন কর্তৃক নির্বাচনী সহায়তা এবং (২) জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর (UNDP) আওতায় সদস্য রাষ্ট্রের নির্বাচনী সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত নির্বাচনী সহায়তা প্রদান। জাতিসংঘ সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা এবং সপ্তম অধ্যায়ে শান্তি প্রয়োগের বিধান রয়েছে।

আগস্ট ২০১৭ হতে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ৫৫টি[৫] সদস্য রাষ্ট্রকে নির্বাচনী সহায়তা প্রদান করা হয়। তান্মধ্যে ৯টি (আফগানিস্তান, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো, গিনি-বিসাউ, হাইতি, ইরাক, লিবিয়া, মালি ও সোমালিয়া) ছিলো নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট অনুসারে নির্বাচনী সহায়তা। ২০১৯-২০২০ বর্ষে ৫০টি দেশে নির্বাচনে কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করে DPPA। এর মধ্যে ৮টি ছিলো নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেটভুক্ত নির্বাচনী সহায়তা। উল্লেখ্য যে, করোনা মহামারীকালীন সময়ে জর্ডান, মালাউই (Malawi), মোলদোভা (Moldova), বলিভিয়া, মালিসহ ২০টি দেশে নির্বাচনী সহায়তায় জাতিসংঘ কাজ করে এবং চলমান ২০২১ সালে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, ইথিওপিয়া, ইরাক, নিউ-ক্যালিডোনিয়া (New Caledonia), গাম্বিয়া, জাম্বিয়াসহ ৩০টি দেশে নির্বাচনী সহায়তা বিভাগ (Electoral Assistance Division) জেন্ডার কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ আয়োজন, সদস্য রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে[৬]। DPPA এর সহায়তায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কর্মসূচি সরকারের কোন নির্দিষ্ট মডেলকে সমর্থন করে না বরং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল্যবোধ ও নীতি প্রচার করে এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। যেখানে সার্বজনীন মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা, নারী ও পুরুষের সমতা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ লক্ষ অর্জনে শান্তিরক্ষা মিশনের অন্যতম প্রচেষ্টা থাকে তাদের উপর অর্পিত ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ সমাজে সরকার, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনগণকে গণতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা[৭]। জাতিসংঘে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ

হিসেবে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জোরালো সম্পৃক্ততা রয়েছে। দেখা যায়, বাংলাদেশ শুধু অস্ত্র বা সামরিক শক্তি বা কৌশলের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তিরক্ষায় ভূমিকা রাখেনি বরঞ্চ সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিচারিক ও আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোটার রেজিস্ট্রেশন, নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচন পরিচালনা, পর্যবেক্ষণসহ নির্বাচন ও নির্বাচনউত্তর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠনে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি পূর্ব তিমুর এবং সুদানে গণভোটের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের জাতিগত সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে নতুন জাতিরাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা পালন করেছে। এসব সাফল্যের পাশাপাশি নির্বাচন উত্তর শান্তি স্থাপিত না হয়ে নতুন সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছে। যেমন সুদানে দীর্ঘ দিন ধরে জাতিসংঘ মিশন চলমান থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন মুখ্য তথ্যদাতার মতে দক্ষিণ সুদান সংযুক্ত সুদানের সাথে থাকার সময়ে যে মাত্রা ও পরিমাণে রাজনৈতিক সহিংসতা হতো বর্তমানে স্বাধীন দক্ষিণ সুদানে এ সহিংসতার হার আরো তীব্র, জটিল এবং অর্ন্তঘাত সম্পূর্ণ। কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা নির্বাচনত্তোর সময়ে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ফলস্বরপ স্বাধীনতার একযুগ পর দক্ষিণ সুদানে এখনও বর্ধিত হচ্ছে জাতিসংঘ মিশন। আবার, সুদানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সুদান পৃথক হওয়ার পর সুদানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো আইনের শাসন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে। এ সহযোগিতায় জাতিসংঘও সামিল হয়। কিন্তু দেখা যায়, সুদানে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরবর্তী প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশের সংবিধান বাতিল করা হয় এবং সুদানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, অনেকে জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্র সহায়তার এ কৌশলকে নব্য ঔপনিবেশিকতার কূটকৌশল হিসেবে সমালোচনা করে থাকেন।

৪.১ নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত শান্তি মিশন ও বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ

'বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় প্রদত্ত ভাষণে বিশ্বের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের বিষয় দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তখন থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও বন্ধুপ্রতীম সকল দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত সকল শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে'[৮]। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা ২০২০ সালের মে পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া জুড়ে ৫৪টি মিশনে অংশগ্রহণ করে[৯]। অংশগ্রহণকৃত মিশনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে – নামিবিয়া, কাম্বোডিয়া, সোমালিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, মোজাম্বিক, প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া, লাইবেরিয়া, হাইতি, তাজিকিস্তান, পশ্চিম সাহারা, সিয়েরা লিয়ন, সোমালিয়া, কসোভো, জর্জিয়া, পূর্ব তিমুর, কঙ্গো, সুদান, আইভরি ডি কোস্ট এবং ইথিওপিয়া। এ সব মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘের মেন্ডেট অনুসারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসন, অভ্যন্তরীণ সংঘাত নিরসন, সরকার ও বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন, শান্তি স্থাপন, সামাজিক উন্নয়ন তথা অবকাঠামো নির্মাণ, স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ সর্বোপরি শান্তির স্থায়ী রূপদানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান র্নিমাণে প্রশাসনিক, বিচারিক ও স্থানীয়-কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম কাজ আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছে। কার্যত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অবদান বা কার্যক্রমের মূল্যায়ণ দুটি বৃহৎ দৃষ্টি হতে ব্যাখ্যার প্রয়াস রাখে –

- **প্রথমত**-দ্বন্দ্ব নিরসনে সামরিক-কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সহায়ক পরিবেশ তৈরির দিক হতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কাজের মূল্যায়ন এবং
- **দ্বিতীয়ত** রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ তথা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠনের দিক হতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে আর্ন্তজাতিক শান্তিরক্ষায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও আইনের শাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠনের দৃষ্টি কোণ হতে তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। আলোচ্য অধ্যায়ে উপরে আলোচিত দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হতে নির্বাচন পরিচালনা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিত্র নং -৪.১

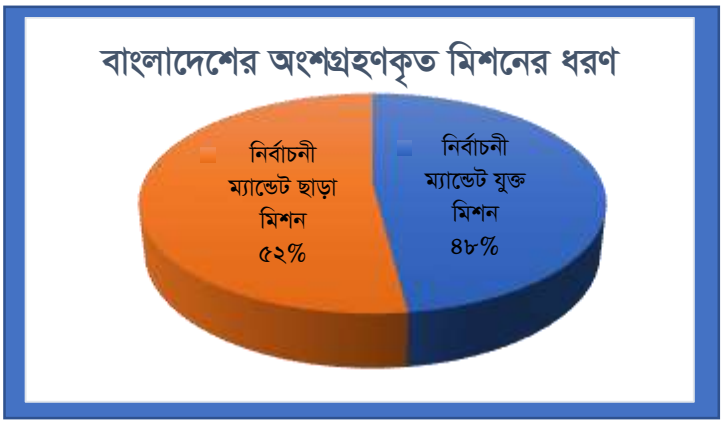

১৯৯১ সালে জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচি শুরু হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৩২টি[১০] মিশনের ম্যান্ডেটে নির্বাচন পরিচালনা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বিষয় অর্ন্তভুক্ত ছিলো। ১৯৯১ সাল হতে নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত ৩২টি মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ ২৬টি মিশনে অংশগ্রহণ করে (চিত্র-৪.১)। অর্থাৎ বৈষয়িক নির্বাচন সংশ্লিষ্ট মিশনের ৮১ শতাংশ মিশনে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ[১১]। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত যে ৫৪টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে তার মধ্যে ২৬টি মিশন হলো নির্বাচনী ম্যান্ডেট যুক্ত। অর্থাৎ বাংলাদেশের অংশগ্রহণকৃত মিশনের ৪৮ শতাংশ মিশন হচ্ছে নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সম্পর্কিত। ২০টি দেশে পরিচালিত এসকল মিশনের কোন কোনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে আবার কোন কোনটি এখনও চলমান রয়েছে। সফলভাবে সম্পন্ন মিশনের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো – পূর্ব তিমুর, সুদান, দারফুর, মোজাম্বিক, কম্বোডিয়ায়, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মালি, হাইতি, সিয়েরা লিওন। এসব দেশে বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পোশাকধারী শান্তিরক্ষী প্রেরণ করে। আবার আফগানিস্তান, ইরাক, ক্রোয়েশিয়ায় বাংলাদেশ সেনা পর্যবেক্ষক প্রেরণকারী রাষ্ট্র। বর্তমানে পশ্চিম সাহারা ও সোমালিয়া বাংলাদেশী পোশাকধারী পর্যবেক্ষকগণ কর্মরত রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ কোন মিশনে মাঠ পর্যায়ে,

কোনটিতে পর্যবেক্ষক হিসেবে আবার কোন মিশনে হেড কোয়াটার্সে দায়িত্ব পালন করেছে। মিশনের প্রকৃতি, ম্যান্ডেট ও দায়িত্বের আলোকে নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত ৩২টি মিশনকে পাঁচটি স্তরে[১২] ভাগ করে আলোচনা করা হলো –

৪.১.১ প্রথম স্তরঃ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নির্বাহী কর্তৃত্ব/মালিকানা (Level 1: Executive Ownership of the Electoral Process)

এ স্তরে অন্তর্ভুক্ত মিশনসমূহে আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের সম্পন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর শান্তিরক্ষা মিশনের নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ও নির্বাচনী সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু চূড়ান্ত দায়িত্ব মিশন সমন্বয় কাউন্সিলের উপর বর্তায়। নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত ৩২টি মিশনের মধ্যে ৪টি মিশনকে এ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মিশন ৪টি হলো পশ্চিম শাহরাহ MINURSO মিশন (১৯৯১), কম্বোডিয়ায় UNTAC মিশন (১৯৯২), পূর্ব তিমুরে UNAMET মিশন (১৯৯৯) এবং কসোভো UNMIK মিশন (১৯৯৯)। এ ৪টি মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের যথাক্রমে ৩৩৯, ১৩০১, ২৭১৮ এবং ৫৩৯ জন শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে[১৩]। এ সকল মিশন সেক্রেটারি জেনারেল এর বিশেষ প্রতিনিধির নেতৃত্বে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিম শাহারাহ'র MINURSO মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী সদস্যগণ নিরস্ত্র পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। একচ্ছত্র এবং একচেটিয়াভাবে গণভোট আয়োজন, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ও চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় এ মিশনের দায়িত্বভুক্ত। মিশনটি ১৯৯১ সাল হতে এখনও চলমান রয়েছে।

কম্বোডিয়ার UNTAC মিশনকে নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার আসার পূর্ব পর্যন্ত জাতিসংঘের ক্রান্তিকালীন কর্তৃপক্ষ (UN Transitional Authority) গঠন করা হয়[১৪]। UNAMET মিশনে পূর্ব তিমুরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মিশন ম্যান্ডেটে সুনির্দিষ্টভাবে ভোটার তালিকাভুক্তি ও ভোট আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়[১৫]। এ মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণ মাঠ পর্যায়ে নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ও ভোট আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে দায়িত্ব পালন করে। ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে পূর্ব তিমুর নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আর্বিভূত হয়। কসোভো UNMIK মিশনে দেখা যায়, নির্বাচন পরিচালনাসহ গণতান্ত্রিক এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, অমীমাংসিত রাজনৈতিক নিস্পত্তির বিষয়গুলো মিশন ম্যান্ডেটভুক্ত ছিলো[১৬]।

টেবিল ৪.১

১৯৯১ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত শান্তিমিশন ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

মিশনের নাম	দেশের নাম	গাল	মোট বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারী
UNAMA (2 Times)	আফগানিস্তান	২০০৪,২০০৯	১১
UNAVEM II	এ্যাঙ্গোলা	১৯৯১	অংশগ্রহণ করেনি
UNMIBH	বসনিয়া	১৯৯৫	১৭৭
ONUB	বুরুন্ডি	২০০৪	অংশগ্রহণ করেনি
UNTAC	কম্বোডিয়া	১৯৯২	১৩০১
MONUC	ডিআর কঙ্গো	২০০৪	৩৩১৩৫
MONUSCO	ডিআর কঙ্গো	২০১০	
UNTAES	ক্রোয়েশিয়া	১৯৯৬	৭৬
UNMIT	তিমুর লিসলি	২০০৬	অংশগ্রহণ করেনি
UNMIT	তিমুর লিসলি	২০১১	অংশগ্রহণ করেনি
MINURCA	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১৯৯৮	অংশগ্রহণ করেনি
ONUSAL	এল সালভাদোর	১৯৯৩	অংশগ্রহণ করেনি
UNAMET	পূর্ব তিমুর	১৯৯৯	২৭১৮
MINUSTAH-2	হাইতি	২০০৪,২০১০	৫৩৮২
UNMIH	হাইতি	১৯৯৪	
UNGCI/UNMOVIC	ইরাক		১২৪
MINUCI/ONUCI/UNOCI	আইভরী কোস্ট	২০০৭	৩২৮৫০
UNMIK	কসভো	১৯৯৯	৫৩৯
UNOMIL	লাইবেরিয়া	১৯৯৩	২৩৭৯৩
UNMIL	লাইবেরিয়া	২০০৩,২০০৯	
ONUMOZ	মোজাম্বিক	১৯৯২	২৬২২
UNAMIR	রুয়ান্ডা	১৯৯৩	১০২২
UNAMSIL/UNIOSIL	সিয়েরালিয়ন	২০০২	১১৯৮১
UNMIS	সুদান	২০০৫,২০০৯	৯০২৩
UNMISS	সাউথ সুদান	২০১১	৬২৫৮
MINURSO	পশ্চিম সাহারা	১৯৯১	৩৩৯
UNAMID	দারফুর	২০০৭	৮৮২৮
MINUSMA	এালি	২০১৩	৮৩৯৯
UNSOM	সোমালিয়া	২০১৩	৬
মোট অংশগ্রহণকারী শান্তিরক্ষী			১,৪৮,৫৮৪
মোট নির্বাচন সম্বলিত মিশন: ৩২ মোট নির্বাচন সম্বলিত মিশনভুক্ত দেশ: **২৫** বাংলাদেশের অংশগ্রহণকৃত নির্বাচন সম্বলিত মিশন: ২৬ (মোট মিশনের ৮১.২৫%) বাংলাদেশের অংশগ্রহণকৃত নির্বাচন সম্বলিত মিশনভুক্ত **দেশ: ২০**			

উৎস: Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), The Role of Peacekeeping Operations in Electoral Process, School of International and Public Affairs, Columbia University (www.sipa.columbia.edu) এবং Department of Political and Peacebuilding Affairs, DPPA (https://dppa.un.org) হতে প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক গননাকৃত।

৪.১.২ দ্বিতীয় স্তরঃ নির্বাচন সত্যায়ন ও যাচাইকরণে সরাসরি অংশগ্রহণ (Level 2: Direct involvement with a certification and verification of election)

এ পর্যায়ের মিশনগুলো সরাসরি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হয় না, বরং নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিকে পর্যবেক্ষণ করে এবং সম্ভাব্য প্রভাব ও করণীয় নিয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। এ ধরনের শান্তি মিশনের গঠন ও কর্তৃত্বের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও উদ্দেশ্যগতভাবে এ ধরনের মিশন নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচনী ফলাফলকে যাচাই ও সত্যায়ন করে থাকে। এ ধরনের সত্যায়ন সংঘর্ষ পরবর্তী একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গ্রুপ ও দলকে নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতে সাহায্য করে এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণের ভিত রচনা করে। ১৯৯১ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত এ ধরনের ৬টি মিশন পরিচালিত হয় – অ্যাঙ্গোলায় UNAVEM II মিশন (১৯৯১), মোজাম্বিকে ONUMOZ মিশন (১৯৯২), লাইবেরিয়াতে UNOMIL মিশন (১৯৯৩), পূর্ব স্লোবানিয়াতে UNTAES মিশন (১৯৯৬), তিমুর লিস্টে UNMIT মিশন (২০০৬) এবং কোট ডি আইভোর UNOCI মিশন। তন্মধ্যে ৪টি মিশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে, মিশনগুলো হলো- ONUMOZ, UNOMIL, UNTAES ও UNOCI। এসব মিশনে যথাক্রমে ২৬২২, ২৩৭৯৩, ৭৬, ৩২৮৫০ জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে। শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের প্রথম দশকে এ চারটি মিশনের মধ্যে লাইবেরিয়ার UNOMIL মিশন এবং কোট ডি. আইভোর UNOCI মিশনে প্রথমবারের মতো সর্বাধিক সংখ্যক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী কাজ করে। এ দুটি মিশনে ম্যান্ডেটের মূল দায়িত্ব ছিলো শান্তির স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, নির্বাচনকালীন পর্যবেক্ষণ এবং নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার বিষয়ে সত্যায়নের দায়িত্ব পালন করা। অর্থাৎ নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে কাজ করা মিশন ম্যান্ডেটভুক্ত ছিলো না। এসব মিশনে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP)। আইভরি কোস্টে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে ২০০৪ সালের নির্বাচনে প্রায় তিন হাজার লোক মারা যায় এবং প্রায় ৩০ লাখ লোক উদ্বাস্তু হয়। এ রকম প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের আহ্বানে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা আইভরি কোস্টে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। ২০০৪ হতে এখন পর্যন্ত ২টি প্রেসিডেন্টশিয়াল ও সংসদীয় নির্বাচন আয়োজন এবং ২০১৬ সালের নির্বাচনে মূল বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে[১৭]। এছাড়া, প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, অস্ত্র উদ্ধার, শরনার্থীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাসহ সামাজিক ও প্রশাসনিক উত্তরণে ভূমিকা রাখে।

লাইবেরিয়ার UNOMIL মিশনে শান্তিরক্ষীরা শান্তি চুক্তির আলোকে রাষ্ট্রপতি ও আইনসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও যাচাই সত্যায়নের দায়িত্ব ছিলো[১৮]। UNOMIL মিশন (১৯৯৩) নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। স্থানীয় সংঘাত ও আস্থার সংকটের কারণে মিশন দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় স্থায়ী হয়। কোট ডি আইভোরে UNOCI শান্তিমিশনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় দশকে সর্বাধিক সংখ্যক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণকৃত মিশন। কার্যত, এ মিশনে জাতিসংঘ মহাসচিবেরে বিশেষ প্রতিনিধিকে আর্ন্তজাতিক মানের একটি মুক্ত, অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এ মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অবদানের তেমন সুযোগ ছিলো না। বরং এটি ছিলো অনেকাংশে উচ্চ পর্যায়ের একটি নীতিগত সহযোগিতা এবং প্রত্যায়ন[১৯]। একক মিশনে সর্বাধিক সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণ সত্ত্বেও মিশনের উচ্চ পর্যায়ে বাংলাদেশী অফিসারদের কাজের সুযোগ হয়নি। বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত ও প্রাক্তন শান্তিরক্ষী একজন তথ্যদাতা মন্তব্য করেন যে, 'বাংলাদেশের অংশগ্রহণের দ্বিতীয় দশকে (২০০১-২০১০) শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে অনেক ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশীরা সফলতা অর্জন করে এবং প্রশংসা কুঁড়ায়। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে এক ধরনের অদৃশ্য বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এ নিয়ে মিশনের মধ্যে সিদ্ধান্ত ও মালিকানার দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। তবে, এ দশকের অভিজ্ঞতা ও অর্জন বাংলাদেশকে নেতৃত্ব গঠনে জোরদার করে এবং মিশনপূর্ব বিমস্টক ট্রেনিং এ উচ্চ পর্যায়ের ট্রেনিং মডিউলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যা পরবর্তীতে উচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে'[২০]।

৪.১.৩ তৃতীয় স্তরঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক পরামর্শ ও সহযোগিতা (Level 3: Strong advisory and support role to the National Election Commission)

এ স্তরের মিশনসমূহে সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উপস্থিতি রয়েছে কিন্তু কমিশনের সক্ষমতা খুবই দুর্বল হয়ে থাকে। এসব কমিশনকে শান্তিমিশন সহায়তা করে থাকে। এ পর্যায়ের মিশন জাতীয় নির্বাচনী পরিচালনায় বিশেষ করে মনিটরিং, পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করে। এরকম মিশন জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কারিগরি ও লজিস্টিক সহায়তা দিয়ে থাকে। মোট ৭টি মিশন এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় – এল সালভাদরে ONUSAL মিশন (১৯৯৩), মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে MINURCA মিশন (১৯৯৮), সিয়েরা লিওনে UNAMSIL মিশন (২০০২), লাইবেরিয়াতে UNMIL মিশন (২০০৩), ডি আর কঙ্গোতে MONUC মিশন (২০০৪), হাইতিতে MINUSTAH মিশন (২০০৪) এবং আফগানিস্তানের UNAMA মিশন (২০০৪)। এ মিশনগুলোর মধ্যে ৫টি মিশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং এল সালভাদরে ONUSAL মিশন ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র MINURCA মিশনে বাংলাদেশ অংশ নেয়নি[২১]। ডি আর কঙ্গোতে MONUC মিশনটি ২০০৪ হতে ২০১১ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ছিলো, এ সময়ে বাংলাদেশী ৩৩১৩৫ জন শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে। ২০০৪ সালে মিশন ম্যান্ডেটে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তির আলোকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্নের জন্য একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতের দায়িত্ব অর্পিত হয়[২২]।

সিয়েরা লিওনে UNAMSIL মিশনে বাংলাদেশের ১১হাজার ৯৮১ জন শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে। এ মিশনে নির্বাচন পরিচালনা প্রক্রিয়াতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। নির্বাচনী সরঞ্জাম, ব্যালেট ও নির্বাচনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সড়ক ও আকাশ পথে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়ে দেয়। নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে নির্বাচনী সরঞ্জাম সংরক্ষণ এবং নির্বাচন পরবর্তী ব্যালেট পেপার আনার কাজ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের তত্ত্বধানে ছিলো। এছাড়া, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের যাতায়াতে UNAMSIL মিশনের যোগাযোগ সুবিধা ব্যবহার করা হয়। শান্তিরক্ষীরা দেশব্যাপী মানুষ, পন্য ও মানবিক সাহায্যের অবাধ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে। মিশন সময়ব্যাপী তথা নির্বাচন পূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নিবার্চন পরবর্তী জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে

সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে সহযোগিতা করে[২৩]।

লাইবেরিয়াতে ১৯৯৩ সাল হতে শান্তিমিশন শুরু হয়, এক দশকের বেশি সময়ের পর ২০০৩ সালে মিশন ম্যান্ডেটে নতুন ম্যান্ডেট সংযুক্ত করা হয়। বলা হয়, ECOWAS ও অন্যান্য বিদেশী অংশীজনের সমন্বয়ে আপদকালীন লাইবেরিয়ান সরকারকে ২০০৫ সালের শেষ প্রান্তিকের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য শান্তিমিশনকে অন্তর্ভুক্তি করা হয়[২৪]।

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সিয়েরা লিওনে অবস্থিত জাতিসংঘ মিশনে (ইউএনএএমএসআইএল) অংশ নেয়। সিয়েরা লিওনের ভয়ানক পরিস্থিতিতে যখন অনেক রাষ্ট্র মিশন পরিত্যাগ করে দায়িত্বে চরম অবহেলার পরিচয় দেয়, বাংলাদেশ তখন সেখানে অল্প সময়ের নোটিশে এক ব্রিগেড সেনা শান্তিরক্ষী মোতায়েন করে। বাংলাদেশি সেনা ব্রিগেড অত্যন্ত পেশাদারিত্বের মাধ্যমে গেরিলা-নিয়ন্ত্রিত জায়গাগুলো পুনরুদ্ধারে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪] বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের এই ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে সিয়েরা লিওন সরকার বাংলাকে সে দেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০০৩ সালে এক সরকারি সফরে সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে আসেন এবং তাঁর দেশের শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশীদের ভূমিকা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।[৫]

হাইতির MINUSTAH মিশনে (২০০৪) বাংলাদেশী ৫৩৮২ জন শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে। এ মিশনে প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট যুক্ত হয়। এ মিশনের দায়িত্বেও মধ্যে ছিলের ক্রান্তিকালীন হাইতি ক্ষমতাশীন কর্তৃপক্ষকে মিউনিসিপাল, রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার নির্বাচন আয়োজন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কারিগরি, লজিস্টিক্যাল ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা এবং একইসাথে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। নারীসহ জনসংখ্যার সকল অংশের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে শান্তিমিশন কাজ করে[২৫]। কিন্তু কোন টেকসই রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি না হওয়ার কারণে নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক

সরকার গঠিত হয়, কিন্তু স্থায়ী স্থিতাবস্থা বজায় না থাকায় MINUSTAH মিশনের মেয়াদ পরবর্তী ২০১১ সালের নির্বাচন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

তেরো বছর এর বেশি সময় ধরে MINUSTAH মিশন হাইতিয়ানদের মানবাধিকার সুরক্ষা এবং প্রচারে সহায়তা করে। এ মিশনের সহায়তায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তে পুলিশ, বিচার বিভাগীয় সংস্থা ও জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলি তাদের তদন্ত করার স্বক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। মিশনের মানবাধিকার উপাদানটি সিভিল সোসাইটিকে মানবাধিকার এবং হাইতিয়ান সংবিধান রক্ষার অভিভাবক হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

এ মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরবর্তী মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উত্তম ফল পেয়েছে। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা হাইতি রেডিও স্টেশনে (মিনুস্তাহ এফএম রেডিও) লিঙ্গ সম্পর্কিত সাপ্তাহিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্বাচনী সচেতনতা, নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ এবং ভোটদানে উৎসাহিত করার জন্য প্রচারনা চালায়। ডিআর কঙ্গোতে মনসকো মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় টেকসই করার জন্য স্থানীয় সুরক্ষা কমিটিতে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করে।

২০১০ সালের মে মাসে হাইতিতে বাংলাদেশ থেকে একটি মহিলা ফর্মড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশের নারী পুলিশ সদস্যরা হাইতিতে ভূমিকম্প-পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ শান্তিরক্ষী দলটি হাইতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারণা, স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো উন্নয়ন এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখে। স্বীকৃতি স্বরুপ, ২০১২ সালে এ শান্তিরক্ষী দলটি (MINUSTAH) ইউনাইটেড নেশনস মেডেল অর্জন করে[২৬]।

এ স্তরের অপর মিশনটি হচ্ছে আফগানিস্তানের UNAMA মিশন (২০০৪)। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং দাতা সংস্থাসমুহের সহায়তায় একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে ক্রান্তিকালীন প্রশাসনকে

সহযোগিতা করে। এ মিশনে বাংলাদেশী ১১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। আফগান সংবিধান এবং বন চুক্তির আলোকে নির্বাচনে সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে শান্তিরক্ষীগণ কাজ করে। জাতিসংঘ ও আফগান কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিরিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে ভোটার রেজিস্ট্রেশনে অন্তর্ভুক্তি এবং ভোটদানে উৎসাহিত করে, বিশেষ করে নারী, শরণার্থী ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও ভোটদান নিশ্চিতে কথা বলা হয়[২৭]।

৪.১.৪ চতুর্থ স্তরঃ জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও রসদ সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক নির্বাচনী সহযোগিতার সমন্বয় (Level 4: Major provider of technical/logistical support to the national institutions and coordinator of international assistance)

এ পর্যায়ের মিশনসমূহ সুস্পষ্টভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ এবং কারিগরি ও লজিস্টিক সহযোগিতা প্রদান করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণে সহায়তা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নির্বাচনী সমন্বয় ও যোগাযোগ মিশনের উপর বর্তায়। তৃতীয় স্তরের সাথে এ স্তরের পার্থক্য হলো তৃতীয় স্তরে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা ও সত্যায়ন করে কিন্তু চতুর্থ স্তরে নতুন করে আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার একটি টেকসই শান্তি কাঠামো তৈরি করা হয়। এ স্তরের মধ্যে ৫টি মিশন অন্তর্ভুক্ত করা যায় – হাইতির UNMIH মিশন (১৯৯৪), আফগানিস্তানের UNAMA মিশন (২০০৯), সুদানের UNMIS মিশন (২০০৫, ২০০৯) লাইবেরিয়ার UNMIL মিশন (২০০৯) এবং হাইতির MINUSTAH মিশন (২০১০)। এ মিশনগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী মিশন, ফলে প্রথম দিকে এসব দেশের মিশনগুলো অন্য স্তরের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। যেমন, ২০০৪ সালে হাইতির MINUSTAH মিশন এবং আফগানিস্তানের UNAMA মিশন তৃতীয় স্তরের অর্ন্তভুক্ত ছিলো পরবর্তীতে ২০০৯ সালে UNAMA মিশন এবং ২০১০ সালে MINUSTAH মিশন চতুর্থ স্তরভুক্ত হয় এবং একটি জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ ও চর্চার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অনুশীলনের টেকসই ভিত রচিত হয়।

১৯৯৪ সালে নিরপাত্তা পরিষদের ৯৪০ নং ম্যান্ডেটের প্যারা ১০ অনুসারে হাইতির UNMIH মিশন ম্যান্ডেট এ বলা হয়, হাইতির বৈধ কর্তৃপক্ষকে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিমার্ণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যা জাতিসংঘ ও আঞ্চলিক সংগঠন Organization of American State (OAS) এর আহ্বানে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাড়া দিতে সক্ষম হয়। এ মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৩৮২জন সদস্য বিভিন্ন মেয়াদে শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে। এ সকল সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং গৃহযুদ্ধ বিরতি বজায় রেখে নির্বাচনের সুষ্ঠু নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হাইতির জাতীয় সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করে। Good office এর আওতায় ছয়টি সাব সেক্টরের মধ্যে শুধু আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা উপ-সেক্টরে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট কাজ করে। হাইতিতে ১৯৯৪ সাল হতে দীর্ঘদিন শান্তিমিশন ছিলো, ২০১০ সালে এসে নতুন মিশন হিসেবে MINUSTAH মিশন মোতায়েন করা হয়। MINUSTAH মিশন হাইতির সরকার ও প্রাদেশিক নির্বাচন কাউন্সিলকে ধারাবাহিকভাবে কারিগরি ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করে যাতে হাইতির নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষমতা অর্জন করে এবং আন্তর্জাতিক নির্বাচনী সহায়তা সমন্বয় এবং OAS সহ আন্তর্জাতিক অংশীজনের সাথে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়[২৮]। এ মিশন Good office এর আওতায় হাইতির রাজনৈতিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক দলগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উন্নয়নে কাজ করে। এ ধরনের সহায়তার মূল লক্ষ ছিলো হাইতির রাষ্ট্রপতি, আইনসভা নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সচল করা এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় টেকসই শান্তি অর্জন করা।

সুদান এবং দক্ষিণ সুদানের মধ্যে সংঘাত নিরসনের লক্ষে UNMIS মিশন (২০০৫, ২০০৯) গঠন ও মোতায়েন করা হয়। এ মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীর ৯০২৩ জন শান্তিরক্ষী শুরু থেকে কাজ করেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুদান হতে দক্ষিণ সুদান পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ মিশনটিতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণ Good office এর প্রতিটি সাব সেকশনে কাজ করে এবং মিশন ম্যান্ডেট অর্জনে সফল হয়। খসড়া সংবিধান, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন গঠন, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদান সরকার ও দক্ষিণ সুদান সরকারের আইনসভা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করে[২৯]। এ নির্বাচনের মাধ্যমে উভয় অংশে নির্বাচিত সরকার গঠিত হলে পরবর্তীতে গণভোটের আয়োজন করা হয়,

যার ফলাফলের ভিত্তিতে দক্ষিণ সুদান সুদান হতে পৃথক হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়। মিশনের ব্যাপ্তি, বাংলাদেশ মিশনের অংশগ্রহণের মাত্রা এবং মিশনের ধরনের আলোকে সুদানের UNMIS মিশনকে কেস হিসেবে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২০১১ সালের লাইবেরিয়ার আইনসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০০৯ সালে লাইবেরিয়ায় UNMIL মিশন গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, UNMIL মিশন প্রথম ২০০৩ সালে গঠিত হয়, যা তৃতীয় পর্যায়ের একটি নির্বাচনী মিশন হিসেবে কাজ করে। যেখানে ২০০৫ সালের শেষের দিকে লাইবেরিয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য লাইবেরিয়ান ক্রান্তিকালীন সরকারকে সহযোগিতার ম্যান্ডেট ছিলো। কিন্তু ২০০৯ সালে এ মিশনের ম্যান্ডেটে পরিবর্তন আসে, বলা হয় লাইবেরিয়ান সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০১১ সালে রাষ্ট্রপতি ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। বিশেষ করে কারিগরি ও লজিস্টিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোটার নিবন্ধন, নির্বাচনী সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয়[৩০]। লাইবেরিয়ান রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনীমূখী করা হয় এবং নির্বাচনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ণ চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপন নিশ্চিত করা হয়।

৪.১.৫ পঞ্চম স্তরঃ সীমিত পরিসরে কারিগরি ও রসদ সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক নির্বাচনী সহায়তাকে সমর্থন (Level 5: Marginal logistical/technical support authorized, encourages international electoral assistance)

সংঘাতপূর্ণ দেশের সুনির্দিষ্ট আহ্বানে জাতিসংঘের সীমিত পরিসরে নির্বাচনী সহায়তা দান। এ সকল মিশনে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কর্তৃত্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদান করা হয়। এ ধরনের ম্যান্ডেটযুক্ত মিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হতে কম আগ্রহ প্রকাশ করে এবং স্ব-ইচ্ছায় অংশ নিতেও চায় না। কার্যত চতুর্থ পর্যায়ের মিশন সমাপ্তি পরবর্তী সদ্য সংঘাত উত্তর রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং নতুন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিও ধারাবাহিকতায় এ ধরনের মিশন পরিচালিত হয় । যেমন – সুদানের UNMIS মিশন পরবর্তী নব্য স্বাধীন প্রাপ্ত রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদানে পরিচালিত UNMISS মিশন। এ পর্যায়ের ৭টি মিশন পাওয়া যায় – রুয়ান্ডার UNAMIR মিশন (১৯৯৩), বসনিয়া হার্জগবিনায় UNMIBH মিশন

(১৯৯৫), বুরুন্ডির ONUB মিশন (২০০৪), দাফুর এর UNAMID মিশন (২০০৭), ডি আর কঙ্গোতে MONUSCO মিশন (২০১০-২০১১), দক্ষিণ সুদানে UNMISS মিশন (২০১১) এবং তিমুর লেস্টে UNMIT মিশন (২০১১)। তান্মধ্যে ২টি মিশনে - বুরুন্ডির ONUB মিশন এবং তিমুর লেস্টে UNMIT মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণ অংশগ্রহণ করেনি[৩১]।

১৯৯৩ সালে রুয়ান্ডার UNAMIR মিশনে বাংলাদেশের ১০২২ জন শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে। এ মিশনে জাতীয় কর্তৃপক্ষ হতে সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় নির্বাচনের চূড়ান্ত সময়ে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং দেশীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা করা হয়[৩২]।

General Framework Agreement for Peace এর আলোকে ১৯৯৫ সালে বসনিয়া হার্জগবিনায় UNMIBH মিশনে বাংলাদেশী ১৭৭ জন শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে। জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যবেক্ষক ও ব্যক্তিদের নিরাপত্তা পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য এ মিশন কাজ করে[৩৩]। মূলত মিশনটি সুনির্দিষ্টভাবে দেশীয় আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষে।

২০০৭ সালে দারফুর শান্তি চুক্তি অনুসারে সুনির্দিষ্টভাবে গণভোট আয়োজনে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য UNAMID মিশন গঠন ও মোতায়েন করা হয়। এ মিশনে বাংলাদেশী ৮৮২৮ জন শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে[৩৪]।

ডি আর কঙ্গোতে দীর্ঘ দিন থেকে শান্তিমিশন পরিচালিত ছিলো। ২০০৪ সালে MONUC মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা অংশগ্রহণ করে। এ মিশনটি একটি তৃতীয় মাত্রার মিশন ছিলো। নির্বাচন পরবর্তী কঙ্গোতে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১০-২০১১ সালে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে জাতীয় নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করার লক্ষে MONUSCO মিশন গঠিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কঙ্গোলী সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের

সাথে সংলাপ আয়োজন, মানবাধিকার সুরক্ষা, নারীর ভোটাধিকার সুরক্ষার SRSG নেতৃত্বে স্থানীয় Good Office এর বিভিন্ন সাব সেকশনের মাধ্যমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা কাজ করে।

২০১১ সালে সুদান হতে দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হওয়ার পর একটি নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র গঠন, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সচল রাখা এবং দক্ষিণ সুদান সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতার লক্ষে UNMISS মিশন গঠিত হয়। সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ ও সহযোগিতা করার মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ণ চর্চার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ মিশনে বাংলাদেশের ৬২৫৮ জন শান্তিরক্ষী কর্মরত রয়েছে।

উপসংহার

উপরোক্ত ২৬টি মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ ও কাজের ধরন অনুয়ায়ী দেখা যায় প্রথম স্তরের নির্বাচনী ম্যান্ডেট যুক্ত মিশনগুলোতে শান্তিরক্ষা মিশন নির্বাচনী সকল দায়িত্বের একক ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। কিন্তু এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ দেশী গোষ্ঠীসমূহের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। দেখা যায়, পশ্চিম সাহারায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে কাজ করছে কিন্তু এখনও নির্বাচন আয়োজন করতে পারেনি। বাংলাদেশী নিরস্ত্র পর্যবেক্ষকগণ এখানে ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করতে পেরেছে কিন্তু স্থানীয় অংশীজনদের অসহযোগিতার কারণে নির্বাচনী সীমানা এখনো নির্ধারণ করতে পারেনি। এ ব্যর্থতার জন্য অনেকে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মিশন ম্যান্ডেটের প্রকৃতি ও শান্তিরক্ষীদের উপর অর্পিত কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করেন[৩৫]। অপর দিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মিশন সমূহে নির্বাচনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সহায়তা না করে বিদ্যমান নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। আবার পঞ্চম স্তরের ম্যান্ডেট সম্পন্ন মিশনে সুনির্দিষ্টভাবে আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের চাহিদা অনুয়ায়ী সীমিত পরিসরে নির্বাচনী সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র চতুর্থ স্তরের নির্বাচনী মিশনগুলো সমন্বিতভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং সক্ষমতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে একটি দেশীয় নির্বাচনী কাঠামো গড়ে তোলে যার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক চর্চা, গণতন্ত্রায়ন এবং টেকসই শান্তি স্থাপন সম্ভব হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে চতুর্থ স্তরের মিশন সুদানের UNMIS কে কেস হিসেবে ব্যাখা করা হয়েছে। এ কেস বিশ্লেষণের মাধ্যমে

নীতি নির্ধারণী পর্যায় হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা কীভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশন গঠন, প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি -বিধান রচনা, ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

[১] United Nation, global Issue on Democracy, at https://www.un.org/en/global-issues/democracy প্রবেশ ২০অক্টোবর, ২০২০

[২] প্রাগুক্ত।

[৩] Responsibility of Electoral Assistance Division of DPPA, UN at https://dppa.un.org/en/elections, প্রবেশ ২০ অক্টোবর, ২০২০।

[৪] প্রাগুক্ত।

[৫] আফগানিস্তান*, অ্যাঙ্গোলা, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, বাংলাদেশ, বেলিজ, বেনিন, বলিভিয়া (বহুজাতিক রাষ্ট্র), ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র*, চাঁদ, কোট ডি আইভায়ার, গণপ্রজাতান্ত্রিক কঙ্গো*, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, ইথিওপিয়া, গাম্বিয়া, গুয়াতেমালা, গিনি, গিনি-বিসাউ*, হাইতি*, হন্ডুরাস, ইরাক*, কেনিয়া, কিরগিজস্তান, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া*, মাদাগাস্কার, মালাউই, মালয়েশিয়া, মালি*,মরিশাস, মেক্সিকো, মোজাম্বিক, মায়ানমার, নাউরু, নেপাল, নাইজার, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউ গিনি, প্যারাগুয়ে, মোল্দাভিয়া প্রজাতন্ত্র, রুয়ান্ডা, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ, :.সাও টোমে এবং প্রিনসিপে, সিয়েরা লিওন, সলোমান দ্বীপপুঞ্জ, সোমালিয়া*, তিমুর-লেস্টে, তিউনিসিয়া, ভানুয়াতু, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে।

*জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট অনুসারে নির্বাচনী সহায়তা প্রাপ্ত।

[৬] Factsheets, UN Electoral Assistance, at https://dppa.un.org/en/elections প্রবেশ ২জুলাই ২০২১।

[৭] Responsibility of Electoral Assistance Division of DPPA, UN at https://dppa.un.org/en/elections, প্রবেশ ২০ অক্টোবর, ২০২০

[৮] আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস-২০২০ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বানী। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ মে ২০২০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬।

[৯] https://www.army.mil.bd/PeaceKeeping-Work, accessed on 20 February, 2020 এবং আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস, ২০১৯ এর ক্রোড়পত্র, দৈনিক সমকাল ২৯ মে, ২০১৯, ঢাকা।

[১০] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), The Role of Peacekeeping Operations in Electoral Process, School of International and Public Affairs, Columbia University (https://www.sipa.columbia.edu) এবং Department of Political and Peacebuilding Affairs, DPPA (https://dppa.un.org) হতে প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক গননাকৃত।

[১১] নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত মিশন গনণার ক্ষেত্রে ১৯৯১ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত মিশনের তথ্য গনণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ের মিশনগুলো সম্পর্কে ডিপিপিএ কর্তৃক প্রকাশিত দলিলের অনুপস্থিতি এবং এ মিশন সমূহসম্পর্কে মিশন সমাপ্তির মূল্যায়ণ প্রতিবেদনসমূহ না পাবার কারণে তা গনণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

[১২] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), প্রাগুক্ত।

[১৩] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), প্রাগুক্ত; এবং বায়লাদেশ সসস্ত্র বাহিনীর ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ট্রুপস সংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

[১৪] Specifics found in SG Report S/23613, UNTAC, 1992, UN

[১৫] Security Council Mandate no-1246, paragraph 4(b), UNAMET, 1999, UN.

[১৬] Security Council Mandate no-1244, paragraph 11(C), UNAMET, 1999, UN.

[১৭] https://peacekeeping.un.org/en/our-successes accessed 19 February 2020.

[১৮] Security Council Mandate no-866, paragraph 3(C), UNOMIL, 1993, UN

[১৯] Security Council Mandate no-1765, paragraph 6, UNOCI, 2007, UN.

[২০] সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত একজন কর্মকর্তার সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার, আগস্ট, ২০২০, ঢাকা।

[২১] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), cÖv¸³|

[২২] Security Council Mandate no-1565, paragraph 5f, MONUC, 2004, UN.

[২৩] Security Council Mandate no-1389, paragraph 1, UNAMSIL, 2002, UN.

[২৪] Security Council Mandate no-1509, paragraph 3s, UNMIL, 2003, UN.

[২৫] Security Council Mandate no-1542, paragraph 7Hc, MINUSTAH, 2004, UN.

[২৬] Bangladeshi Peacekeepers get UN medal in Haiti,' New Age, 16 May 2012, at http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-05-16&nid=10477 accessed 21 December, 2019).

[২৭] Security Council Mandate no-1589, paragraph 3-5, UNAMA, 2004, UN.

[২৮] Security Council Mandate no-1927, paragraph 8 and Mandate no-1944, paragraph 4, MINUSTAH, 2010, UN.

[২৯] Security Council Mandate no-1590, paragraph 4a(x), UNMIS, 2005 and Mandate no-1870, paragraph 11, UNMIS, 2009, UN.

[৩০] Security Council Mandate no-1885, paragraph 2, UNMIL, 2009, UN.

[৩১] বিস্তারিত দেখুন- Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০-৬১।

[৩২] Security Council Mandate no-872, paragraph 3 (c), UNAMIR, 1993, UN.

[৩৩] Security Council Mandate no-1035, paragraph- Annex 11 of General Framework Agreement for Peace, 1995, UN.

[৩৪] Security Council Mandate no-1769, paragraph Mandate outlined in Para 54-55 of (S/2007/307/Rev.1), UNAMID, 2007, UN.

[৩৫] বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং একাধিক মিশনে অংশগ্রহণকারী একজন মুখ্য তথ্যদাতা এ মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি মন্তব্য করেন, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো অনেক সময় বাস্তবতার বাহিরে গিয়ে তথা একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি মিশন কতটুকু দায়িত্বপালন করতে পারবে তা ম্যান্ডেট নির্ধারণের সময় অনেক ক্ষেত্রে বিবেচনা না করা হয় না, ফলে মিশন সকল ম্যান্ডেট পূরণ করতে পাওে না, দীর্ঘায়ীত হয় মিশন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সেপ্টেম্বর ১২, ২০২১, ঢাকা।

পঞ্চম অধ্যায়

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী: জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সুদান (UNMIS) এর ভূমিকার পর্যালোচনা

ভূমিকা

১৯৯১ সালে জাতিসংঘের নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর হতে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবনার মাধ্যমে শান্তিরক্ষীরা পৃথিবীর ২৫টি দেশে ৩২টি নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত মিশন বাস্তবায়ন করেছে বা করছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা ২০টি দেশে ২৬টি মিশনে দায়িত্ব পালন করেছে বা করছে। সব মিশনের নির্বাচনী ম্যান্ডেট ও দায়িত্বের ব্যাপ্তি যেমন এক হয় না, তেমনি মিশনের মেয়াদও সমান হয় না। জাতিসংঘের নিয়মানুসারে একটি মিশনে একজন শান্তিরক্ষীকে এক বছরের জন্য প্রেরণ করা হয়। ফলে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারী শান্তিরক্ষীর দায়িত্বকালীন সময়ে ঐ দেশে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু নাও হতে পারে। ফলে একজন শান্তিরক্ষী নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত মিশনে দায়িত্ব পালন করেও নির্বাচনী অভিজ্ঞতা নাও পেতে পারেন। অন্যদিকে, মিশন ভেদে নির্বাচন পূর্ববর্তী বা নির্বাচনের দিন বা নির্বাচন পরবর্তী শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা কোন কোন মিশনের দায়িত্ব থাকে। আবার কোন মিশনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব থাকে না, শুধু নির্বাচন পরিচালনা ম্যান্ডেট থাকে। এসব বিবেচনায় দেখা যায় বাংলাদেশ নির্বাচনী ম্যান্ডেট সম্বলিত যেসব মিশনে কাজ করেছে এর মধ্যে আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য ছিলো, সুদান, কঙ্গো, পূর্ব তিমুর, মালি এবং হাইতি। সুদান ও পূর্ব তিমুর গণভোটের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং আইনের শাসন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বিষয় ম্যান্ডেট ভুক্ত। কিন্তু, মালি, কঙ্গো বা আইভরিকোস্টের নির্বাচন ছিলো সাংবিধানিক জাতীয় নির্বাচন পরিচালনায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতার ম্যান্ডেট। কিন্তু, সুদানের মিশনটির (United Nation Mission in Sudan, UNMIS) ম্যান্ডেটে জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোটের দুটি দিকই অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে যুক্ত ছিলো আইনের শাসন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব। এসব বিবেচনায় কেস হিসেবে সুদান মিশনটি জাতীয় নির্বাচন, গণভোট, আইনের শাসন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত। সুদান মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের মধ্যে অন্যতম প্রধান দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। এ মিশনে মোট ৯৩০৪ জন সেনা সদস্যের (troops) মধ্যে বাংলাদেশী সেনা শান্তিরক্ষী ৯০২৩ জন, এর সাথে সেনা পর্যবেক্ষক ও পুলিশ শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করে। সৈনিকের (troops) সংখ্যার দিক হতে বলা যেতে পারে, সুদানের UNMIS মিশনটি

ছিলো বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের একক মিশন। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী UNMIS মিশনে নির্বাচনের অনেক পূর্ব হতে (২০০৫ সাল) মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসন ও সংঘাত প্রশমনে কাজ শুরু করে[১]। এ সময়ে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মিশনের দায়িত্ব হিসেবে সুদানের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত হয়। বিশেষ করে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন গঠন, ভোটার রেজিষ্ট্রেশন, জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিষদের আসনের সীমানা নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে কারিগরি সহায়তাদান এবং পুলিশবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। আবার নির্বাচনকালীন নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা, স্থিতিশীলতা রক্ষা, সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচন পরবর্তী স্থিতিশীল পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে। বর্তমান অধ্যায়ে কেস স্টাডি হিসেবে সুদানের UNMIS মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.১ দক্ষিণ সুদানের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসন হতে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। আফ্রিকার দেশ সুদান এসব নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি। তেত্রিশ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশটি উত্তর সুদান ও দক্ষিণ সুদানে বিভক্ত। উত্তর সুদানের ৯০.৭ শতাংশ জনগণ সুন্নি মুসলমান, ৫.৪% খ্রিস্টান ও ৩.৯% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। অপরদিকে, দক্ষিণ সুদানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খ্রিস্টান (৬০.৫%), আদি বা অ্যানিমিস্ট (indigenous/animist) ধর্মাবলম্বী ৩২.৯% এবং মুসলমান ৬.২%[২]। সুদানে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রায় ৬০০ উপজাতি রয়েছে, কিন্তু সরকারীভাবে মাত্র দুটি ভাষা প্রচলিত আরবি এবং ইংরেজি। দক্ষিণ সুদানের যুবা এবং উত্তর সুদানের খার্তুমকে কেন্দ্র করে নগর কেন্দ্রিক উন্নয়ন সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে সুদান স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৯ বছরব্যাপী দেশটিতে দু'টি গৃহযুদ্ধে ব্যাপক নৃশংসতা, কলহ ও নাগরিক সহিংসতা সংঘটিত হয়। এ গৃহযুদ্ধের মূলে রয়েছে দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতা বা স্বাধিকার আন্দোলন[৩]।

প্রথম গৃহযুদ্ধ ১৯৫৫ সাল হতে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত 'এ্যানেয়া' (Anyanya) নেতৃত্বাধীন এবং দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ ১৯৮৩ হতে ২০০৫ পর্যন্ত সুদান পিপলস লিবারেশন আর্মি (এসপিএলএ) নেতৃত্বাধীন সংঘটিত হয়। 'এ্যানেয়া' (Anyanya) হলো প্রথম সুদানীয় গৃহযুদ্ধের সময় গঠিত একটি দক্ষিণ সুদানী বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী সেনা গোষ্ঠী। মাদী ভাষায় 'এ্যানেয়া' অর্থ হচ্ছে "সাপের বিষ"[৪]। ১৯৬৩ সালে দক্ষিণাঞ্চলীয় মুরু,

নুয়ের, লোটুকো, মাদী, বারী, আচলি, জাঁদে, দিনকা উপজাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণ সুদানী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী 'এ্যানেয়া', যারা স্বাধিকারের জন্য সুদানী সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়[৫]।

টেবিল ৫.১

এক নজরে UNMIS মিশনে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কার্যক্রম

দেশ		সুদান
গৃহযুদ্ধে জড়িত প্রধান পক্ষদ্বয়		দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহী গোষ্ঠী সুদান পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট/আর্মি (এসপিএলএম/এ) এবং সুদানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী।
দ্বন্দ্বের মূল কারণ		সম্পদের মালিকানা, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব, জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রে ধর্মের ভূমিকা ও বঞ্চনা প্রশ্নে এসপিএলএম/এ ও সুদান সরকার এর মধ্যকার বিরোধ ছিলো দ্বন্দ্বের মূল কারণ। ১৯৫৬ সালে থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৯ বছরব্যাপী দেশটিতে দু'টি গৃহযুদ্ধে ব্যাপক নৃশংসতা, কলহ ও নাগরিক সহিংসতা সংঘটিত হয়। এ গৃহ যুদ্ধের মূলে ছিলো দক্ষিণ সুদানের স্বাধিকারের আন্দোলন।
দ্বন্দ্বের প্রভাব		গৃহযুদ্ধে প্রায় বিশ লাখ লোক মারা যায়, ৪০ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয় এবং ৬ লাখ লোক শরণার্থী হিসেবে দেশ ত্যাগ করে।
মিশন নাম		United Nations Mission in the Sudan (UNMIS)
নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাবনা গৃহীত হওয়ার তারিখ		২৪ মার্চ ২০০৫
মিশনের উল্লেখযোগ্য কর্যেক্রম	নাগরিক অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষা কার্যক্রম	শান্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধপূর্ণ সকল গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ আইন ও বিধিমালা প্রণয়নে সহায়তা, জাতীয় নির্বাচন কমিশন গঠন, বিচার কাঠামো নির্মাণ, প্রশাসনসহ পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবেশ সৃষ্টি, আস্থা অর্জন ও নির্বাচনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার সুরক্ষা, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচারণা, ভোটার শিক্ষা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সমন্বয় ইত্যাদি।
	নির্বাচনী কার্যক্রম	রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন, ভোটার রেজিস্ট্রেশন, জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিষদের আসনের সীমানা নির্ধারণ, ব্যালেট পেপারসহ নির্বাচনী উপকরণের পরিবহণ ও সংরক্ষণ, ভোট আয়োজন, ফলাফল গণনা, নির্বাচনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।
জাতীয় পরিষদ নির্বাচন		এপ্রিল ২০১০
স্বাধীনতার জন্য গণভোট		জানুয়ারি ২০১১
নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র		দক্ষিণ সুদান
মিশনের সমাপ্তি		৯ জুলাই ২০১১
অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী সেনা শান্তিরক্ষীর সংখ্যা		৯০২৩ জন (৯৬.৯৭%) {মিশনে মোট সেনা শান্তিরক্ষী ৯৩০৪ জন}

এই আন্দোলনটি এ্যানেয়া বিদ্রোহ বা প্রথম সুদানীয় গৃহযুদ্ধ হিসেবে পরিচিতি। এ গৃহযুদ্ধটি ১৯৭২ সালে আদ্দিস আবাবা চুক্তি (Addis Ababa Agreement) স্বাক্ষরের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। কিন্তু এক দশকে চুক্তির শর্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় এ্যানেয়া যোদ্ধারা পুনরায় মিলিত হতে থাকে। ১৯৮৩ সালে দ্বিতীয় সুদানী গৃহযুদ্ধ

শুরু হলে এ চুক্তিটি ভেঙ্গে যায় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় সুদান পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট/আর্মি (এসপিএলএম/এ) এবং দক্ষিণ সুদানীদের নেতৃত্ব এ্যানেয়াদের হতে এসপিএলএম/এ এর নিকট চলে আসে।

উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুত্রপাত হয় অসম উন্নয়ন, ধর্মীয় আধিপত্যবাদ ও জাতিগত আত্ম পরিচয়ের দাবি থেকে। গৃহযুদ্ধ ও নাগরিক কলহের মূল কারণ হলো টেকসই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে প্রান্তিক নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী ও সাধারণ জনগণের অব্যাহত বঞ্চনা, রাজনৈতিক দমন ও নিপীড়ন, দক্ষিণের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষাকে উপেক্ষা এবং খার্তুমভিত্তিক ন্যাশনাল অ্যারাবাইজড-কাম-ইসলামিক এলিট (Nationalist Arabized-cum-Islamic elite) দ্বারা সুদানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে আধিপত্য ও শোষণ। এ শক্তিশালী ইসলামিক জাতীয়তাবাদী অভিজাতরা ষাটের দশকে গণতান্ত্রিক এবং আশির দশকের সামরিক সরকারের সময়ে দেশের রাজনৈতিক, সামরিক, নিরাপত্তা, গোয়েন্দা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। কার্যত ঔপনিবেশিক সময় হতে ব্রিটেনের প্রশাসনিক নীতি ও পরিকল্পনা দক্ষিণ সুদানকে দেশের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা করেছিল, যা দক্ষিণ সুদানের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশকে বিলম্বিত করেছিল[৬]। ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেন কর্তৃক সুদানের দু'অঞ্চলের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসমতা ও বৈরিতার মাঝে একজাতি রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্যে এ দ্বন্দ্বের শিকড় নিহিত। এছাড়া, সুদানের দ্বন্দ্বের শিকড়ে বহু শতাব্দী ধরে দু'অঞ্চলের অসম বিকাশ, নির্মমভাবে ক্রীতদাস বাণিজ্য, শোষণমূলক জাতিগত এবং ধর্মীয় বিভাজনসহ বাণিজ্য অনুশীলন দায়ী।

সম্পদের মালিকানা, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব, স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রে ধর্মের ভুমিকা নিয়ে সুদান সরকার ও সুদান পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট/আর্মি (এসপিএলএম/এ) মধ্যকার দু'দশকের বেশি সময়ব্যাপী দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধে প্রায় বিশ লাখ লোক মারা যায়, ৪০ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয় এবং ৬ লাখ লোক শরণার্থী হিসেবে দেশ ত্যাগ করে। সুদানের বৈদেশিক আয়ের অন্যতম উৎস দক্ষিণাঞ্চলের খনিজ তেল। কিন্তু এ থেকে অর্জিত আয় ব্যয় হয় উত্তরের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে। বৈষম্যমূলক এ উন্নয়ননীতি সুদানের গৃহযুদ্ধকে দক্ষিণ

সুদানীদের স্বাধিকার আন্দোলনের যুদ্ধে রূপ নেয়। কার্যত বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের শেষের দিকে সুদান গৃহযুদ্ধ দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতা তথা স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপ নেয়[৭]।

৫.২ শান্তি প্রতিষ্ঠায় আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক উদ্যোগ এবং জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্তি

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহ, দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের চাপে ১৯৯৩ সালে সুদানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) গঠিত হয়। জাতিসংঘ নিবিড় ভাবে শান্তি উদ্যোগটি পর্যবেক্ষণ করে। এ উদ্যোগের ফলে ১৯৯৭ সালে আফ্রিকায় জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে মোহাম্মদ শানুন কে নিয়োগ করেন। ২০০২ সালের ১০-১২ জুলাই জাতিসংঘ মহাসচিব সুদান সফর করেন এবং শান্তির লক্ষ্যে ২০ জুলাই সংঘর্ষে জড়িত পার্টিগুলো Machakos Protocol স্বাক্ষর করে। এ প্রটোকলে ক্রান্তিকালীন ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া, সরকার কাঠামো, দক্ষিণ সুদানের স্বায়ত্বশাসন, সম্পদ ও ক্ষমতার অংশীদারিত্ব, মানবাধিকার ও যুদ্ধ বিরতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়[৮]। সংঘাতে জড়িত দল গুলোর মধ্যে IGAD এর উদ্যোগে ২০০৪ সালে জানুয়ারিতে সম্পদ ভাগাভাগি চুক্তি (Wealth sharing), এপ্রিল মাসে Humanitarian Ceasefire Agreement এবং মে মাসে ক্ষমতা ভাগাভাগি (Power sharing) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়[৯]।

সুদানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ক্রমান্বয়ে জাতিসংঘের চারটি মিশন পরিচালিত হয়। মিশনগুলো হচ্ছে- United Nations Advance Mission in the Sudan (UNAMIS), United Nations Mission in the Sudan (UNMIS) United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) এবং United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)। ১১ জুন, ২০০৪ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সুদানের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৫৪৭(২০০৪)নং রেজোলিউশন গ্রহণ করে এবং অগ্রবর্তী বিশেষ রাজনৈতিক মিশন হিসেবে UNAMIS গঠিত হয়। UNAMIS ম্যান্ডেট ছিলো সংঘর্ষে জড়িত দলগুলোকে শান্তি প্রক্রিয়ায় আগ্রহী করা এবং অন্তর্ভুক্ত করা[১০]। ২০০৫ সালের ২৪ মার্চ সমন্বিত শান্তিচুক্তি (Comprehensive Peace Agreement) বাস্তবায়নের লক্ষে জাতিসংঘের ১৫৯০ নং প্রস্তাবনার মাধ্যমে গঠিত হয় United Nations Mission in Sudan (UNMIS)। এ মিশনের ম্যান্ডেটে সিপিএ বাস্তবায়নে জাতীয় নির্বাচন ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতার জন্য

গণভোট আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুদানে UNMIS মিশন শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বাঁধার সম্মুখীন হয়, যেমন- সীমান্তবর্তী প্রদেশ দারফুর মনে করে জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সময়ক্ষেপন করছে; বিরোধী দলগুলো জাতিসংঘের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং বিশেষ করে দারফুর ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদী মিলিশিয়ারা দারফুরের শান্তি আলোচনা থেকে নিজেদের আলাদা করে এবং পৃথকভাবে স্বায়ত্বশাসনের দাবি তোলে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ, দারফুরের সহিংসতা প্রশমন এবং দক্ষিণ সুদানের শান্তি প্রক্রিয়ায় দারফুরের অংশগ্রহণ ও আস্থা সংহত করতে আফ্রিকান ইউনিয়নের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ৫মে, ২০০৬ দারফুর শান্তি চুক্তি (Darfur Peace Agreement (DPA) স্বাক্ষরিত হয়। জাতিসংঘের মহা সচিব বলেন, 'সংঘাতের তিন বছর পর এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিবাদমান গোষ্ঠীসমূহ অস্ত্র পরিহার করবে। তবে, যে সব গ্রুপ চুক্তির বিরোধীতা করেছে এবং যারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এ উভয় গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বিষয়টি প্রশমনে সরকার জাতিসংঘ সহ সকল পক্ষকে কাজ করতে হবে'[১১]। এ প্রেক্ষিতে, দারফুর চুক্তির আলোকে দারফুর তথা বৃহত্তর সুদানের শান্তি প্রতিষ্ঠায় ৬ মে ২০০৬ নিরাপত্তা পরিষদের ১৭৬৯ (২০০৬) রেজোলিউশনের আলোকে UNAMID গঠিত হয়। এ মিশনের লক্ষ্যে বলা হয় গণভোটের আলোকে সুদান বিভক্ত হওয়ার পূর্বে দেশীয় কর্তৃপক্ষ গুলোর হাতে কর্তৃত্ব অর্পন করা হবে এবং এ জন্য UNMIS মিশনের ম্যান্ডেট অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন গণভোটের আগে অনুষ্ঠিত হবে। জানুয়ারি ২০১১ সালে গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জুলাই ২০১১ UNMIS মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা প্রশমন, রাষ্ট্র গঠন, গণতান্ত্রিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক শান্তির স্থিতিশীলতা রাখার জন্য ২০১১ সালে নব্য স্বাধীন দক্ষিণ সুদানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৯৬(২০১১) নং প্রস্তাবের আলোকে United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) গঠিত হয়, বর্তমানে এ মিশনটি চলমান রয়েছে। সুদানের উল্লেখিত এ ৪টি মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ UNAMIS ব্যতীত অপর তিনটি মিশনের অংশগ্রহণকারী দেশ। এ তিনটি মিশনের মধ্যে UNMIS ও UNAMID মিশন সম্পন্ন হয়েছে এবং UNMISS চলমান রয়েছে। বর্তমান কেস স্টাডিতে শুধু UNMIS মিশন এর পূর্বাপর ঘটনাবলী ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেননা, এ মিশনটি বহুমাত্রিক মিশন হিসেবে অন্য সকল মিশনকে একীভূত করেছে এবং এ মিশনের ম্যান্ডেট অনুসারে নির্বাচন ও গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে।

৫.৩ শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি মিশন UNMIS এর গঠন, কার্যক্রম ও ম্যান্ডেট

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চাপ এবং দীর্ঘ চার বছরের সমঝোতার চেষ্টার ফলে ২০০৫ সালে ৯ জানুয়ারি কেনিয়ার নাইরোবীতে সুদান সরকার ও এসপিএলএম/এ মধ্যে সমন্বিত শান্তি চুক্তি (Comprehensive Peace Agreement, CPA) স্বাক্ষরিত হয়। সিপিএ একমাত্র উদ্যোগ যা দীর্ঘ দিন ধরে বিরাজমান সুদানের গৃহযুদ্ধের সমস্যাকে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রশমনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ চুক্তিতে সুদানে জাতীয় নির্বাচন এবং সুদান হতে দক্ষিণ সুদানের সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি গণভোটের আয়োজনের কথা বলা হয়। সিপিএ বাস্তবায়নের লক্ষে ২৪ মার্চ ২০০৫ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ১৫৯০ (২০০৫) প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবনা অনুসারে দশ হাজার সেনা শান্তিরক্ষী, বেসামরিক শান্তিরক্ষী এবং ৭১৫ পুলিশ সদস্যের সমন্বয়ে United Nations Mission in Sudan (UNMIS) গঠিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ- ইউএনএমআইএসের কার্যক্রম হিসেবে বলা হয় বিভিন্ন অংশীদারদের সহযোগিতায় সিপিএ বাস্তবায়ন করা; আওতাধীন এলাকায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় ফিরে আসা এবং মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা, মাইন অপশারনের সাথে জড়িত পক্ষগুলিকে সহায়তা করা, সুদানের মানবাধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা[১২]।

UNMIS এর ম্যান্ডেটে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় শান্তি প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক সহযোগিতার জন্য Good office[1] স্থাপন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সুশাসন ও মানবাধিকার সমন্বিত রাখা এবং মিশনের মাধ্যমে অন্তবর্তীমূলক সহায়ক পরিবেশ গঠন ও নির্বাচন আয়োজন[১৩]। মিশনের ৯ ও ১০ নং ম্যান্ডেটে স্পষ্ট করে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন ও প্রস্তুতিতে কারিগরি ও উপকরণ সহায়তার দায়িত্ব শান্তি মিশনকে প্রদান করা হয় – "to provide guidance and technical assistance to the parties to the Comprehensive Peace Agreement, in cooperation with other international actors, to support the preparations for and conduct of elections and referenda provided for by the Comprehensive Peace Agreement.[১৪]

[1] বহুমাত্রিক শান্তি মিশনে রাজনৈতিক সমঝোতা এবং ঝুঁকি প্রশমনে মাঠ পর্যায়ে Department of Political and Peacebuilding Affairs একটি দপ্তর স্থাপন করে থাকে, যা GOOD Office নামে পরিচিত। প্রত্যয়টি দ্বারা এমন একটি দপ্তরকে বুঝানো হয় যেখানে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা দ্বন্দ্বে জড়িত পার্টিগুলোকে তাদের দ্বন্দ্ব সংকট হতে উত্তরণে ও সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে নিরপেক্ষভাবে সহযোগিতা করা হয়। এটি শুধু মধ্যস্থতা নয় বরং আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।যেখানে বিরোধে জড়িত প্রত্যেকটি পার্টি, গোষ্ঠী, ব্যক্তি বা সরকার বিরোধী পক্ষ হতে তথ্য আদান প্রদান এবং যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। এ দপ্তরটি বিশেষজ্ঞ স্টাফ দ্বারা পরিচালিত হয়।

UNMIS ২০০৫ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। একটি সমন্বিত বহুমাত্রিক মিশন হিসেবে এর সামরিক ও বেসামরিক দুটি শাখা কার্যকর ছিলো। এরকম মিশনে জাতিসংঘের মহাসচিবের একজন বিশেষ দূত Special Representatives of the Secretary General, (SRSG) নিয়োজিত হন এবং মিশন প্রধান (Heads of Mission) হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ইউএনএমআইএস দীর্ঘস্থায়ী মিশন হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন একাধিক এসআরএসজি দায়িত্ব পালন করেন এবং মিশনের নেতৃত্ব দেন। নিম্নের টেবিল সমূহে এসআরএসজি/মিশন প্রধান, ফোর্স কমান্ডার ও পুলিশ কমিশনারদের তালিকা উল্লেখ্য করা হলো-

টেবিল ৫.২

ইউএনএমআইএস মিশনে এসআরএসজি ও মিশন প্রধানদের তালিকা

ক্রম.নং	নাম	দেশ	সময়কাল
১	জন প্রন্ক (Jan Pronk)	নেদারল্যান্ড	মার্চ ২০০৫ হতে ডিসেম্বর ২০০৬
২	তায়ে-ব্রুক জেরিহণ (Taye-Brook Zerihoun) (ভারপ্রাপ্ত)	ইথিওপিয়া	জানুয়ারি ২০০৭ হতে সেপ্টেম্বর ২০০৭
৩	আশরাফ জাহাঙ্গীর কাজী (Ashraf Jehangir Qazi)	পাকিস্তান	সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১০
৪	হালি ম্যানকেরিস (Haile Menkerios)	দক্ষিণ আফ্রিকা	মার্চ ২০১০ হতে জুলাই ২০১১

উৎস: https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/UNMIS/leadership.shtml

টেবিল ৫.৩

ইউএনএমআইএস মিশনের ফোর্স কমান্ডারদের তালিকা

ক্রম.নং	নাম	দেশ	সময়কাল
১	লে. জেনারেল জাসবির সিং লিড্ডার (Lieutenant General Jasbir Singh Lidder)	ভারত	জানুয়ারি ২০০৬ হতে মে ২০০৮
২	মেজর জেনারেল পাবন থপা (Major General Paban Thapa)	নেপাল	মে ২০০৮ হতে মে ২০১০
৩	মেজর জেনারেল মসেস বিইসং অভি (Major General Moses Bisong Obi)	নাইজেরিয়া	জুন ২০১০ হতে জুলাই ২০১১

উৎস: https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/UNMIS/leadership.shtml,প্রবেশ ২০জুন,২০২০।

টেবিল ৫.৪
ইউএনএমআইএস মিশনের পুলিশ কমিশনারদের তালিকা

ক্রম.নং	নাম	দেশ	সময়কাল
১	জেলেন গিলবার্টসন (Glen Gilbertson)	যুক্তরাজ্য	মার্চ ২০০৫ হতে মে ২০০৬
২	জেরি হেভার (Gerry Hover) [ভারপ্রাপ্ত]	যুক্তরাষ্ট্র	জুন ২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০০৬
৩	কাই ভিট্রাপ (Kai Vittrup)	ডেনমার্ক	সেপ্টেম্বর ২০০৬ হতে অক্টোবর ২০০৮
৪	রাজেশ দেওয়ান (Rajesh Dewan)	ভারত	ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১১
৫	কালুস ডিটার-টিটজ (Klaus Dieter-Tietz) [ভারপ্রাপ্ত]	জার্মানি	ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে জুলাই ২০১১

উৎস:https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/UNMIS/leadership.shtml,প্রবেশ২০ জুন,২০২০।

৫.৩.১ মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশ ও সেনা সংখ্যা

প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার সেনা, ৭৫০ সেনা পর্যবেক্ষক, ৭১৫ পুলিশ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেসামরিক (সিভিলিয়ান) কর্মী দ্বারা মিশনটি পরিচালিত হয়। নির্বাচনকালীন সময়ে ২০১১ সালে জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী মোতায়ন করা হয়। মোট ১০ হাজার ৫১৯ জন পোশাকধারী শান্তিরক্ষী [৯ হাজার ৩০৪ জন সেনা সদস্য (troops), ৫১৩ জন সেনা পর্যবেক্ষক, ৭০২ জন পুলিশ], ৯৬৫ জন বেসামরিক কর্মী, ২ হাজার ৮৩৭ জন বেসামরিক স্থানীয় কর্মী এবং ৪৭৭ জন জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচনকালীন সময়ে কাজ করে। পৃথিবীর ৬২ টি দেশের সেনা শান্তিরক্ষী এ মিশনে অংশগ্রহণ করে[২]।

পৃথিবীর ৪২টি দেশের পুলিশ শান্তিরক্ষী এ মিশনে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হলো – আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, মিশর, এল সালভাদোর, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, জার্মানি, ঘানা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জ্যামাইকা, জর্দান, কেনিয়া, কিরগিস্তান, মালয়শিয়া, মালি, নামিবিয়া, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, নরওয়ে, পাকিস্তান,

[২] দেশগুলো হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, বেনিন, বলিভিয়া,ব্রাজিল, বুর্কিনা ফাসো, কম্বোডিয়া, কানাডা, চীন, ক্রোয়েশিয়া, ডেনমার্ক, ইকুয়েডর, মিশর, এল সালভাদোর, ফিজি, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, ঘানা,গ্রীস, গুয়াতেমালা, গিনি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জর্দান, কেনিয়া, কিরগিস্তান, মালয়শিয়া, মালি, মোল্দোভা, মঙ্গোলিয়া, নামিবিয়া, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নাইজেরিয়া, নরওয়ে, পাকিস্তান, প্যারাগুয়ে, পেরু, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড, প্রজাতন্ত্রের কোরিয়া, রোমানিয়া, রাশিয়ান ফেডারেশন, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, উগান্ডা, ইউক্রেন, যুক্তরাজ্য, ইয়েমেন এবং জাম্বিয়া।

ফিলিপাইন, রাশিয়ান ফেডারেশন, রুয়ান্ডা, সামোয়া, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, তুরস্ক, উগান্ডা, ইউক্রেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইয়েমেন, জাম্বিয়া এবং জিম্বাবুয়ে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ ৬ বছরের এ মিশনে ৬০জন শান্তিরক্ষী মৃত্যুবরণ করে (সেনা ২৩ জন, পুলিশ ৩ জন, সেনা পর্যবেক্ষক ৩জন, আর্ন্তজাতিক বেসামরিক কর্মী ৮জন, স্থানীয় বেসামরিক কর্মী ২২ জন এবং ১ জন অন্যান্য)।

মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী দলের সাথে বিভিন্ন সাপোর্টিং কোম্পনীতে সংযুক্ত ছিলো। একটি বহুমাত্রিক মিশন হিসেবে স্বাভাবিক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কন্টিনজেন্টের সমন্বয়ে গঠিত হয়। নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি অন্যান্য কোম্পনীগুলি ছিলো– বাংলাদেশ প্রকৌশল কোম্পনী (Engineering Construction company); বাংলাদেশ মাইন অপসারণ কোম্পনী (BANDEMINING Company); বাংলাদেশ পরিবহণ কোম্পনী (Bangladesh Transport Company BANTPT); মেডিকেল কোম্পনী (Medical Company Level II Hospital) এবং পেট্রোলিয়াম প্লটুন (Petroleum Platoon, BANPET-PL)। এ সব কোম্পনীর উল্লেখযোগ্য যেসব দায়িত্ব পালন করে তার কয়েকটি হচ্ছে[১৫]- বাংলাদেশী প্রকৌশলী কোম্পনী সুদানের রাজধানী জুবা শহরে ৬ বর্গ কি.মিটার আয়তনে জাতিসংঘ হাউস তৈরি করে। যেখানে, মিশনের প্রধান কার্যালয়সহ জাতিসংঘের সকল সংস্থার অফিস ও কর্মকর্তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচন ও শান্তিমিশনের সাথে জড়িত সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্বও পালন করে।

বাংলাদেশ মাইন অপসারণ কোম্পনী (BANDEMINING) সুদানের চারটি বৃহৎ মাইন ফিল্ডের (Rajaf, Mafao, Khar Ramla, ও Jebel Khujur) মাইন অপসারণের কাজ করে। মাইন অপসারণের কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ ফোর্স কোমান্ডার সম্মাননা লাভ করে। বাংলাদেশী নারী মাইন অপসারণকারী ক্যাপ্টেন ফেরদৌসী জাতিসংঘ কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

বাংলাদেশ মাইন অপসারণ কোম্পনী ৪,৬১,০৮০ বর্গ কি. মি. এলাকা মাইন মুক্ত করে, মোট ৮৮,৮১৯টি মাইন এবং ২,৪৩,৯৭৫ কেজি বিস্ফোরক ধ্বংস করে।

বাংলাদেশী শান্তিরক্ষা মিশনের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী (BANTPT) মিশনের প্রধান কার্যালয় জুবা হতে অন্য পাঁচটি সেক্টরে রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করে। প্রায় ৯০০ থেকে ১৩০০ কিলো মিটার দূরুত্বে এসব মালামাল ও ভিআইপি'দের আসা নেয়ার দায়িত্ব পালন করে। যুদ্ধলিপ্ত দেশে জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করা অন্যতম

দায়িত্ব। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের পেট্রোলিয়াম প্লেটুন (Platoon BANPET-PL) ২০০৫ সাল থেকে সুদানের ৮টি স্থান হতে জ্বালানী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া, প্রচলিত সামরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের বাহিরে গিয়ে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জন করে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য ছিলো বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের মেডিকেল কোম্পনী। বাংলাদেশী মেডিকেল কোম্পনী লেবেল-২ মাপের একটি ফিল্ড হাসপাতাল পরিচালনা করে। মিশনের সদস্যদের চিকিৎসার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে চিকিৎসা প্রদান করে। বহিঃস্থ (আউট ডোর) বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ২৫জন এবং অন্তঃস্থ বিভাগে গড়ে প্রতিদিন ১০/১২ জন রোগী ভর্তি হয়। গড়ে মাসে স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন সার্জারি চিকিৎসা করা হয় ৪৫টি[১৬]।

নির্বাচনী কার্যক্রমের বাহিরে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষারা নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ সব কার্যক্রম বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের উপর সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জনে মূখ্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

টেবিল নং-৫.৫
ইউএনএমআইএস মিশনে অংশগ্রহণকারী শান্তিরক্ষীর ধরণ ও সংখ্যা

	শান্তিরক্ষীর ধরন	**সর্বোচ্চ সংখ্যক মোতায়েন (জানুয়ারি ২০১১)**	**মিশনে মৃত্যুবরণকারী শান্তিরক্ষী**	**শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র সংখ্যা**
পোশাকধারী সেনা শান্তিরক্ষী	সেনা	৯৩০৪জন (বাংলাদেশী ৯০২৩জন)	২৩ জন	৬২টি (অধিকাংশ দেশ পর্যবেক্ষক প্রেরণকারী)
	সেনা পর্যবেক্ষক	৫১৩ জন	৩ জন	
	পুলিশ	৭০২ জন	৩ জন	৪২ টি
বেসামরিক কর্মী	আন্তর্জাতিক কর্মী	৯৬৫ জন	৮ জন	
	স্থানীয় কর্মী	২৮৩৭ জন	২২ জন	
	জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবী	৪৭৭ জন	১ জন	

উৎস: https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/UNMIS, প্রবেশ ২০ জুলাই, ২০২০।

৫.৪ UNMIS মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ ও নির্বাচনী কার্যক্রম

UNMIS মিশনে পোশাকধারী শান্তিরক্ষী সেনা ও পুলিশ উভয় গ্রুপে প্রথম সারির শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ বাংলাদেশ। মিশনের প্রথম হতে শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশ এ মিশনে দায়িত্ব পালন করে আসছে।। ফলে, এ মিশনের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী তথা বাংলাদেশের ভূমিকা বিবেচনাযোগ্য এবং বিশ্লেষণ যুক্তিযুক্ত। উল্লেখ্য যে, এ রকম সমন্বিত বহুমাত্রিক মিশনে ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে কোন একক দেশকে কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয় না। প্রত্যেকটি দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় বিভিন্ন দেশের শান্তিরক্ষীদের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাটেলিয়নকে। ফলে, মিশনের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব যেমন এককভাবে অংশগ্রহণকারী দেশের তেমনি যৌথভাবে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশসমূহের। বাংলাদেশী সেনা কন্টিনজেন্ট দীর্ঘ ৬ বছর এ মিশনে ধারাবাহিক ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ম্যান্ডেট অনুসারে মাঠপর্যায়ে দ্বন্দ্বমান সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করার মাধ্যমে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক অংশীজনের আস্থা অর্জন করে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের এ ভূমিকা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আলোচিত হয়। দরকষাকষির মাধ্যমে সংঘাত নিরসন, রাজনৈতিক সমঝোতা, অধিকার সুরক্ষা, মানবিক সহযোগিতা ও পেশাদারিত্ব মনোভাবের কারণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের উপস্থিতি স্থানীয় জনগণ, সরকার, বিভিন্ন দল-গোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করেছে। সমাজে বিশ্বাস ও আস্থা জন্মানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন, পরিচালনা, স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও অধিকার সুরক্ষার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম সিপিএ বাস্তবায়নকে দৃশ্যমান করে। এ নিরিখে, সুদানের সংঘাতমূলক একটি পরিবেশে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা কিভাবে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট এবং আন্তর্জাতিক নিয়মের মধ্যে থেকে রাজনৈতিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত একটি সমাজে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যেমে দ্বন্দ্বের অবসান, রাষ্ট্রগঠন এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সুদান ও দক্ষিণ সুদানে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রেখেছে তা এ কেস স্টাডিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

বহুমাত্রিক শান্তি বিনির্মাণ মিশনে (peacebuilding mission) নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক সমাধান আয়োজনে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসৃত কৌশল ইউএনএমআইএস মিশন সুদানে সিপিএ বাস্তবায়নে অনুসরণ করে। অনুসৃত কৌশল দুটি[১৭] একই সাথে পরিচালনা করা হয় –

১. **নাগরিক অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষা এবং**

২. **নির্বাচন অনুষ্ঠান**

নির্বাচন পূর্ববর্তী কার্যক্রম (pre-election activities) নাগরিক অধিকারের প্রসার এবং সুরক্ষার মাধ্যমে নির্বাচনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, আস্থা অর্জন এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধপূর্ণ সকল গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে শান্তিরক্ষীরা কাজ করে। এ কৌশলটি বাস্তবায়ন দীর্ঘ মেয়াদি এবং চলমান। দ্বিতীয় কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নির্বাচন কেন্দ্রিক। এ কার্যটি নির্বাচনের মাঠে সবার অংশগ্রহণ, সম প্রতিযোগিতাপূর্ণ, ভয়ভীতি ব্যতিরেকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজন, নির্বাচনের ফলাফল সকল পক্ষ কর্তৃক মেনে নেয়া এবং নির্বাচন পরবর্তী আইন শৃঙ্খলা ও সহিংসতা প্রশমনের কার্যাবলীকে অর্ন্তভুক্ত করে। দ্বিতীয় কৌশলটি নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচন পরবর্তী কার্যক্রমকে (election day and post-election activities) নির্দেশ করে।

তত্ত্বগতভাবে এসআরএসজি'র নেতৃত্বে স্থানীয় Good Office ৬টি[১৮] উপ শাখার মাধ্যমে সমন্বিত শান্তি চুক্তি সিপিএ বাস্তবায়ন করে। এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা সাব সেকশনটি সরাসরি সেনা ও পুলিশী কাজের সহিত জড়িত থাকলেও অপর পাঁচটি সাব-সেকশনের কাজের নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বেসামরিক কর্মীদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের আয়োজন ও স্থায়ীত্ব নিশ্চিতকরণ সহ সর্বোপরি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পোশাকধারী শান্তিরক্ষীদের উপর বর্তায়। নিম্নে UNMIS মিশন সিপিএ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তি ও গণতন্ত্র অর্জনের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হলো -

৫.৪.১ নাগরিক অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষা

UNMIS মিশনে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মাঠপর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান করে। নির্বাচনী ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে নাগরিক অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় মিশনের ছয়টি সাব-সেকশনকে কারিগরি ও উপাদানগত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা প্রদান করে। দাপ্তরিকভাবে জাতিসংঘ কোন একক সেনা প্রেরণকারী দেশকে যেমন প্রমোট করে না তেমনি সাফল্য বা ব্যর্থতার দায়ভার এককভাবে কোন দেশকে প্রদান করে না। ফলে, মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণে মিশনের কার্যক্রমকে বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে ভূমিকা নিরূপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ক. রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন অভিমূখী করা

২০০৫ সালে সিপিএ স্বাক্ষরের পর হতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী (আফ্রিকান ইউনিয়ন, ইইউ, জাতিসংঘ) সিপিএকে প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক বৈধতা দেওয়ার জন্য আলোচনায় বিবাদমান দুটি পক্ষকেই নির্বাচনমূখী করার জন্য কমবেশি চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু, উত্তরে এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রভাবশালী দল হিসেবে এনসিপি এবং দক্ষিণে প্রভাবশালী দল হিসেবে এসপিএলএম কেউই এই নির্বাচনগুলিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়নি। এরকম পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষীগণ উভয় রাজনৈতিক দলকে সহিংসতার পরিবর্তে নির্বাচনভিত্তিক রাজনৈতিক সমঝোতা নিয়ে আসার জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করে। দক্ষিণের সশস্ত্র মিলিশিয়া এবং দুর্গম এলাকার উপজাতি গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা এবং যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করে। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মতামতকে আলোচনায় নিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করে। এসব প্রান্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশী ব্যাটালিয়ন সদস্যদের আন্তরিকতা এবং দুর্গম অঞ্চলে শান্তি আলোচনার সাহসিকতা মিশনের লক্ষ অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে বাংলাদেশী পুলিশ শান্তিরক্ষীদের নিরস্ত্র অংশগ্রহণ এবং মিলিশিয়াদের সাথে সহিংসতার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পরামর্শ এবং নির্বাচন পরবর্তী সাধারণ জীবনে ফিরে নিয়ে আসার নিশ্চয়তা তৃণমূলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশে পাবর্ত্য চট্রগ্রামে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে বলে অনেকে মনে করেন[১৯]।

মিশন শুরুর প্রায় দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। নির্বাচনের প্রাতিষ্ঠানিক এবং মাঠ পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে সুদানের জাতীয় নির্বাচনী অংশীজনদের মধ্যে অসচ্ছতা এবং অনাগ্রহতা দেখা যায়, যা আন্তর্জাতিক মহলে সাধারণত হতাশা দেখা দেয়।[২০] অপর দিকে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু না করার কারণে মিশনের গাফিলতি ও দীর্ঘ সূত্রিতাকে দায়ী করে। এরকম পরিস্থিতিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন মিশন শুরুর প্রায় তিন বছরের অধিক সময়ের পর এপ্রিল ২০০৯ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী সহায়তার জন্য একটি অনুরোধ ইউএনডিপিতে পাঠায়। আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায় আনুষ্ঠানিক এ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সুদানের জটিল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে জাতীয় ও গণভোট আয়োজনের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের জন্য এক বছর সময় পায়। এক বছরের মধ্যে এ জটিল কার্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছিলো শান্তিরক্ষীদের অবদানের কারণে। কারণ, সুদানে স্থায়ীভাবে দীর্ঘ তিন বছর থেকে শান্তিরক্ষার কাজে উপস্থিত

থাকার সাথে ইউএনএমআইএস সরকার থেকে নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই নিজস্ব প্রস্তুতি শুরু করে। এক্ষেত্রে মিশনের সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী হিসেবে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কৌশল ছিলো প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে এবং দক্ষিণ সুদানের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোকে নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনে রাজনৈতিক সমাধানে সচেতন করে তোলে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অভিজ্ঞতা এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। শান্তিরক্ষীদের মাঠ পর্যায়ের এ তৎপরতার উপর ভিত্তি করে দাতা সম্প্রদায়ও কোন আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাওয়ার আগেই এর পরিকল্পনা প্রস্তুতি শুরু করেছিল। ঐ সময়ে, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের শুধু সদস্যগণ (নির্বাচন কমিশনার) ছাড়া বাস্তবে অন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে নির্বাচনী কাঠামো তৈরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা জোরদার করতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীগণ প্রশাসনিক ও আইনানুগ পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে এনইসি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণে সচেষ্ট হয় । পরবর্তীতে এ কাঠামোর আলোকে নির্বাচনমুখী কার্যক্রম জোরদার করে।

খ. জাতীয় নির্বাচন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ

নিরাপত্তা পরিষদভিত্তিক শান্তিরক্ষামূলক অভিযান পরিচালিত দেশগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে সমর্থন দেওয়ার জন্য সাধারণত শান্তিমিশন এবং ইউএনডিপি-র মধ্যে একটি যৌথ দায়িত্ব থাকে। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী ব্যাটলিয়ন দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর ইউএনডিপির চেয়ে সুদানে ইউএনএমআইএস এর ভূমিকা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ইউএনডিপির সদস্যদের মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরুর আগেই শান্তিমিশন কাজ শুরু করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা আস্থা অর্জন করে। সুদানে নির্বাচন পরিচালনার কোন প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে নিরাপত্তা পরিষদ একটি নতুন প্রস্তাব ১৮৭০ (২০০৯) এর মাধ্যমে ইউএনএমআইএসকে বিশ্বাসযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন (National Election Commission, NEC) কে সমর্থন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির দায়িত্ব প্রদান করে। ইউএনএমআইএস ইউএনডিপির সাথে নিবিড় সহযোগিতায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন গঠন এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের চেষ্টা করে। যাতে সুদানের বিবাদমান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে সুদান সরকার এবং দক্ষিণ সুদানের 'সুদান পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট/আর্মি (এসপিএলএম/এ)' – কে সিপিএ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আস্থা রাখে। এনইসির অনুরোধ অনুসারে নির্বাচনী পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাসহ প্রযুক্তিগত এবং

উপাদানগত সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউএনএমআইএস আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানায়। মাঠ পর্যায়ে এনইসি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৮ সালের নভেম্বরে নিয়োগ পায় এবং ২০০৯ সালের জানুয়ারিতেই কাজ শুরু করে। এনইসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা, যোগাযোগ এবং নাগরিক সম্পৃক্ততার কাজের নিরাপত্তা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ও প্রচারের কাজে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সরাসরি সহযোগিতা করে।

মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কার্য পরিচালনায় শান্তিরক্ষীরা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অদক্ষতা এবং অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য ইউএনএমআইএস এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জাতিসংঘ সুদানে নির্বাচন সহায়তা বিভাগ (ইএডি) (Electoral Assistance Division, EAD) প্রতিষ্ঠা করে। ইএডি-এর মূল কাজটি ছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পরিচালনায় কারিগরি ও উপাদানগত পরামর্শ ও সহায়তা করা। EAD এর কার্যাবলী দুটি ভাগে বিভক্ত[২১]- এক নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম, এবং দুই – বাহ্যিক আন্ত:প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম।
নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে -

- "জাতীয় নির্বাচন কমিশন (এনইসি) এর সাথে সমন্বয় করে জাতীয় ঐক্য সরকার এবং দক্ষিণ সুদান সরকার, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এবং জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহের মাধ্যমে নির্বাচনী আদেশ কার্যকর করা;
- সিপিএ বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ করা;
- রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা নির্বাচনী বিধান প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো বিনির্মাণ, নির্বাচনী বিধিমালা প্রণয়ন, নির্বাচনী আসনের সীমানা নির্ধারণ,
- ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচনী উপকরণ সরবরাহ ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, এবং জাতীয় নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- দারফুরে জাতিসংঘ-আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশনের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে ইউএনএমআইএস কর্তৃক নির্বাচনী পরিচালনা প্রক্রিয়ায় দারফুরের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং নির্বাচনী বিষয়ে মিশন সিনিয়র ম্যানেজমেন্টকে পরামর্শ প্রদান ;

- ইউএন উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), জাতিসংঘের এজেন্সি এবং বিভিন্ন সাব সেক্টর ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও প্রযুক্তিগত কারিগরি সহায়তা প্রদান।

UNMIS কর্তৃক বাহ্যিক সম্পৃক্তকরণ কার্যের মধ্যে উল্লেখ্য হলো - রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, নাগরিক এবং ভোটার শিক্ষা, জনসাধারণকে অবাধ তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বন্ধু রাষ্ট্র হতে নির্বাচনী অর্থ যোগানে সহায়তা করা, দাতা, এনজিও এবং কমিউনিটি সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকসহ সকল নির্বাচনী অংশীজনদের কাজে সহযোগিতা, নিরাপত্তা এবং সম্ভাব্য সহিংসতার আগাম তথ্য নিশ্চিতকরণ।

গ. রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি

দ্বন্দ্বমূলক একটি সমাজে নির্বাচন পূর্ববর্তী রাজনীতি র্চচা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে UNMIS মিশনের কার্যক্রমের ফলে দেশের ভেতর বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি শান্তিকালীন মানসিকতা উদয় হয় এবং সংঘাতের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ২০১০ সালে নির্বাচন কমিশন (NEC) কর্তৃক নির্বাচনী উদ্যোগ গ্রহণের পর হতে দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। CPA ম্যান্ডেট দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আইন, ২০০৮ এবং অর্ন্তবর্তীকালীন সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠ ও সংঘাতহীন পরিবেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করবে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সভা সমাবেশ র‍্যালিসহ রাজনৈতিক কর্মসূচীতে জানমালের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং কর্মসূচী দ্বারা কোনভাবে যেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করবে। রাজনৈতিক দলগুলো পুলিশকে পূর্বে অবহিত না করে কোন কর্মসূচী প্রদান করবে না। তদপুরি, নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা, নির্বাচনী প্রচারণা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণে নিবার্হী বিভাগ যেন উদারতা এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোন বাঁধা আরোপ না করে সে জন্য সুদান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং দক্ষিন সুদান সরকারের রাষ্ট্রপতিকে আহ্বান জানায়। একই সময়ে, নির্বাচন কমিশন বিচার মন্ত্রণালয়কে পূর্ণকালীন প্রসিকিউটর নিয়োগের আহ্বান জানায়, যাতে আচরণ বিধি লঙ্ঘন ও নিবার্হী বিভাগের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও অনিয়মে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

কার্যত সুদানের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিচার এবং নির্বাহী বিভাগ কমিশনের উপর ন্যস্ত হয়েছিলো– এক্ষেত্রে কারিগরি ও কৌশলগত সহযোগিতা UNMIS ও UNDP মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু নির্বাচনের মালিকানা ও পরিচালনা বিষয়াদি সরাসরি দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (নির্বাচন কমিশন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ) সম্পাদন করে। কার্যত এর মধ্যে দিয়ে সুদানের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের দ্বার উম্মুক্ত হয়।

ঘ. আইনী কাঠামো বিনির্মাণ

সুদানের ২০১০ সালের জাতীয় নির্বাচন ও ২০১১ সালের গণভোটের আইনানুগ ভিত্তি ছিলো ২০০৫ সালের সমন্বিত শান্তি চুক্তি। এ চুক্তির আলোকে বেশ কিছু আইনানুগ বিধিমালা জারি করা হয়। UNMIS খসড়া সংবিধান, আইন ও বিধিমালা প্রণয়নে কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করে। Interim Constitution of the Republic of the Sudan (2005), Political Parties Affairs Council Act (2007) এবং National Election Act-2008 অনুসারে উল্লেখযোগ্য প্রবিধানগুলো ছিলো ঃ

- জাতীয় নির্বাচন আইন ২০০৮ অনুসারে সকল নাগরিক ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত হওয়া নাগরিক অধিকার। ভোটার ব্যতীত কেউ ভোট দিতে পারবে না।
- CPA এবং অন্তবর্তীকালীন সংবিধান অনুসারে গোপন ভোটদানের মাধ্যমে ভোটারের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার (freedom of expression) নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়;
- Political Parties Affairs Council Act অনুসারে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়;
- National Election Act-2008 অনুসারে National Elections Commission গঠন ও ক্ষমতা অর্পন করা হয়;
- জাতীয় ও গণভোট পরিচালনার নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন;
- নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিষদে ১৫ শতাংশ আসন নারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

ঘ. প্রশিক্ষণ

বহুদলের অংশগ্রহণে সুদানে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নির্বাচন না হওয়ার কারণে ভোট কিভাবে প্রদান করতে হয় তা ভোটারদেরকে জানানো ছিলো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সুদানের জন্য ভোটটি ছিলো অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি বিশ্ববাসী অংশীজনের জন্যও ছিলো জটিল। সুদানের নির্বাচনী ব্যবস্থায় একজন ভোটারকে ১২টি ব্যালটে এবং উত্তর সুদানের একজন ভোটারকে ৮টি ব্যালটে ভোট প্রদান করতে হয়, একই সাথে সুদান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও দক্ষিণ সুদান সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় আইন পরিষদের ও দক্ষিণ সুদান জাতীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতে হয়। সাংবিধানিক এ নির্বাচনী ব্যবস্থার সাথে আরো যুক্ত ছিলো সুদানের উত্তর ও দক্ষিণের বিভক্তির প্রশ্নে গণভোটে ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতা করার বিষয়টি। নির্বাচনী এ প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে একজন শিক্ষিত ভোটারের জন্য যেমন ছিলো কঠিন তেমনি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সত্ত্বার বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণের কাছে বিষয়টি ছিলো আরো দূরহ । নির্বাচন কমিশন UNIRED, কার্টার সেন্টারসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতা এবং দেশীয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে। যদিও ট্রেনিং UNDP বা দাতা সংস্থার বিশেজ্ঞগণ যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এ ট্রেনিং এর আয়োজন, স্থান নির্ধারণ, প্রশিক্ষনার্থী সিলেকশন, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষকদের বহন এবং নিরাপত্তা বিধানের কাজটি করে UNMIS এর বাংলাদেশ ব্যাটেলিয়ন-৫ এর উপর বর্তায়। এক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বহনে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি ইউনিট কাজ করে। নির্বাচন কমিশন UNMIS এবং দাতা সংস্থাগুলো সহযোগিতায় ১,০০,০০০ (লক্ষ) ভোটার রেজিষ্ট্রার অফিসারকে ট্রেনিং প্রদান করে।

UNMIS রাজনৈতিক দলের প্রার্থী, কর্মী, এজেন্টদেরকে ভোটার রেজিষ্ট্রেশন আচরণবিধি ও পোলিং সংক্রান্ত বিষয়ে দেশজুড়ে কর্মশালার আয়োজন করে। এসব কর্মশালায় PPAC, কার্টার সেন্টার ও বিভিন্ন এনজিও বিশেষজ্ঞরা ট্রেনিং প্রদান করেন। একটি সংঘাতপূর্ণ সমাজে সংঘাত ও সহিংসতার মধ্যে কিভাবে নির্বাচনী খবর প্রচার করতে হবে, কীভাবে মিডিয়া ভোটরাদের নির্বাচনী শিক্ষা প্রদানে কাজ করতে পারে এসব বিষয়ে ১২০০ (হাজার) সাংবাদিককে ৩৫টি কোর্সে ট্রেনিং প্রদান করা হয়[২২]।

ঙ. সুদানের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

অন্তবর্তীকালীন সংবিধান অনুসারে সুদানের নির্বাচনী ব্যবস্থা অনেক জটিল। দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধের পর সমন্বিত শান্তি চুক্তি অনুসারে ২০১০ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন (Executive Election) এবং জাতীয় পরিষদ নির্বাচন (Legislative Election) একইসাথে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ ২০১১ সালের জানুয়ারিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় নির্বাচনে নির্বাহীগণ (প্রজাতন্ত্রী সুদানের প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ সুদান সরকারের প্রেসিডেন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (absolute majority) নীতিতে নির্বাচিত হন। নির্বাচনী আইন ২০০৮ অনুযায়ী একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জয়ী হতে হলে বৈধ ভোটের ৫০% শতাংশসহ একটি ভোট বেশি পেতে হবে। যদি কোন প্রার্থী ৫০% ভোট না পান, তাহলে নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত দু'প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ড ভোটের আয়োজন করবে এবং যে প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবে সেই প্রার্থী জয়ী বলে ঘোষিত হবে। আবার গর্ভনর নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (simple majority formula) নীতি অনুসৃত হয়, যে প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন।

অপরদিকে, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (simple majority) এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (proportional representation) নীতি অনুসৃত হয়। ভৌগলিকভাবে আসনগুলো (geographical constituencies) সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার নীতিতে এবং নারী ও পার্টি তালিকার প্রার্থীগণ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিতে নির্বাচিত হন। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সুদান গঠিত। জাতীয় পরিষদ এবং দক্ষিণ সুদানের আইন সভার ৬০% প্রতিনিধি ভৌগলিক আসন থেকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিতে এবং নারী ও দলীয় তালিকা হতে যথাক্রমে ২৫% ও ১৫% সদস্য আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হন।

দীর্ঘ দিন নির্বাচন না হওয়া, অভ্যন্তরীণ সহিংসতা এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্ধ ও নিরক্ষরতার কারণে এ জটিল নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে সুদানের সাধারণ জনগণ ছিলো অনভিজ্ঞ। সুদানের এই জটিল ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে দেশের সকল নাগরিক, রাজনৈতিক দল-প্রার্থীদের বুঝানো ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘ সুদানের জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। ভোটারদের নির্বাচনী সচেতনতা শিক্ষার জন্য UNDP'র পাশাপাশি নরওয়েজিয়ান সরকারও আর্থিক সাহায্য প্রদান করে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি দেশিয় বিভিন্ন সংগঠন সচেতনতামূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করে।

টেবিল-৫.৬

সুদানের কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি

ক্র. নং	নির্বাচন	সংখ্যাগরিষ্ঠতা		আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব
		নিরংকুশ	সাধারণ	
১	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি (President of the Republic)	*		
২	দক্ষিন সুদান সরকারের রাষ্ট্রপতি (Presedent of the Government of South Sudan)	*		
৩	গর্ভনর (Governar)		*	
৪	জাতীয় আইন পরিষদ (National Assembly)			
	ক. ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক আসন (Geographical Constituency)		*	
	খ. দলীয় তালিকা (Party list)			*
	গ. নারী আসন (Women list)			*
৫	**দক্ষিণ সুদান সরকারের আইন পরিষদ (Southern Sudan Legislative Assembly)**			
	ক. ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক আসন (Geographical Constituency)		*	
	খ. দলীয় তালিকা (Party list)			*
	গ. নারী আসন (Women list)			*
৬	**প্রাদেশিক আইন পরিষদ সমূহ (State Legislative Assemblies)**			
	ক. ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক আসন (Geographical Constituency)		*	
	খ. দলীয় তালিকা (Party list)			*
	গ. নারী আসন (Women list)			*

উৎস: National Election Commission Republic of Sudan, at www.nec.org.sd, প্রবেশ ১৯ জুলাই ২০২০।

চ. ভোটার শিক্ষা

শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল ভোটারদের ভোটদানপদ্ধতি, ভোটদানে করণীয় আচরণবিধি এবং নির্বাচনী সহিংসতা থেকে রক্ষার জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক শিক্ষণীয় কর্মসূচী গৃহীত হয়। UNDP, IOM, UNIFER, UNWOMEN এর কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় ২৫টি নাগরিক সংগঠন দেশব্যাপী এ কাজ শুরু করে। এসব সংগঠন UNIFEM এর সহায়তায় নারীদেরকে তাদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। NEC জাতীয় ও আঞ্চলিক টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম,

FM ও কমিউনিটি রেডিও টকশো, সাক্ষাৎকার, বিজ্ঞান, গান, নাটক ও স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমার মাধ্যমে নাগরিক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করে। UNMIS'র স্বেচ্ছাসেবকরা কমিউনিটি পর্যায়ে বিশেষ করে নারী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাগরিক গোষ্ঠীকে নির্বাচনী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এসকল সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা, যোগাযোগ, মুভমেন্ট, বিভিন্ন স্থানে কর্মশালা, বৈঠক ও সভা-সমাবেশের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল রাখা এবং কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব স্থানীয় পুলিশ পালন করে। কিন্তু আর্ন্তজাতিক কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা এবং স্থানীয় পুলিশকে সহায়তার জন্য বাংলাদেশী কন্টিনজেন্ট কাজ করে।

ছ. নাগরিক ও নির্বাচনী নিরাপত্তা

জনসাধারণের নাগরিক নিরাপত্তা বিশেষ করে শারীরিক নিরাপত্তা বিধান করা শান্তি মিশনের অন্যতম প্রধান ম্যান্ডেট। বিশেষ করে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (internally displaced persons, IDPS) শরণার্থী, নারী ও শিশুদের জন্য এ সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। UNMIS এর – অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিলো সুদান সরকারের কোন পূর্বশর্ত বা প্রিজুডিস (prejudice) ছাড়াই আসন্ন শারীরিক নির্যাতনের হুমকি হতে নাগরিকদের রক্ষা করা। নাগরিক সুরক্ষা বিধানের জন্য UNMIS নাগরিকদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও সহিংসতা হতে রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুদানের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা, আবে (Abyei) প্রদেশের কমিউনিটি পর্যায়ের দ্বন্দ্ব কিংবা দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়ী অঞ্চলের উপজাতীর কোন্দল এবং Lord's Resistance Army বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সম্ভাব্য আক্রমণ হতে নাগরিকদের রক্ষার জন্য UNMIS শান্তিরক্ষীরা কাজ করে।

UNMIS শান্তিরক্ষীরা সহিংসতার ধরন বিশ্লেষণ করে দ্রুত তা সমাধানে সচেতনতা সৃষ্টি এবং কার্যকর প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেমন- সুদানের বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক নাগরিক হয়রানি, শিশু সৈন্য নিয়োগ, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, জোরপূবর্ক বাস্তুচ্যুত করা, বিচার পাওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চনা, দক্ষিণাঞ্চলীয় করদুফান এবং বাহার আল-গাজল প্রদেশের যাযাবর শরনার্থীদের চলাচলের রাস্তায় সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা হতে নাগরিকদের সুরক্ষায় UNMIS সদস্যগণ কাজ করে।

UNMIS প্রয়োজনীয় তথ্য ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে নাগরিক সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন আংশীজনকে সহাযতা করে। যেমন – UNMIS কর্মী, UN কর্মী এবং সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের সহিংসতা ও দ্বন্দ্বের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা এবং তাদের প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো যাযাবর ও কৃষকদের মধ্যে পানি নিয়ে দ্বন্দ্ব; ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারিক কাঠামো গঠনে সহায়তা; পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনীর কমান্ড ও কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক ও সামরিক আলোচনা[২৩]।

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১২ (২০০৫) রেজোলিউশন অনুসারে শিশুদের সুরক্ষায় UNMIS পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শিশুদের সৈনিক হিসেবে নিয়োগ এবং সশস্ত্রযুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব হতে রক্ষার জন্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান করে।

UNMIS ২০০৫ হতে সামাজিক, গোষ্ঠীগত ও জাতিগত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা বন্ধের চন্য সুদানের উভয় অংশে কাজ শুরু করে। দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর শান্তিমিশন পরিচালনার মাধ্যমে শান্তিসহায়ক স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয় এবং ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে নির্বাচনী তফসীল ঘোষণা করা হয়। UNMIS নির্বাচনী সহিংসতা রক্ষায় দেশীয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কারিগরি ও কৌশলগত এবং আপদকালীন সহযোগিতা প্রদান করে। যেহেতু জাতিসংঘের নীতিগত অবস্থান হলো – শান্তিরক্ষাসহ নির্বাচনী কার্যক্রমে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রমের মালিকানা আমন্ত্রণদাতা রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদান করা।

নির্বাচনী আইন, ২০০৮ এবং অন্তবর্তীকালীন সংবিধান অনুসারে নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর হতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিধানের জন্য বলা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পুলিশের মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে Elections Security High Committee গঠন করা হয়। এ কমিটি প্রধান হন অপরাধ তদন্ত বিভাগের পরিচালক এবং পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনী ও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিগণ হন সদস্য। উক্ত উচ্চতর কমিটি উত্তর ও দক্ষিণে নিরাপত্তার জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু দক্ষিণ সুদান সরকার উচ্চতর এ কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী

উদ্যোগ গ্রহণ করতে ভিন্নমত পোষণ করে। কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ সুদানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উচ্চতর কর্মকর্তাগণ দক্ষিণ সুদান পরিদর্শন করেন এবং দক্ষিণ সুদান সরকারকে যানবাহনসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রদানে আশ্বস্ত করেন। একইসাথে দক্ষিণ সুদানের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সুদান সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে নির্বাচনী আইন-শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা বিধানের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। কিন্তু, ''স্ট্রাইকিং ফোর্স''[3] হিসেবে UNMIS শান্তিরক্ষীরা দায়িত্বপালন করেন। প্রতিটি "টহল দায়িত্বে"[4] (প্যাটল ডিউটিতে/Patrol Duty) সুদানী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে শান্তিরক্ষীবাহিনী তাদের নিয়মিত টহল অব্যাহত রাখে। এ পন্থার মাধ্যমে কার্যত আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব সুদানী বাহিনীকে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের বিধান অনুসারে শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ শান্তিরক্ষীগণ কোন অস্ত্রবহন করেন না। তেমনি সেনা শান্তিরক্ষীরা নিজেরা আক্রান্ত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি বিরোধী গ্রুপে অস্ত্রের ট্রিগর টিপন/চার্জ না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সেনা শান্তিরক্ষীদের নিজের অস্ত্র ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। নির্বাচনী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সুদানী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ট্রেনিং, কারিগরি ও কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান এবং মাঠ পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা কাজে UNMIS সদস্যগণ কাজ করে।

ঝ. নির্বাচনী বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ

জাতীয় নির্বাচন কমিশন ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে নির্বাচনী বাজেট সংস্থানের জন্য ইউএনডিপি'কে অনুরোধ করে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সমর্থনে দাতা সহায়তার সমন্বয় করা UNMIS ম্যান্ডেটভুক্ত। এ প্রেক্ষিতে,

[3] নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর (পুলিশ, আনসার) বাহিরে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা গঠিত বিশেষ ইউনিট স্টাইকিং ফোর্স নামে পরিচিত। এ ধরনের ফোর্সের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্বাচনী আইন/তফশিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ ফোর্সের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নিয়মিত বাহিনীকে সহযোগিতা করা। সাধারণত, যেমন আমাদের বাংলাদেশে নির্বাচন কালীন সময়ে স্ট্রাইকিং ফোর্স কোন ঘটনা ঘটার পর সেখানে যায় এবং নিয়মিত বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে এবং একজন ম্যাজেস্ট্রিট এর নেতৃত্বে কাজ করে। কিন্তু, শান্তি মিশনে যখন নির্বাচনী ম্যান্ডেট অন্তর্ভুক্ত থাকে তখন নির্বাচন কালীন সেনা শান্তিরক্ষীদের স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়মিত আইনশৃঙ্খরা বাহিনীকে প্রচলিত সহযোগিতার বাহিরে বর্ধিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সুরক্ষা, ভয় ভীতিহীন পরিবেশে ভোটারদের চলাচল, নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনপূর্ব ও পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা এবং নতুন সরকারে ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত এ দায়িত্ব বিস্তৃত। দ্বন্ধ গ্রস্ত দেশে যেহেতু দেশিয় নিয়মিত বাহিনীর সক্ষমতার ঘাটতি থাকে, সেহেতু শান্তি মিশনের সেনা স্ট্রাইকিং ফোর্স এ গ্যাপ পূরনে চেস্টা করে। কার্যত, মিশনের ম্যান্ডেট অনুসারে শান্তিরক্ষীগণ দায়িত্ব পালন করেন এবং ক্ষমতা ভোগ করেন।

[4] টহল দায়িত্ব হচ্ছে নিয়মিতভাবে একটি এলাকা, কোন একক আইন শৃঙ্খলা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাক্তি বা একটি দল যারা পাহারা দেয়। একটি টহলের উদাহরণ হল একটি নির্দিষ্ট এলাকা দেখার জন্য নিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের একটি দল। নির্বাচন কালীন সময়ে নিয়মিত দেশিয় আইন শৃঙ্খরা বাহিনীর সাথে শান্তিরক্ষী বাহিনী টহল দায়িত্ব পালন করে, এখানে নিয়মিত বাহিনীকে সাহায্য করা মূখ্য ইদ্দেশ্য। কাউকে গ্রেফতার বা মামলা করতে হলে শান্তিরক্ষী বাহিনী নয়, দেশিয় নিয়মিত বাহিনী এ কাজটি অফিসিয়ালী করে থাকে, শান্তিরক্ষী বাহিনী সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ইউএনডিপি ৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সংগ্রহ করে, যেখানে ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্বাচনী সহায়তা প্রদান করে UNMIS এর ইএডি শাখা। কিন্তু এ তহবিলটি নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত ছিলো না। নির্বাচনের জন্য মোট এনইসি বাজেটের পরিমাণ ছিল ৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নরওয়ে ইউএনডিপির আবেদনে অতিরিক্ত অর্থের যোগান হিসেবে ৫৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সহায়তা প্রদান করে[২৪]।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন (NEC) নির্বাচনের আর্থিক সহায়তার জন্য CPA র সহযোগী রাষ্ট্র ও জাতিসংঘকে অনুরোধ করে। UNMIS এ আহ্বানে স্বপ্রণোদিত হয়ে সাড়া প্রদান করে। একই সাথে পূর্ববর্তী নির্বাচনী আইন ২০০৮ প্রণয়ন এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে প্রদত্ত কারিগরি সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। UNMIS জাতিসংঘ ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় ৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল সংগ্রহ করে। নির্বাচনে UN ও দাতা সংস্থাগুলো ৪৩% এবং নির্বাচন কমিশন ৫৭% বাজেট ব্যয় নির্বাহ করে[২৫]।

UNMIS-জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সাথে বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি যৌথ কৌশল গ্রহণ করে। প্রথমত – জাতিসংঘ, দাতা সংস্থা ও CPA র সহযোগী রাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত অর্থ নির্বাচনী উপকরণ ক্রয়, যানবাহন, কমিশনের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অফিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ফার্নিচার ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, ট্রেনিং, নির্বাচনী ব্যালটসহ বিভিন্ন উপকরণ প্রণয়ন, প্রকাশনা ও পরিবহনে (আকাশ, স্থল ও নৌ) কাজে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়ত – জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (NEC) অর্থ শুধু নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের বেতন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। UNMIS এক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ লেনদেনে জড়িত হয়নি, বরং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে সুদানের অর্থ মন্ত্রণালয় ও আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালায়কে বাজেট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া সকল ব্যয় Financial and Accounting Procedures Act, 2007 অনুযায়ী জাতীয় অভ্যন্তরীণ অডিটিং এবং সাধারণ অডিটিং এর আওতায় পরীক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বাজেট ব্যবস্থাপনায় UNMIS এর উদ্যোগে একটি 'নীতি কমিটি' (policy committee) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কমিটির সভাপতি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান, জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি (SGSR) এবং CPA সহযোগী রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রদূতগণ সদস্য। এছাড়া, UNMIS ও NEC'র সমন্বয়ে

একটি যৌথ কমিটি করা হয়। দাতা সংস্থা ও UN সহযোগী রাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত বাস্কেট ফান্ড (basket fund) পরিচালনার জন্য যৌথ একাউন্ট খোলা হয়। নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে ট্রেনিং, যানবাহন ও উপকরণ ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং আর্থিক বিষয়াদি বিবেচনা করার জন্য NEC, UN ও দাতা সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি 'বিশেষজ্ঞ কারিগরি কমিটি' গঠন করা হয়। প্রথম রাউন্ড (এপ্রিল ২০১০) নির্বাচনে স্থগিত ৩৩টি আসনের মধ্যে ২৯টি আসনের উপনির্বাচনের (জুন, ২০১০ অনুষ্ঠিত হয়) জন্য ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পুরক বাজেট গ্রহণ করা হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন কৌশল ও কমিটি গঠনের মাধ্যমে UNMIS মূলত সুদানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নির্বাচন পরিচালনায় মালিকানা কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট অর্পন করে।

৫.৪.২ নির্বাচন অনুষ্ঠান

ক. নির্বাচনী আসনের সীমানা নির্ধারনী কার্যক্রম

সুদান ২৬টি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত । দক্ষিণের ১০টি প্রদেশ নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে। আবার মধ্যখানে কয়েকটি প্রদেশ (South Kordofan, Sinnar, White Nile) গুলো দ্বিধা বিভক্ত কোন অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকবে – সুদান না দক্ষিণ সুদান। আবার প্রত্যন্ত অঞ্চল দারফুর ও আবেয় নিজেরাই পৃথক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনরত। ফলে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আসন বিন্যাস ও সীমানা নির্ধারণ করা ছিলো NEC'র জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জিং কাজ। জাতিসংঘ তার নীতি অনুসারে সব সময় নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় মালিকানা জাতীয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করে থাকে এবং কৌশলগত ও কারিগরি উপাদান দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে। এক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হয়। দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতিটি গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব যাতে নিশ্চিত হয় এজন্য নির্বাচন আইন ২০০৮ ও ২০০৯ সালের আদমশুমারি অনুসারে বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় আসন নির্ধারণ করা হয়। এসকল আসন নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনসহ বিভিন্ন সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগিদের প্রতিনিধিদের স্বশরীরে উপস্থিত থেকে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। সীমানা নির্ধারণে বিভিন্ন গ্রুপগুলোর মধ্যে আস্থা স্থাপন, ঘরোয়া সমাবেশ ও বৈঠকের পরিবেশ সৃষ্টিতে UNMIS কাজ করে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, নির্বাচন কমিশনের স্টাফ ও রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া,আসা ও তাদের নিরাপত্তার কাজটি UNMIS পালন করে।

সীমানা নির্ধারণের জন্য কমিশনের তত্ত্বাবধানে State High Committee সীমানার রেখা চিত্র অঙ্কন করে। আসনগুলোর মধ্যে লোক সংখ্যা ১৫% এর নিচে ব্যবধান বাড়ার নীতি অনুসৃত হয়। State High Committee কর্তৃক সীমানা নির্ধারণ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন তা পরিদর্শন এবং তা প্রকাশ করে। বিভিন্ন প্রদেশ হতে ৮৮১টি আপত্তি পাওয় যায় তার মধ্যে ৫০৪টি গ্রহণ এবং ৩৭৭টি বাতিল করা হয়। চুড়ান্ত ভাবে ৫৮টি আপীল কোর্ট করা হয় এর মধ্যে ৩টি গৃহীত হয় এবং ৫৫টি বাতিল হয়[২৬]। সুদানের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ভৌগোলিক আসন বিন্যাস অনুসারে জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ এবং দক্ষিণ সুদান পরিষদে ৬০% প্রতিনিধি নির্বাচিত হন বাকি ১৫% দলীয় লিস্ট হতে ও ২৫% নারী কোটা হতে নির্বাচিত হন। সীমানা নির্ধারনী রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্বাচনী আইনের ৩৩ (১) ও (২) ধারা অনুসারে legislative assembly মোট আসনের ১৫% দলীয় লিস্ট হতে এবং ২৫% নারী প্রার্থীর জন্য নির্ধারণ করা হয়।

সুদানের দীর্ঘ এক দশকের অভ্যন্তরীণ সহিংসতায় একটি জাতীয় নির্বাচনের জন্য আসন বিন্যাস ও সীমানা নির্ধারণের কাজটি এক বছরে সম্পন্ন হয়। এ কাজটি সহজ হয় UNMIS-এর কারণে। নীতিগতভাবে UNMIS সরাসরি একাজের সাথে জড়িত হয় না, কিন্তু জাতীয় নির্বাচনী কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের যেমন সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, তেমনি বিবাদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে সহিংসতা ও রাজনৈতিক সমাধানের পথ উন্মুক্ত করেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাটলিয়ন-৫ দক্ষিণ সুদানের প্রত্যন্ত তিনটি (৩টি) প্রদেশে (Equatorial States : Western Equatoria, Lakes ও Warrap) অঞ্চলের দুর্গম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর সাথে সীমানা নির্ধারণী কাজে কর্তৃপক্ষকে সরাসরি সহযোগিতা করে। বিশেষ করে জাতিসংঘসহ জাতীয় পর্যায়ের দেশি বিদেশী সকল কর্মকর্তাদের চলাচল ও যোগাযোগ রক্ষায় বাংলাদেশী প্রকৌশলী কোম্পনীর সদস্যগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এ সব প্রদেশে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের প্রকৌশলী কোম্পানী ১৯টি Referendam Support Bases স্থাপন করে। Good Office এর তত্ত্বাবধানে এ সকল বেইস ক্যাম্প থেকে United Nation Integrated Referendam and Election Division (UNIRED) কর্তৃক সকল পোলিং সেন্টারে নির্বাচনী সহযোগিতা, সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া পরিচালনায়

স্থানীয় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। নির্বাচন কালীন জাতিসংঘের সকল সংস্থা স্থানীয় এ বেইস থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে[২৭]।

খ. ভোটার তালিকা তৈরি

নির্বাচন আইন, ২০০৮ এবং অন্তবর্তীকালীন সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটার লিস্টে নাম অন্তর্ভুক্তি করা নাগরিক অধিকার। বিগত ২৫ বছর ধরে ভোটার তালিকা হালনাগাদ না করার কারণে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন ছিলো এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটার রেজিস্ট্রেশন কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের (UNIRED, International Foundation for Electoral System এবং নরওয়েজিন এইড) সহায়তায় রাজনৈতিক দল, জনগণকে ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তভুর্ক্তির জন্য সচেতন করে। শান্তিমিশনের সদস্যগণ দারফুরের IDP ক্যাম্পসহ সারা দেশে ভোটার রেজিস্ট্রার অফিসারদের চলাচল , উপকরণসমূহ প্রেরণ এবং ভোটার তালিকার কেন্দ্রীয় ডাটা বেইস স্যাটেলাইট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে। ১ হতে ৩০ নভেম্বর ২০০৯ ভোটার নিবন্ধনের কাজ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটলিয়ন- ৫ এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন কমিশন অফিস, আঞ্চলিক অফিসসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোটার রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রে স্যাটেলাইট লিংক স্থাপনে করা হয়। এ সার্ভারের মাধ্যমে সরাসরি ভোটার নিবন্ধন মনিটরিং করা হয়। এক মাসের রেজিষ্ট্রেশন ক্যাম্পেইনের পর রাজনৈতিক দলগুলোর সুপারিশে আরো এক সপ্তাহ সময় বাড়ানো হয়। দেশব্যাপী ১৩ হাজার ৭০৫টি ভোটার নিবন্ধন সেন্টার/কমিটির মাধ্যমে ১লক্ষ ২০হাজার নিবন্ধক কর্মী এ কাজে অংশগ্রহণ করে। ডাটা এন্টি এবং সার্ভার হিসেবে ১ হাজার ৫০০ কম্পিউটার ৪০টি প্রিন্টার এবং ২ হাজার ৫০টি যানবাহনের ব্যবস্থা করে UNMIS।

খসড়া তালিকা প্রণয়নের পর কোন আপত্তি থাকলে তা নিরসনের জন্য ২৭জন বিচারক নিয়োগ করা হয়। ৬৭৮ আপত্তি পাওয়া যায়, অধিকাংশই ছিলো নাম সংশোধন সম্পর্কিত। আপিল কর্তৃক তালিকা থেকে ১৭৪টি বাদ দেন এবং ৫০৪টি আপিল বাতিল করে। চূড়ান্তভাবে NEC ১১ জানুয়ারি, ২০১১ সালে ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৪২ জনের নাম তালিকাভুক্ত ভোটার রেজিষ্ট্রার প্রকাশ করে। যা প্রত্যেকটি জনসাধারণের দেখার জন্য উম্মুক্ত রাখা হয় এবং CD আকারে রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট প্রেরণ করা হয়। দেখা যায়

সম্ভাব্য ভোটার হওয়ার যোগ্য নাগরিকদের ৮৩% ভোটার রেজিস্ট্রার্ড হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৪৯.৩% এবং নারী ৫০.৭% ।[২৮] উল্লেখ্য যে, সুদানের নিয়মিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও ভোটার তালিকায় নাম তালিকাভুক্তির সুযোগ পান। ব্যাটেলিয়ন যে স্থানে অবস্থিত ঐ স্থানের ভোটার তালিকায় তার নাম রেজিস্ট্রি করেন।

গ. নির্বাচনী তফশীল ঘোষণা

জাতীয় নির্বাচন কমিশন ২০০৯ সালের ৩০ শে নভেম্বর জাতীয় নির্বাচনের তারিখে ঘোষণা করে। ভোট ২০১০ সালের ১১ হতে ১৩ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ১০ই এপ্রিল প্রচার ও প্রচারণা শেষ হবে। মোট তালিকাভুক্ত ৮২টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৭৩টি রাজনৈতিক দল মনোনয়ন জমা দেয়। নির্বাহী ও আইনসভা নির্বাচনে মোট ১৪১৫২ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

সুদানের প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ সুদান সরকারের প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর একজাতীয় আইন পরিষদ, দক্ষিণ সুদান আইন পরিষদ, দক্ষিণ ও উত্তর সুদানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রার্থীদের তালিকা[২৯]–

১. প্রজাতন্ত্রি সুদানের রাষ্টপ্রতি প্রার্থী– মোট ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। এদের মধ্যে ২ জন নারী এবং ২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

২. দক্ষিণ সুদান সরকারের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী– ২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ।

৩. গর্ভনর প্রার্থী– ১৭৭ জন নারী-পুরুষ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে ৪৩জন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

৪. জাতীয় আইন পরিষদ– মোট ৪ হাজার ৯৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। এর মধ্যে ১ হাজার ১১৭ জন নারী ও ৩৮৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

৫. দক্ষিণ সুদানের আইন পরিষদ - ৫৬২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। এর মধ্যে ১১১জন স্বতন্ত্র এবং ১১৯ জন নারী প্রার্থী।

৬. দক্ষিণ ও উত্তর সুদান প্রাদেশিক আইন পরিষদ - মোট ৯ হাজার ২০৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে ১ হাজার ৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ২ হাজার ৫২০ জন নারী প্রার্থী।

ঘ. নির্বাচনী প্রচারণা

UNMIS ও UNDP নির্বাচনী প্রচারের জন্য NEC কে ব্যাপক ভাবে সহযোগিতা করে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুদানি নির্বাচন কমিশন তথ্য মন্ত্রণালয়, রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রগুলোকে কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা প্রদান করে। এক্ষেত্রে UNMIS দু'ভাবে কাজ করে প্রথমত: NEC কর্তৃক সম্মিলিত মিডিয়া সেল স্থাপন ও সক্ষমতা অর্জনে সহযোগিতা করে। সরকারি রেডিও এবং টেলিভিশন, বেসরকারি এফএম রেডিও, কমিউনিটি রেডিও, সামাজিক মাধ্যমসহ দেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে নির্বাচনী গাইড লাইন ও code of conduct অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনায় নিরাপত্তা বিধান ও সহায়ক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে দেশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করে। বিশেষ করে দক্ষিণ সুদানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেডিও প্রোগ্রাম পরিচালনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের রেডিও ট্রান্সজেকশন সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত: UNMIS তাদের বেসরকারী কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে দেশ জুড়ে নির্বাচনী সচেতনতা সৃষ্টি এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভোটারদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে সচেতন করে। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ায় সাধারণ জনগোষ্ঠীকে প্রার্থী পছন্দের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতমূলক কাজ করে। এসব কাজের জন্য UNMIS ও UNDP নির্বাচন কমিশনকে বেশকিছু নির্বাচনী প্রচার ও আইনানুগ দলিল, নির্বাচনী হ্যান্ড বুক, লিফলেট, নির্বাচনী এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের নীতিমালা; নির্বাচনী আইন, আচরণবিধি, ইত্যাদি প্রকাশনা এবং বিলি করতে সহযোগিতা করে। নির্বাচন কমিশন UNMIS ও UNDP'র কৌশলগত কারিগরি সহযোগিতায় একটি নির্বাচন কর্মীর অফিসিয়াল মিডিয়া প্লাটফর্ম তৈরি করে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সকল রাজনৈতিক দল যাতে সম সুযোগ পায় সেজন্য– সুদানের তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, রেডিও টিভি কর্তৃপক্ষ, সুদানে নিউজ এজেন্সি (SONA) এবং UNIRED এর আলোচনায় একটি Joint Media Mechanism নামে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়[৩০]। এখানে বিশেষত্ব ও অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের সমন্বয় করা হয়। দেশের ৮২টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রধান ৬টি রাজনৈতিক দলকে এ প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রথম দুটি ছিল জাতীয় পর্যায়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় দল এবং GOND জাতীয় ঐক্য সরকারের অংশ। অন্য ৪টি ছিল প্রধান বিরোধী দল। রাজনৈতিক দলগুলো হলো - ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি (NCP), সুদান পিপলস লিবারেশন মুভমেন্ট (SPLM), ডেমোক্রটিক ইউনিটস পার্টি (অরিজিশন), ন্যাশনাল টমসা পার্টি, পপুলার কংগ্রেস পার্টি, সুদানিস কমিউনিস্ট পার্টি।

ঙ. নির্বাচন পর্যবেক্ষন

জাতীয় নির্বাচন কমিশন (NEC) নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায় এবং CPA- র অংশীজন এবং আঞ্চলিক দেশ ও সংস্থাসমূহকে আমন্ত্রণ জানায়। এ আমন্ত্রনে সাড়া দিয়ে আফ্রিকান ইউনিয়ন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আরব লীগ, কার্টার সেন্টার, চীন, কেনিয়া, রাশিয়া, জাপান, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশের অফিসিয়াল প্রতিনিধিগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশ নেয়[৩১]। কমিশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষণ নীতি মালা (Code of conduct for observing the election) প্রণয়ন করে। এ আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী কোন পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যবেক্ষকগণ দেশের যে কোন প্রান্তে যে কোন কেন্দ্র বা নির্বাচনের যে কোন স্তর পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। পর্যবেক্ষকদের দেখা নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট সময় NEC সাথে শেয়ার করার ব্যবস্থা রাখা হয়। ভোটার অংশগ্রহণ, প্রতিনিধি পছন্দের স্বাধীনতা এবং নির্বাচন কেন্দ্রীক সততার (Integrity of the elections) উপর পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় পর্যবেক্ষকদের চলাচল ও যোগাযোগ নিরাপদ ও সহজ করা এবং তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সুদানী পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যৌথভাবে পালন করে। UNMIS কারিগরি ও আপদকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ।

চ. নির্বাচন পরিচালনা, ফলাফল ঘোষণা ও প্রত্যায়ন

NEC উত্তর ও দক্ষিণে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯১২টি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করে। এসব ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশের পুলিশ বাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১ লক্ষ প্রশিক্ষিত নির্বাচনী কর্মী ভোট গ্রহণ কাজে নিয়োজিত হয়। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে 'ষ্ট্রাইকিং ফোর্স' হিসেবে কাজ করে[৩২]।

কিন্তু ভোটের ব্যালট, ব্যালট বক্স, কালিসহ সকল উপকরণ UNMIS এর Electoral Support Assistance Division এর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। এগুলো খার্তুম বিমান বন্দর থেকে প্রত্যেকটি প্রদেশের বিমান বন্দরে পাঠানোর দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ব্যাটালিয়ন। এছাড়া UNMIS এর সেনা সদস্যগণ এ উপকরণ গুলো প্রতিটি সেন্টারে পাঠানোর ও হেফাজতে রাখার দায়িত্ব পালন করে। নির্বাচনের প্রথম দিন কিছু কৌশলগত ও প্রশাসনিক ভুলের কারণে কিছু উপকরণ কয়েকটি প্রদেশের ভুল

সেন্টারে পাঠনো হয়। ভোট শুরু হলে তা ধরা পড়ে। সাথে সাথে ঐ দিনই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিশেষ ইউনিট সঠিক উপকরণ পাঠানোর কাজ করে। নির্বাচন কমিশন সাথে সাথে ঐসকল কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করে এবং অন্যদিন ভোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এরকম কিছু কারণবশত: কমিশন ভোটের তারিখ আরো ২ দিন বাড়িয়ে ১৫ এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত বর্ধিত করে। কাঙ্খিত এ নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ৭২ শতাংশ। ভোটের ফলাফল সংগ্রহ এবং প্রতিটি কেন্দ্রের খবরাখবর জানার জন্য UNMIS রেডিও ট্রান্সমিশন ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাটলিয়নের ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কারিগরি দল সারাদেশে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। রেডিও ট্রান্সমিশনের সাহায্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত কেন্দ্রের ফলাফল নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় ফলাফল কেন্দ্র খার্তুমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। নির্বাচনী দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আস্থা অর্জিত হয়। মিডিয়া, রাজনৈতিক দল, আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায় ও জনগণ সময় সময় নির্বাচনী ফলাফল পেতে থাকে, যা রাজনৈতিক দলগুলোকে ফলাফল মেনে নিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির প্রার্থী মি. ওমর হাসান আহমেদ আল বশির নির্বাচিত হন। নিরঙ্কুশ সাংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিতে মি. ওমর মোট ভোটের (১.০১.১৪.৩১০) ৬৮% ভোট (৬৯.০১.৬৯৪) পান। দক্ষিণ সুদান সরকারের (GOSS) প্রেসিডেন্ট পদে সুদান পিপলস্ লিবারেশন মুভমেন্ট এর প্রার্থী মি. সালবা কির মিয়ারদি (Mr. Salva Kiir Mayardit) নির্বাচিত হন। মি. সালবা দক্ষিণ সুদান প্রদেশের মোট ভোটের (২৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৩০) ৯২.৯৯% ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেন[৩৩]।

৫.৫ গণভোট আয়োজন

বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা ২০১০ সালের সুদানের জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক ও স্থানীয় নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগীতা করে। সুদানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে সুদানে প্রদেশগুলিতে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর ম্যান্ডেট অনুসারে UNMIS মিশন সুদান হতে দক্ষিণ সুদান পৃথকীকরণের জন্য গণভোট আয়োজনের জড়িত হয়। জাতীয় নির্বাচনের পর ২০১১ সালের ৯ জানুয়ারি সুদানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোট পরিচালনা এবং গণভোট পূর্ব ও পরবর্তী নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা। নির্বাচনে ভোটের হার ছিলো ৯৭.৫৮ শতাংশ। এর মধ্যে ১.১৭ শতাংশ (৪৪ হাজার ৮৮৮) ভোটার ঐক্যের পক্ষে এবং ৯৮.৮৩ শতাংশ (৩৭ লক্ষ ৯২হাজার ৫১৮) ভোটার সুদান হতে দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতার/পৃথকীকরণের পক্ষে রায় দেয়। ভোটের এ ফলাফল সুদানের সকল রাজনৈতিক দল, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থা স্বীকৃত ও সুদানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সুদানের দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক সমাধান হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান। জাতিসংঘের মহাসচিব তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন – *"The Sudanese people cannot afford a resumption of conflict. We must all assist them in finding a peaceful way through one of the most important passages in their country's history.*

We expect the referenda to be peaceful, carried out in an environment free of intimidation or other infringements of rights.

We expect both parties to accept the results, and to plan for the consequences.

And finally, we expect the parties to adhere to the CPA, without unilateral acts on either side, North or South."[৩৪]

চিত্র ৫.১: দক্ষিণ সুদানের গণভোট ২০১১ এর ফলাফল (প্রদেশ ভিত্তিক)

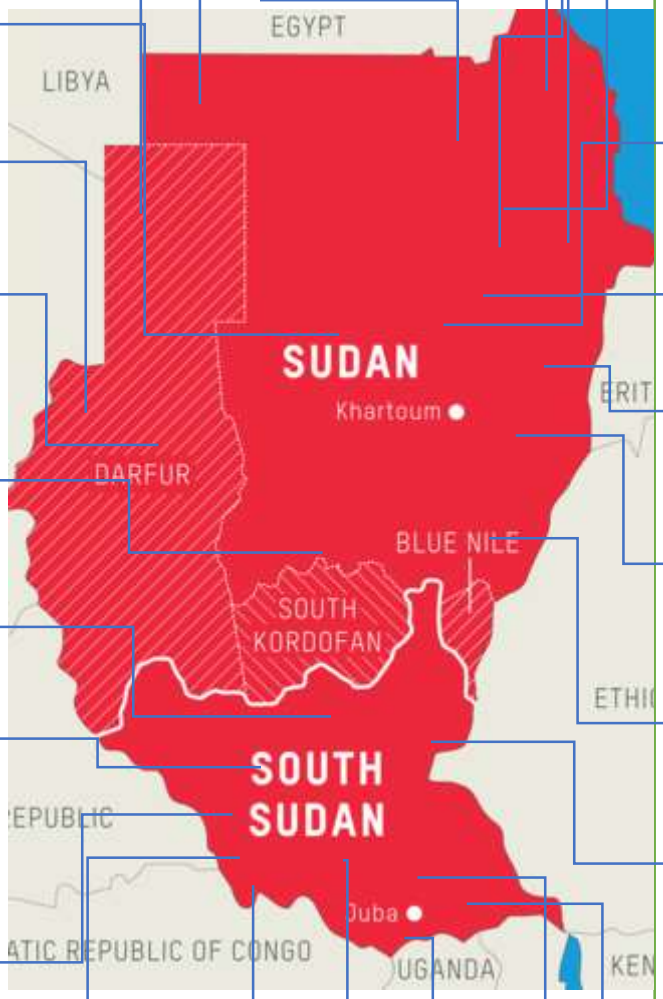

নর্দান ট্রেট
মোট বৈধ ভোট-১৫২৪
ঐক্য- ২৮.৭%
বিচ্ছিন্নতা- ৭১.৩%

রিভার নীল
মোট বৈধ ভোট-
১৮১৭
ঐক্য- ৩৩.২%
বিচ্ছিন্নতা- ৬৬.৮%

রেড সী
মোট বৈধ ভোট- ১০৪৯
ঐক্য- ২৪.২%
বিচ্ছিন্নতা- ৭৫.৮%

খার্তুম ওমডুরম্যান
মোট বৈধ ভোট- ৯২৫৮
ঐক্য- ৪৭.৭%
বিচ্ছিন্নতা- ৫২.৩%

কাস্সালা
মোট বৈধ ভোট-
১১৯৩
ঐক্য- ৪০.৫%
বিচ্ছিন্নতা- ৫৯.৫%

নর্দান দাফুর
মোট বৈধ ভোট- ১৫২৪
ঐক্য- ৪৫.৩%
বিচ্ছিন্নতা- ৫৪.৭%

নর্থ কারদুফান
মোট বৈধ ভোট- ৩৬১২
ঐক্য- ৪৯.৯%
বিচ্ছিন্নতা- ৫০.১%

গাদারেফ
মোট বৈধ ভোট- ২৩২১
ঐক্য- ২৮.২%
বিচ্ছিন্নতা- ৭১.৮%

ওয়েস্টান দাফুর
মোট বৈধ ভোট- ৫৪০
ঐক্য- ২৪.৪%
বিচ্ছিন্নতা- ৭৫.৬%

ব্লু নীল
মোট বৈধ ভোট-৪৮১০
ঐক্য- ২৪.১%
বিচ্ছিন্নতা- ৭৫.৯%

সাউদান দাফুর
মোট বৈধ ভোট- ৯২৫৩
ঐক্য- ৬৩.২%
বিচ্ছিন্নতা- ৩৬.৮%

আল গাজিরা
মোট বৈধ ভোট- ২৬৬৭
ঐক্য- ৪২.৮%
বিচ্ছিন্নতা- ৫৭.২%

সাউথ করদুফান
মোট বৈধ ভোট- ৪৬২৫
ঐক্য- ৩৩.৯%
বিচ্ছিন্নতা- ৬৬.১%

সিন্নার
মোট বৈধ ভোট- ১৯০১
ঐক্য- ৩৪.৯%
বিচ্ছিন্নতা- ৬৫.১%

ইউনিটি
মোট বৈধ ভোট- ৪৯৭৫৬৭
ঐক্য- ০%
বিচ্ছিন্নতা- ১০০%

ওয়াইট নীল
মোট বৈধ ভোট-৬৪৮৫
ঐক্য- ৩৯.১%
বিচ্ছিন্নতা- ৬০.৯%

নর্দান বাহার আল গজল
মোট বৈধ ভোট-
৩৮১৩৭৫
ঐক্য- ০.১%
বিচ্ছিন্নতা- ৯৯.৯%

ব্লু নীল
মোট বৈধ ভোট- ৪৮১০
ঐক্য- ২৪.১%
বিচ্ছিন্নতা- ৭৫.৯%

আপার নীল
মোট বৈধ ভোট-
৩৪৬৪৮৬
ঐক্য- ০.৫%
বিচ্ছিন্নতা- ৯৯.৫%

ওয়েস্টান বাহার আল গজল
মোট বৈধ ভোট-
১৬১০৭৬
ঐক্য- ৪.৫%
বিচ্ছিন্নতা- ৯৫.৫%

জঙ্গলি, মোট বৈধ ভোট-
৪২৯৬৯৪
ঐক্য- ০%
বিচ্ছিন্নতা- ১০০%

ওয়েস্টান ইকোটারিয়া
মোট বৈধ ভোট-
২১২৬৫৬
ঐক্য- ০.৫%
বিচ্ছিন্নতা- ৯৯.৫%

ওয়ারাপ
মোট বৈধ ভোট-
৪৬৯০৯৬
ঐক্য- ০%
বিচ্ছিন্নতা- ১০০%

লেক
মোট বৈধ ভোট-
২৯৮৪৪১
ঐক্য- ০.১%
বিচ্ছিন্নতা- ৯৯.৯%

সেন্টাল ইকোটারিয়া
মোট বৈধ ভোট- ৪৫৪২৯৬
ঐক্য- ১.১%
বিচ্ছিন্নতা- ৯৮.৯%

ইস্টান ইকোটারিয়া
মোট বৈধ ভোট-
৪৬২৯০৯
ঐক্য- ০.১%
বিচ্ছিন্নতা- ৯৯.৯%

৫.৬ UNMIS মিশনে ব্যর্থতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

সুদানের UNMIS মিশনে সফলতার পাশাপাশি রয়েছে ব্যর্থতা এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশী মিশনকে প্রধানত ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলীয় নৃতাত্ত্বিক প্রদেশগুলোতে দায়িত্ব পালনে। আবার ধর্মীয় দৃষ্টি হতে উত্তরের চেয়ে দক্ষিণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের একটু বেগ পেতে হয়[৩৫]। আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস এবং সংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ এর সাথে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, রাজনৈতিক দলগুলো শান্তি প্রক্রিয়ায় বিলম্বিত করার জন্য জাতিসংঘকে অভিযুক্ত করে। দারফুর শান্তি প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ করে এবং সুনির্দিষ্ট দল বা গ্রুপের প্রতি সহনশীলতার অভিযোগ করে। এ প্রেক্ষিতে আমরা দেখি দারফুরে একটি নতুন শান্তি মিশন প্রদান করা হয়।

UNMIS মিশনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো সুদানের সকল অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে না পারা। যেমন আবেয় (Abyei) প্রদেশে জাতীয় পরিষদ ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়নি। এটিকে রেফারেন্ডাম কমিশন ও UNMIS এর ব্যর্থতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে, মার্চ ২০১১ প্রদেশটিতে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় এবং ২০ হাজার লোক ঘর ছাড়া হয়। এ প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ নতুন মিশন গ্রহণ করে (UN Interim Security Force for Abyei, UNISFA)[৩৬]। দীর্ঘদিন মিশন মোতায়েন করার পরও দেশের সকল প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা সিপিএ বাস্তবায়কে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। মিশনের এ ব্যর্থতার জন্য অনেকে মিশনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ যোগ্যতা ও স্বক্ষমতার ঘাটতি ও একইসাথে মিশন ম্যান্ডেটের অস্পষ্টতা বা অতি উচ্চাকাঙ্খি প্রত্যাশাকে দায়ী করা যায়। সুদানের বহুমাত্রিক সমস্যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ছাড়া পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সাথে কোন কোন প্রদেশের বিরোধী গ্রুপগুলোর সম্পর্ক ছিলো। যা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব ছিলো না। মিশন এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছে বা আঞ্চলিক অংশীজনকে শান্তি প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, মিশনের মাধ্যমে নব্য যে ঔপনিবেশিকতা জাতিসংঘের অন্তরালে পরিচালিত হচ্ছে তার স্বার্থে এরকম দ্বন্দ্বপূর্ণ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক উত্তরণে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে রাখা হয়, যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের খবরদারি বলবৎ থাকে। অনেকে একে মিশন কেন্দ্রীক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করেন। যেমন – UNMIS মিশন কর্তৃক গোটা সুদানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন করে আরো দুটি মিশন (আবেয় প্রদেশে UNISFA মিশন এবং দাফুরে মিশন) চালু করা হয় এবং নির্বাচন পরবর্তী স্বাধীন দক্ষিণ সুদানের গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও জাতিগঠনে

সহযোগিতার জন্য একটি নতুন মিশন UNMISS চালু করা হয়। অর্থাৎ একটা UNMIS মিশন থেকে পরবর্তীতে তিনটি মিশনের জন্ম হলো। শান্তি স্থাপন বা গণতন্ত্র সাহায্যের নামে জাতিসংঘ শান্তিমিশন নব্য ঔপনিবেশিকতার জন্ম দিচ্ছে। একজন মূখ্য তথ্যদাতা এটিকে জাতিসংঘের মিশনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক খেলা বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, 'এরকম মিশন বলবৎ রাখার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো সংঘাতগ্রস্ত রাষ্ট্রে তাদের স্বার্থ হাসিল করে। বহুজাতিক ও রাষ্ট্রীয় কোম্পনীগুলো মিশন ভেদে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্রসমূহে অস্ত্র বিক্রি করে। ফলে, মিশন দীর্ঘায়িত হলে অর্থনৈতিকভাবে পরাশক্তিগুলো লাভবান হয় এবং ঐ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ঘটে। আবার, শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্রও শান্তিরক্ষী প্রেরণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়'[৩৭]।

মাঠ পর্যায়ে সুদানের মিশনকালীন জাতিসংঘের কর্মী ও স্টাফদের বিরুদ্ধে ৪০০টি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যায়[৩৮]। বিশেষ করে যৌন ও শিশু নির্যাতনের অভিযোগ আসে শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে। মিশনের নীতি অনুযায়ী অভিযুক্ত সদস্যকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয় এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী বিচার হয়ে থাকে। এক্ষত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীর সংখ্যা জানা যায়নি।

অপরদিকে, দায়িত্ব পালনে এ মিশনে বাংলাদেশীসহ ৬০ জন শান্তিরক্ষী মারা যান। আবার, এটাও বলা যায়, আত্মত্যাগের পর স্বাধীন দক্ষিণ সুদানে শান্তি বিরাজ করেনি অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘাত, সম্পদের মালিকানা ও ভাগবাটোয়ারা নিয়ে উত্তর সুদানের সাথে দ্বন্দ্ব এখনও বিদ্যমান। একইসাথে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রগঠনে সুদানকে মনোযোগ দিতে হয়। এপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা ও শান্তিরক্ষার জন্য নতুন একটি – মিশন গ্রহণ করে UNMISS। বাংলাদেশের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কন্টিনজেন্ট দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ মিশনের যাত্রালগ্ন থেকে নিয়োজিত রয়েছে[৩৯]। এটা লক্ষনীয় যায় যে, সুদান ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সূর্য এখনও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শান্তি মিশনের ছায়া তলে। ফলে, রাষ্ট্র দুটির জনগণ স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, অধিকার ও মানবাধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। একটি প্রজন্ম যুদ্ধের কারণে শেষ হচ্ছে নতুন প্রজন্মও যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বড় হচ্ছে। শিশু নারী যুবকদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার নূন্যতম নিশ্চয়তা রাষ্ট্র তথা জাতিসংঘ নিশ্চিত করার জন্য যে মিশন পরিচালনা করছে, আজও তা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে কিনা তা সন্দিহান।

পরিবেশবাদীগণ UNMISS মিশনের বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ করেন। হাজার হাজার বেসামরিক, পুলিশ এবং সামরিক কর্মীদের জরুরি মোতায়েনের জন্য প্রচুর পরিমাণে লজিস্টিক, খাবার, পানির প্রয়োজন হয়। শান্তিরক্ষী কর্মীরা প্রায়শই বিশ্বের সবচেয়ে অসহজলভ্য স্থানগুলোতে এবং খুব কম অবকাঠামোযুক্ত দেশগুলোতে কাজ করে। যা গ্রিনহাউস গ্যাস এবং সম্ভাব্য মাটি দূষণের সম্ভাবনা তৈরি করে। বৃহত্তর অপারেশনগুলি প্রচুর কঠিন পয়ঃবর্জ্য এবং সামরিক বর্জ্য উৎপাদন করে, পরিবশে ও বায়ু দূষিত হয় এবং অপরিশোধনযোগ্য নষ্ট জল উৎপাদন করে, যা সরাসরি মাটিতে মিশানোর কারণে মাটি দূষিত হচ্ছে। এই বর্জ্য পণ্যগুলি যদি সঠিকভাবে পরিচালনা না করা হয়, তবে এটি সংশ্লিষ্ট্য দেশের পরিবেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে[৪০]। সুদানে দেখা যায় দুর্গম অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপন এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের নামে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। যেমন– সুদানের দাফুর প্রদেশে পানি জল দুস্প্রাপ্য, সেখানে স্থানীয় সম্প্রদায় জাতিসংঘের মিশনটিকে একটি প্রতিযোগী সংস্থা হিসেবে দেখে। যদিও বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচি যেমন-সোলার পেনেল স্থাপন, গাছ লাগানো, নলকুপ স্থাপন, সেনিটারী টয়লেট স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করেছে বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সমালোচকগণ দারফুরে সিপিএ বাস্তবায়নের ব্যর্থতার জন্য এ কারণটিকে দায়ী করেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের কৃষ্টি ও জীবনাচারণের সাথে মিশন ম্যান্ডেটের বৈপরীত্য অবস্থান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বলে ধারণা করা হয়। ফলশ্রুতিতে সুদানের শান্তি স্থাপন দীর্ঘায়িত হয়েচে এবং নতুন করে দারফুর কেন্দ্রিক শান্তি মিশন গ্রহণ ও পরিচালিত হচ্ছে।

উপসংহার

শান্তিমিশনে নির্বাচনী ভূমিকা পালনের কার্যাবলী বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা নির্বাচন কেন্দ্রিক স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচি না নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে যাতে শান্তি বিরাজ করে সে জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। প্রথাগত সশস্ত্র পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা বা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজেদের অভিজ্ঞতা, পেশাদারিত্ব এবং জাতিসংঘের ম্যান্ডেট পালনের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে শুধু বিবাদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান করেনি বরং রাজনৈতিকভাবে শোষণ ও বঞ্চনা হতে মুক্তিকামী জনগোষ্ঠিকে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীনতালাভে সহযোগিতা করে স্থায়ী শান্তির বন্দোবস্ত করেছে। বিশ্বের নবীনতম দেশ

দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ তার কার্যক্রম শুরু করে ২০১১ সালে। ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হলেও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘাত, সম্পদের মালিকানা ও বন্টন নিয়ে উত্তর সুদানের সাথে দক্ষিণ সুদানের দ্বন্দ্বে সেখানে শান্তি বিরাজ করেনি। একইসাথে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রগঠনে সুদানকে মনোযোগ দিতে হয়। এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ দক্ষিণ সুদানের রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা ও শান্তিরক্ষার জন্য নতুন একটি মিশন গ্রহণ করে- UNMISS।

বাংলাদেশ শুরু থেকেই দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘের এই শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কন্টিনজেন্ট দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ মিশনের যাত্রালগ্ন থেকে নিয়োজিত রয়েছে[৪১]। দক্ষিণ সুদানে চলমান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল মো. মাইন উল্লাহ চৌধুরী। বর্তমানে একটি পদাতিক কন্টিনজেন্টসহ বাংলাদেশের সর্বমোট তিনটি কন্টিনজেন্ট দক্ষিণ সুদানে UNMISS মিশনে নিয়োজিত। UNMISS মিশনে বর্তমানে এক হাজার ৬৪৪ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিয়োজিত রয়েছেন।

তথ্যসূত্র

[১] সুদানের বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মিশনের প্রথম হতে ২০০৫ সাল থেকে অংশগ্রহণ করে। সুদান জাতীয় নির্বাচন কমিশন গঠনের পর নভেম্বর ২০০৯ সালে কমিশন কর্তুক UNMIS কে আহবান করা হলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুসারে নির্বাচনী কার্যে অংশগ্রহণ করে । ২০১০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০১১ সালের জানুয়ারিতে গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান উত্তর সুদান হতে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আর্ভিভূত হয়। নির্বাচন ও গণভোট পরবর্তী ২০১১ সাল হতে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ সুদানে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা UNMISS মিশনের কর্মরত রয়েছে।

[২] International Religious Freedom Report, 2017 at www.ss.usembassy.gov.south_sudan And Religious in Sudan, PEW Research Institute at www.globalreligiosfutures.org প্রবেশ ৩১ জুলাই ২০২০।

[৩] Vegard Bye, Scanteam, Abdel-Rahman El Mahdi, and John Gachi (2010), Democracy Support through the United Nations, Sudan Case Report, Report 10/2010, available at - https://www.oecd.org/countries/sudan/48085726.pdf

[৪] Wells, Victor C. and Samuel P. Dilla, (1993), "Colonization, Arabization, Slavery, and War, and War Against Indigenous Peoples of Southern Sudan, February 23, 2007, at the Way Back Machine" Fourth World Bulletin, Vol.3, No.1

[৫] Martell, Peter (2018). First Raise a Flag. London: *Hurst & Company*. And, 1955-1972. First Sudanese Civil War / Anyanya/Anya-Nya Movement". *Sudan Tribune*. প্রবেশ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০।

[৬] Vegard Bye, Scanteam, Abdel-Rahman El Mahdi, and John Gachi (2010), *Ibid.*

[৭] সুদানের UNMIS মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তার সাথে গবেষকের সাক্ষাতকার, ঢাকা ,২৯ ডিসেম্বার ২০২০।

[৮] United Nations Mission in the Sudan (UNMIS), at https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unmis/background.shtml, প্রবেশ ১০ ডিসেম্বর ২০২০।

[৯] *প্রাগুক্ত।*

[১০] *প্রাগুক্ত।*

[১১] Secretary General tells security council 'it is time to act' in darfur, as council meets in wake of renewed fighting, 11 September 2006, https://www.un.org/press/en/2006/sc8823.doc htm, প্রবেশ ৩১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

[১২] *প্রাগুক্ত।*

[১৩] *প্রাগুক্ত।*

[১৪] Mandate of United Nations Mission in the Sudan, at https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unmis/mandate.shtml, প্রবেশ ৩১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

[১৫] Glory of Bangladesh Army in Recent UN Peacekeeping Operations, published by Overseas Operation Directorate, Bangladesh Army Headquarter, Dhaka, May 2011, pp-27-28.

[১৬] *প্রাগুক্ত।*

[১৭] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), The Role of Peacekeeping Operations in Electoral Process, School of International and Public Affairs, Columbia University (https://www.sipa.columbia.edu).

[১৮] ছয়টি উপ শাখা হচ্ছে- রাজনৈতিক বিষযক, অসামরিক বিষয়ক, মানবাধিকার সংরক্ষণ, নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ (নির্বাচনী প্রচার ও নাগরিক সচেনতা) এবং আইন শৃঙ্খলা বা পুলিশী কার্যক্রম।

[১৯] সুদান মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ পুলিশের পুলিশ সুপার পদমর্যদার একজন নারী কর্মকর্তা সাক্ষাতকারে এ মত ব্যক্ত করেন। গবেষকের সাথে সাক্ষাতকার, ঢাকা, ২২ নভেম্বর, ২০২০।

[২০] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), The Role of Peacekeeping Operations in Electoral Process, School of International and Public Affairs, Columbia University (https://www.sipa.columbia.edu) এ গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, যুবা ও খার্তুমে নির্বাচন প্রক্রিয়াতে জাতিসংঘ এবং জড়িত কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত্কারে এ মনোভাব পর্যবেক্ষণ করেন।

[২১]http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Fact%20Sheets/FS-electoral%20Assistance.pdf 11/06/10, প্রবেশ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০।

[২২] Derek Carnegie, M Doucey, S Jacobs and Others (2012), প্রাগুক্ত, পৃ-১৫-১৭।

[২৩] UNMIS: Protection of Civilians (PoC) Fact Sheet at www.unmis.org.

[২৪] জাতিসংঘ নির্বাচনের জন্য একটি বাস্কেট তহবিল গঠন করে। এ তহবিলে ইইউ, ডিএফআইডি, নেদারল্যান্ডস, জাপান এবং নরওয়ে অংশগ্রহণ করে। ২০০৯ সালে প্রাথমিক ভাবে ২ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়। এ তহবিলে প্রধান অবদানকারী হিসাবে ইউএনএমআইএসের অবদান ছিল প্রায় দেড় মিলিয়ন মার্কিন ডলার নিজস্ব।

[২৫] Preliminary Report on General Elections 2010, National Election Commission, Republic of Sudan, available at http://nec.org.sd/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/NEC-preliminary-report-2010-elections.pdf

[২৬] *প্রাগুক্ত।*

[২৭] Glory of Bangladesh Army in Recent UN Peacekeeping Operations, *প্রাগুক্ত।*

[২৮] *প্রাগুক্ত।*

[২৯] Vegard Bye, Scanteam, Abdel-Rahman El Mahdi, and John Gachi (2010), প্রাগুক্ত।

[৩০] *প্রাগুক্ত।*

[৩১] *প্রাগুক্ত।*

[৩২] Preliminary Report on General Elections 2010, National Election Commission, Republic of Sudan, *প্রাগুক্ত।*

[৩৩] *প্রাগুক্ত।*

[৩৪] https://unmis.unmissions.org/referendum-coverage, প্রবেশ ৩১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

[৩৫] UNMIS মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একজন কর্মকর্তার সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার, গুলশান, ঢাকা- ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২১।

[৩৬] www.peacekeeping.un.org/en/mision/past/unmis/background.shtml, প্রবেশ ২জানুয়ারি ২০২১।

[৩৭] UNMIS মিশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একজন কর্মকর্তার সাথে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা- ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২১।

[৩৮] *UN Peacekeepers Criticized. www.globalpolicy.org.* প্রবেশ ২৩ জানুয়ারি ২০২১।

[৩৯] https://www.banglanews24.com/national/news/bd/811440.details, প্রবেশ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০।

[৪০] *UN Peacekeepers Criticized. www.globalpolicy.org.* প্রবেশ ২৩জানুয়ারি ২০২২।

[৪১] https://www.banglanews24.com/national/news/bd/811440.details, প্রবেশ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ভূমিকা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহে শান্তি অর্জন ও বজায় রাখা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সচল রাখা, নাগরিক সুরক্ষা প্রদান এবং যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত রাখার লক্ষে কাজ করে থাকে। কিন্তু মিশনের বহুমাত্রিক ম্যান্ডেট, আর্ন্তজাতিক রাজনীতির জটিল গতিপ্রকৃতি, সংঘাতের নিত্য নতুন ধরনের ফলে শান্তিমিশন বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে একের পর এক মিশন পরিচালনা ও মোতায়েন রেখেও শান্তি অর্জনে ব্যর্থতা (যেমন- কঙ্গো দক্ষিণ সুদান) অংশীজনদের নিকট শান্তি মিশনের কাঠামো, লক্ষ এবং মিশন পরিচালনার কৌশল নিয়ে নতুন করে ভাবনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন শান্তিরক্ষা মিশনের মূল্যায়ণ করেছে তেমনি, ২০১৮ সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের নেতৃত্বে শান্তিমিশনের কার্যক্রম সংস্কার ও পুর্নবিন্যাসের লক্ষে শান্তি মিশনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতপূর্বক ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মহাসচিবের এ উদ্যোগ Action for Peace (A4P) নামে পরিচিত। এ মূল্যায়নটি জাতিসংঘের একটি স্বউদ্যোগ মূল্যায়ণ ও ভবিষৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রচেষ্টা। শান্তি মিশনে প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য শান্তিমিশনের চ্যালেঞ্জ ও ভবিষৎ করণীয় চিহ্নিত করণের পূর্বে বৈশ্বিকভাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিজস্ব উদ্যোগে মূল্যায়ণকৃত শান্তিমিশনের চ্যালেঞ্জ ও ভবিষৎ করণীয়গুলো আলোচনার দাবি রাখে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের বাহিরে বাংলাদেশও নয়। বর্তমান অধ্যায়ে প্রথমে শান্তিমিশনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও ভবিষৎ কর্মপন্থা আলোচনাপূর্বক পরবর্তীতে বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হলো।

৬.১ শান্তি মিশনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ

A4P শান্তিমিশনের ৬টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে এবং ভবিষৎ কর্মপন্থা তথা মিশনের লক্ষ হিসেবে ৭টি কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে এ মূল্যায়ণ প্রকাশ করা হয় এবং আগষ্ট মাসে সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক এ বিষয়ে সমর্থনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বর্তমানে ১৫২টি দেশ ও ৪টি আঞ্চলিক সংগঠন শান্তিমিশনের

এ ভবিষ্যৎমূখী কর্মপন্থা (২০২১-২৩) A4P ঘোষণাকে সমর্থন করে অনুস্বাক্ষর করেছে। নিম্নে প্রথমে A4P ঘোষণার আলোকে চলমান চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিমিশনের ৬টি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হলোঃ

ক. সশস্ত্র সংঘাতের প্রকৃতির পরিবর্তন

বর্তমান সশস্ত্র সংঘাতসমূহ আন্তঃদেশীয় নয় বরং অন্তঃরাষ্ট্রীয়। সশস্ত্র গ্রুপগুলো দেশের ভিতরে থেকে অপর গ্রুপ, সরকারি বাহিনী, সাধারণ জনগণ এমনকি শান্তিরক্ষীদের লক্ষে পরিণত করে। গ্রুপগুলো অনেক সময় জঙ্গিবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং শান্তিরক্ষা মিশনও টার্গেটে পরিণত হয়। এ সকল সশস্ত্র সংঘাত আন্তঃসম্পর্কিত এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ। এর সাথে নিত্য নতুন প্রজন্মের অস্ত্রের ব্যবহার সংঘাতের প্রকৃতিতে দ্রুত পরিবর্তন এনেছে। অপরাধের প্রকৃতি ও অস্ত্রের ধরনের দ্রুত পরিবর্তন শান্তিমিশনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে যা ম্যান্ডেট বাস্তবায়নকে বাঁধাগ্রস্ত করে। যেমন মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের MINUSCA মিশনে সশস্ত্র আন্তঃসংঘাতের প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘ, অফ্রিকান ইউনিয়ন, ইসিসিএএস, সরকার ও সশস্ত্র গ্রুপগুলোর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পর সহিংসতার মাত্রা কমলেও সহিংসতা এখনো বিদ্যমান।

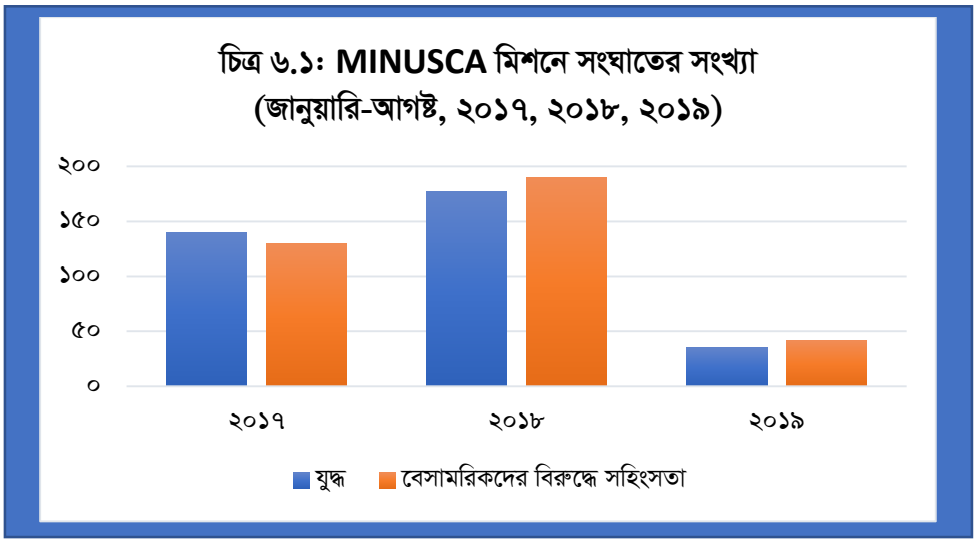

সূত্র : Action for Peace-keeping, Highlight of key Achievement, Information Management Unit DPPA-DPO, 1 November, 2019.

বর্তমানে সশস্ত্র গ্রুপকর্তৃক ড্রোন, সাইবার আক্রমণ ও প্রযুক্তির নিত্য নতুন ব্যবহারের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধ করা জাতিসংঘ মিশনের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

খ. শান্তিরক্ষীরা আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু

চলমান শান্তিমিশনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো বিদ্রোহীদের আক্রমনের লক্ষ্য হতে শান্তিরক্ষীদের রক্ষা করা। বিগত এক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, প্রায় প্রতিমাসে কোথাও না কোথাও শান্তিরক্ষীরা সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। নিম্নের চিত্রে বিগত এক দশকে সকল মিশনে সেনা ও পুলিশ শান্তিরক্ষীদের উপর আক্রমণের হার হতে দেখা যায় বিগত দশকে সহিংস আক্রমণের হার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে এবং শেষ দুবছরে হ্রাস পেলেও এ হার ছিলো উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৬.২)।

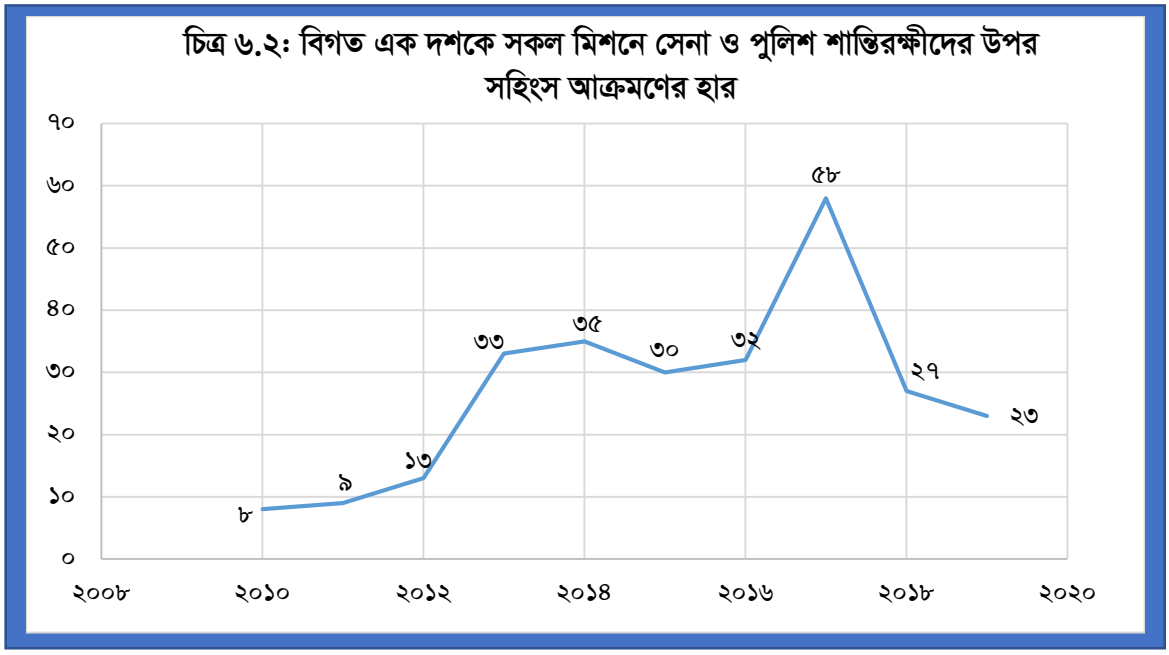

সূত্র : Action for Peace-keeping (A4P), Highlight of key Achievement, Information Management Unit DPPA-DPO, 1 November, 2019 হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে দেখা যায়, জানুয়ারি ২০১৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা যেসব মিশনে উল্লেখযোগ্য হারে মোতায়েন ছিল সে সব মিশন (বৃহৎ ৫টি) পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ঐসব মিশন গুলোতে সহিংস আক্রমণের হার ছিল উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে সর্বমোট ২৩৬টি সহিংস আক্রমনের ঘটনা ঘটে। বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহৎ সংখ্যক শান্তিরক্ষী মোতায়েনকৃত চারটি মিশনে (MONUSCO, UNMISS, MINUSCA, MINUSMA) আক্রমণের শতকরা হার ছিলো ঐ সময়ে (২০১৩-২০১৯) যথাক্রমে ৩৪%, ৫৩%, ৫%,এবং ১৫% (চিত্র ৬.৩)। এ তথ্য এটি প্রমাণ করে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে শান্তিমিশনে কাজ করছে।

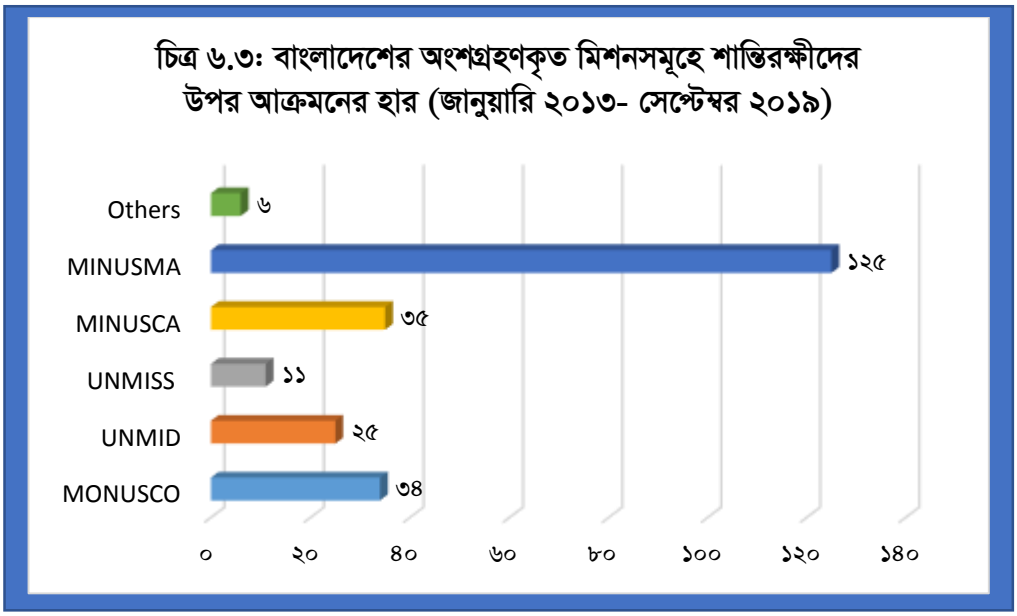

সূত্র : Action for Peace-keeping (A4P), Highlight of key Achievement, Information Management Unit DPPA-DPO, 1 November, 2019 হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

UNMISS মিশনে আক্রমণের হার (৫%) নিম্ন হওয়ার কারণ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ তথ্যদাতা মনে করেন, "যেহেতু দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা অর্জনের সময় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ছিল মানবিকতা ও পেশাদারিত্বপূর্ণ, যা দক্ষিণ সুদানের জনগণকে আকৃষ্ট করে। তারা মনে করে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা হলো দক্ষিণ সুদানের বন্ধু। যেমনটা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকার জন্য আজও আমরা ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেই। এ জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী দক্ষিণ সুদানের UNMISS মিশনে বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণ রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণ সুদানের জনগণ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের নিরিখে দেখে থাকে। এটি বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের একটি অর্জন । তেমনি মাঠ পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট।"[১]

গ. অধরা রাজনৈতিক সমাধান

মিশনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় দীর্ঘদিন শান্তিমিশন পরিচালনা করার পরও দীর্ঘমেয়াদী সহিংসতা শেষ হচ্ছে না। দেখা যায় মিশন শুরুতে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিলো সেটি মিশনের মেয়াদান্তে নতুন মোড় নেয়, যা রাজনৈতিক সমাধানের এ দীর্ঘ কার্যক্রমকে গুরুত্বহীন করে তোলে। UNMIL, UNOCI এর মতো মিশনগুলোতে একাধিকবার মিশন মেয়াদ বর্ধিত করা হয়, কিন্তু দূর্বল রাজনৈতিক সমাঝোতা, শান্তি

প্রক্রিয়ায় অংশীজনের সম্মতি হ্রাস, শান্তি প্রক্রিয়ায় স্থবিরতা ও মিশন শেষ করার অস্পষ্ট কৌশলের (Mission exit strategy) কারণে শান্তি প্রক্রিয়া বা মিশন ম্যান্ডেট বাস্তবায়িত হয়নি।

যেমন, কঙ্গোতে দীর্ঘদিন মিশন পরিচালনার পর রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ভোটের আয়োজন করা হয় কিন্তু ভোট পরবর্তী সংঘাত বন্ধ না হয়ে উল্টো নতুন করে সংঘাত সৃষ্ট হয়। নতুন করে ভোটে জয়ী ও পরাজিত দলগুলোর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি মিশন পরিসমাপ্তি না হয়ে বরং নতুন করে মিশন বর্ধিত হয়েছে এবং যুক্ত হয়েছে নতুন ম্যান্ডেট। অংশীজনরা মনে করে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছতে না পারাটা শান্তি মিশনের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ঘ. বিস্তৃত ও জটিল মিশন ম্যান্ডেট

বর্তমানে সমসাময়িক মিশনগুলোতে অনেক ধরনের এবং অনেক বিস্তৃত ও নতুন নতুন ম্যান্ডেট যুক্ত হয়। আবার নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ম্যান্ডেট পুর্নবিবেচনা করে নতুন নতুন ম্যান্ডেট যুক্ত হওয়ায় মিশন দীর্ঘায়িত হয়। ফলে মিশনগুলোর উপর বিস্তৃত ও জটিল ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত দায়িত্ব অর্পিত হয়, যা সংশ্লিষ্ট মিশনকে নির্দিষ্ট মেয়াদে লক্ষ পূরণে অত্যধিক কার্যভার দিয়ে ফেলে। একই সময়ে আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক অংশীজনেরা জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ভূমিকা রাখতে পারেনা। দেখা যায় যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা, মানবিক ও আইনানুগ সহায়তার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সচল করার মতো জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যপূরণে অংশীজনের নিকট হতে মাঠ পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত সাড়া পাওয়া যায়না। ফলে মাঠ পর্যায়ে মিশন ম্যানেজমেন্টকে ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় এবং মিশন দীর্ঘায়িত হয়।

ঙ. মিশন সমূহের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার ঘাটতি

মিশনের বহুমাত্রিকতার ধরন অনুযায়ী সুসংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত শান্তিরক্ষী যোগান একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সংঘাতের প্রেক্ষিতে তড়িৎ মিশনে শান্তিরক্ষী যোগান করা সম্ভব হয়না। তেমনি শান্তিরক্ষামিশনে নারীর শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ এবং মিশনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। শান্তিমিশনের ভিশন ২০৩০ অনুসারে ফোর্সের মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী শান্তিরক্ষী থাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

করা হয়েছে। কিন্তু শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে বাহিনীসমূহে এ সংখ্যক প্রশিক্ষিত ও নিয়মিত নারী সদস্যের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে সাধারণ নারীদের শান্তি প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয় না বা সময় সাপেক্ষ। এছাড়া, শান্তিরক্ষীদের সক্ষমতা নিরূপনের জন্য বর্তমান কাঠমোর মধ্যে ঘাটতি রয়েছে। যেমন– ম্যান্ডেটের ধরন অনুযায়ী শান্তিরক্ষীদের পেশাগত দক্ষতা মূল্যায়ণে সমজাতীয় হয়না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে সৈনিকের এবং সামগ্রিকভাবে কোম্পানীর সক্ষমতার মূল্যায়ণে তুলনা করা যায় না। আবার শান্তি মিশনের সাথে জড়িত পোষাকধারী সেনা, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষীদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার, যৌন নির্যাতন, শোষণ এবং অন্যান্য ধরণের অসদাচরণের অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ছ. চলাচলের সীমাবদ্ধতা

স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মিশনের বিধি বিধান, জাতিসংঘের কর্ম কৌশল বিবিধ কারণে শান্তিরক্ষার সাথে জড়িত কর্মীগণ সংঘাতপূর্ণ এলাকায় স্বাধীনভাবে অবাধ চলাচল করতে পারেন না। মাঠ পর্যায়ে শান্তি প্রক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিদের অবাধ চলাচলের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় শান্তিকর্মীদের কার্যকারিতা বিঘ্নিত হয় বা মিশনকে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, প্রয়োজনে মাঠপর্যায়ে দ্রুত সাড়া প্রদান বা বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হয় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত প্রক্রিয়াও বাঁধাগ্রস্ত হয়। আবার সহিংস গ্রুপ প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ক্রয় ও সরবরাহ আটকিয়ে দিয়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বা জাতিসংঘের সম্পত্তি ধ্বংস করতে পারে। এরকম ক্রান্তিকালীন সময়ে দ্রুত ফোর্স পরিচালনা করার জন্য জাতিসংঘের অনুসৃত দীর্ঘ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে ফোর্স মুভমেন্ট করা সম্ভব হয় না। এ সুযোগে বা সময়ের মধ্যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো অঘটন সম্পন্ন করে ফেলে। শান্তিমিশনের কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া মূলত সদর দপ্তরের DPPA/DPO বিভাগ ও চূড়ান্ত বিচারে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত হয় না। তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শান্তিকর্মীদের চলাচলের সীমাবদ্ধতাকে A4P ঘোষণায় সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব প্রদত্ত A4P কর্মসূচীর আওতায় চিহ্নিত উপরোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ অনেকটা মাঠপর্যায়ের ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রীক। চিহ্নিত এ চ্যালেঞ্জসমূহ, চলমান আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতি, আমন্ত্রিত রাষ্ট্রের

ভূ- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং জাতিসংঘের কাঠামোগত সক্ষমতার দূর্বলতা এবং বাস্তবধর্মী কার্যকর ম্যান্ডেট নির্ধারণের ব্যর্থতার দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। তেমনি শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্রসহ অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকার সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা হয়নি।

আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতির কারণে অনেক মিশনের ম্যান্ডেট গ্রহণে যেমন বৃহৎ ও স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট আমন্ত্রিত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রাজনীতি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে[২]। এ বিষয়ে একজন মূখ্য তথ্যদাতা উল্লেখ করেন, ''সুদানের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের দ্বন্দ্বের সমাধানে UNMIS মিশন গ্রহণ করা হয়। এ মিশনে ইউনাইটেড সুদানের ধারণার পরিবর্তে পূর্ব হতে দক্ষিণ সুদান পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে গঠনের জন্য সুদানকে ভেঙ্গে দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। কারণ, একত্রিত সুদান আফ্রিকার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র এবং এটি মুসলমান জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক শাসিত। আঞ্চলিক রাজনীতিতে সুদানের ক্ষমতাবলয় অনেক বিস্তৃত। কিন্তু দক্ষিণ সুদানকে যদি সুদান থেকে ভাগ করা যায় তাহলে সুদান রাষ্ট্র হিসাবে দূর্বল হবে বা আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রভাব কমবে। এছাড়া দক্ষিণ সুদানী এমিনিস্টদের পশ্চিমা সমাজের আদলে আধুনিকীকরণের নামে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার বাণিজ্যে পশ্চিমাদের প্রবেশ নিশ্চিত করবে। এটি ছিল সম্পূর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। সুদান ২০১১ সালে ভাগ হয় কিন্তু দক্ষিণ সুদানে গত এক দশকেও শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়নি। এখনও মিশন চলমান রয়েছে।"[৩] এ থেকে বলা যায়, আর্ন্তজাতিক রাজনীতির বিষয়টি মিশন বাস্তবায়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, সামজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি এবং দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত গোষ্ঠীগুলির প্রকৃতিকে মূল্যায়ণ নিয়ে সঠিক ও বাস্তবায়ন যোগ্য ম্যান্ডেট গ্রহণ করা জাতিসংঘের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। মিশনের ম্যান্ডেট যদি অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও আমন্ত্রিত রাষ্ট্রের স্বার্থ উপযোগি না হয় তা হলে অনেক সময় দীর্ঘ মিশন পরিচালনার পরও শান্তি অর্জিত না হতে পারে। তেমনি একটি মিশন কিভাবে শেষ হবে সে সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশীজন এমনকি অঞ্চলিক অংশীজনরা শান্তিরক্ষা মিশনকে জাতিসংঘের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হিসেবে দেখে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাস্তবায়ন অযোগ্য ও অস্পষ্ট ম্যান্ডেটের কারণে পশ্চিম সাহারায় দীর্ঘ দু'দশকের

বেশি সময় ধরে মিশন পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু এখনও ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেনি।

শান্তি স্থাপনে একজন শান্তিরক্ষীর মনস্তত্ত্ব, ইচ্ছা এবং আচরণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সংঘাতগ্রস্ত অঞ্চলের স্থানীয় নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক ও আস্থা অর্জনে শান্তিরক্ষীর মনস্তত্ত্ব ও আচরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী শান্তিরক্ষীদের মানসিক মনোবল ও দৃঢ়তা বজায় রাখা এবং দায়িত্ব পালনে পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা শান্তিমিশন বাস্তবায়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এরকম একটি রাজনৈতিক পরিবেশে শান্তিরক্ষা মিশনগুলো চলমান রয়েছে। অনেকটা গতানুগতিক শান্তিরক্ষা (Traditional Peace Keeping) এবং শান্তি চাপিয়ে দেওয়া (Peace Enforcement) এ দু'ধরনের মিশনের মধ্যে মিশনগুলি চলমান[৪]। *শান্তি*মিশনের মৌলিক নীতি[১] মেনে নিয়ে এরকম একটি সংঘাতে লিপ্ত সমাজে অবস্থান করে সহিংস গ্রুপগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা, সমঝোতা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা একজন শান্তিরক্ষীর জন্য মানসিকভাবে অনেক বেশী কষ্টসাধ্য কাজ। অথচ, জাতিসংঘের মূল্যায়ণে (A4P) ব্যক্তি শান্তিরক্ষীর (সৈনিক, ট্রুপস ও কমান্ডিং অফিসার) মনস্তাত্ত্বিক এ দিকটি উপেক্ষা করা হয়েছে।

সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোতে সহিংস দলগুলো ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র সহিংসতা এবং শান্তিরক্ষীদের উপর আক্রমণ মাঠপর্যায়ের শান্তিরক্ষীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, শান্তিরক্ষীরা আত্মরক্ষা ছাড়া অস্ত্র ব্যবহার করতে না পারার কারণে অনেক সময় প্রথম আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে শান্তিরক্ষীদের। আবার অনেক সময় শান্তিরক্ষী তার মানসিক দৃঢ়তা ধরে রাখতে না পেরে ক্ষমতা ও অস্ত্রের অপব্যবহার করেছে। উভয় দিকই মিশনের ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন তথা শান্তি অর্জনের প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করে। এজন্য সামরিক বিশেষজ্ঞগণ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী শান্তিরক্ষীদের মানসিক দৃঢ়তা ও মনস্তাত্ত্বিক মানবিক দৃঢ়তা নিশ্চিত করাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করে[৫]। শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের ইতিহাস, সৈনিকদের দেশপ্রেম, পেশা হিসেবে বাহিনীতে যোগদানের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ও আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো এখানে শান্তিরক্ষীর মনস্তাত্ত্বিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে[৬]।

[১] সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রের সম্মতি, সংঘাতে লিপ্ত রাষ্ট্র/পক্ষগুলির সাথে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত অস্ত্রের ব্যবহার না করা।

একজন মুখ্য তথ্যদাতা উল্লেখ করেন যে, "পশ্চিমা রাষ্ট্রের সৈনিকরা মূলত তিনটি কারণে বাহিনীতে যোগদান করে – পারিবারিক ঐতিহ্য (বাপ দাদা সেনাবাহিনীতে ছিল এজন্য সেও সেনাবাহিনীতে এসেছে), অস্ত্র চালানোর শখ এবং অল্প কয়েক বছরের জন্য রোমাঞ্চকর পেশা। এর বিপরীতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে (প্রথম সারির শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলো) একজন সৈনিক প্রধানত দেশপ্রেম, মানুষকে সেবা দানের মানসিকতা এবং একটি সুশৃংখল পেশা হিসেবে বাহিনীতে যোগদান করে। ফলে দেখা যায়, এসব দেশের একজন সৈনিকের যখন সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে শান্তিরক্ষী হিসেবে যায়, সেখানে সে চেষ্টা করে মানবিক ভাবে মানুষের সেবা করতে এবং নিজের দেশের সুনাম বজায় রাখতে। এজন্য আমাদের (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল) ট্রুপসগুলো অনেক বেশি সফলতা অর্জন করছে শান্তিমিশনে"[৭]।

সামরিক সদস্যদের অসদাচরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার শান্তিমিশনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। আর্ন্তজাতিক শান্তিরক্ষীদের অসদাচরণের প্রকৃত উদাহরণ হলো- কম্বোডিয়া। শান্তিরক্ষীদের একাংশ কর্তৃক স্থানীয় জনসাধারণের সাথে ক্ষমতার অপব্যবহার, কালোবাজারি, দেহ ব্যবসার সাথে জড়িত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে[৮]। ইরাক ও আফগানিস্তানে শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে[৯]। এছাড়া শান্তিমিশনের দূর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে মিশন বাস্তবায়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়। কম্বোডিয়া ও সোমালিয়ায় শান্তি মিশনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ রয়েছে[১০]।

শান্তিরক্ষা মিশনের অপর বড় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে মিশনের প্রকৃতির পরিবর্তন। গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন শান্তিরক্ষীদের ব্লু হেলমেট ও জাতিসংঘ পতাকা এখন অনেক ক্ষেত্রে নাগরিক সুরক্ষা প্রদানে গ্যারান্টি দিতে পারেনা। কেননা শান্তিমিশন এখন গতানুগতিক শান্তিরক্ষার যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা বা শান্তি স্থাপনের ধারণার চেয়েও বেশি কিছু। এ জন্য জাতিসংঘের সংস্কার প্রয়োজনের কথা বলা হয়। গবেষণায় দেখা যায় ১৯৪৮ হতে ২০১৭ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি শান্তিরক্ষী মিশনে আক্রমনের শিকার হয়ে নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৯৪৩জন শুধুমাত্র সহিংসতায় (violence) নিহত হয়েছেন। বিগত ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত চার বছরে সহিংসতার কারণে এ মৃত্যু হার বৃদ্ধি পেয়েছে, এ সময়ে ১৯৫ জন শান্তিরক্ষী মারা যায়[১১]। পরিবর্তিত সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষীদের উপর আক্রমণ ও হতাহতের কারণ হিসেবে

জাতিসংঘ এবং শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ কর্তৃক চারটি বিষয়ে সংস্কার বা পরিবর্তনের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করা হয়[১২]। বিষয়গুলো হলো- মিশনের নেতৃত্ব, মিশন অপারেশনের আচরণ (opertional behaviour), ফোর্সের ব্যবহার এবং শান্তি মিশনের মূলনীতি। জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস নিউইয়র্ক থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে সহিংসতা বা আপদকালীন তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময়ক্ষেপন হয়। আবার শান্তিমিশনের মূলনীতি অনুসারে ট্রুপস আক্রমনের শিকার হলে তখনই অস্ত্র চার্জ করতে পারে। যদিও বর্তমানে ফোর্সেস পুলিশ ইউনিটের অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু নিয়মিত পুলিশ, সেনা ও একক সামরিক কর্মকর্তাগণ আগ বাড়িয়ে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন না। যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া খুবই কাঠামোগত সুনিয়ন্ত্রিত ও প্রসিডিওরাল হয় তখন মাঠ পর্যায়ে সময়মতো সঠিক ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাঁগ্রস্ত হয় যা সামগ্রিকভাবে মিশনের নিরাপত্তাকে ব্যাঘাত ঘটায়।

কোন কোন গবেষক জাতিসংঘের শান্তিমিশনের চ্যালেঞ্জগুলোকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে চিহ্নিত করেছেন। রাজনৈতিক, সামরিক ও মানবিক চ্যালেঞ্জ। রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের ধারাবাহিক সম্মতির ঘাটতি, সংঘাত পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আর্ন্তজাতিক আর্থিক ও রসদ যোগানের ঘাটতি।

শান্তি মিশনের অপর গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থন বজায় রাখা। আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্র কর্তৃক শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রকৃত সমর্থন না পাওয়া গেলে এবং ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে সমর্থন ও অংশগ্রহণ না থাকলে কোন মিশন ম্যানেজমেন্টের পক্ষে মিশন সফল করা সম্ভব নয়। কার্যকর সম্মতি না থাকলে মিশনের কার্যকর ও সুস্পষ্ট সমাপ্তিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না। কেননা মিশন সমাপ্তিতে সকল দায়িত্বই সরকারি কর্তৃপক্ষকে নিতে হয়[১৩]। ১৯৬৭ সালে মিশরীয় সরকার কর্তৃক 'United Nations Emergence Force-1' মিশনে সমর্থন তুলে নেয়ার কারণে সীমান্তরেখার ইসরাইলের পাশে জাতিসংঘের সৈন্য মোতায়েনের অনুমতি দিতে ইসরাইলের সম্মতি পেতে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছিল[১৪]। কিংবা ২০১০ সালে কঙ্গো মিশনে কঙ্গোর ক্ষমতাশীন সরকার কর্তৃক সমর্থন প্রত্যাহারের কারণে কঙ্গো দ্বন্দ্ব দীর্ঘায়িত হয়।

আবার সংঘাত পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে মিশন বাধাগ্রস্ত হয় যেমন – সোমালিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে মিশনে সংকট তৈরি হয়। সংঘাতপরবর্তী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার কারণে অবকাঠামো, যোগাযোগ, পরিবহণ ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং চূড়ান্তভাবে সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন সাবেক যুগাস্লাভিয়া প্রজাতন্ত্র, কম্বোডিয়া ও হাইতিতে জাতিসংঘ মিশনে এ সত্যতা পাওয়া যায়[১৫]।

আর্থিক ও রসদগত ঘাটতির কারণে সামগ্রীকভাবে মিশন বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। পরাশক্তির রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক ও আর্থিক সমর্থন মিশন বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটক। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অর্থায়নের বিষয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে চরম মতেভেদ রয়েছে[১৬]। আর্ন্তজাতিক শান্তি ইনিস্টিটিউটের (২০১৯) এর মতে[১৭], 'জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দেরিতে ফি প্রদান এবং তাদের প্রতিশ্রুত আর্থিক সমর্থন প্রত্যাহারের কারণে জাতিসংঘ শান্তিমিশন নগদ অর্থ প্রবাহের সংকটে রয়েছে। ২০১৬ সাল হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আর্থিক সহায়তার অংশ বিশেষ প্রত্যাহারের কারণে শান্তিমিশন সঠিক সময়ে মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি এবং কোন কোন মিশনে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাধাঁ গ্রস্থ হয়'। বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যদের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক, কারিগরি ও রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া কোন শান্তিমিশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়নি[১৮]।

আবার, রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমর্থনের ঘাটতির কারণে সংঘাতপরবর্তী নিরস্ত্রীকরণ ও বিদ্রোহীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেমিশন কতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করবে তার অস্পষ্টতা ও রাজনৈতিক সমর্থনের ঘাটতির কারণে হাইতি ও সোমালিয়ায় শান্তিমিশন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়[১৯]।

অপর দিকে, শান্তিমিশনের সামরিক দিকটি কোন কোন মিশনে বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। শান্তিরক্ষীরা কোন যুদ্ধ বাহিনী নয়, তারা কেবল পূর্বে সম্মত যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করে। শান্তিরক্ষীরা একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সাথে কাজ করে। তারা কোন কর্তৃপক্ষ নয় যে শান্তির জন্য বিদ্রোহী গ্রুপকে দেখলেই অস্ত্রের ব্যবহার করবে। ফলে, শান্তিমিশন গণহত্যা বা মানবাধিকার রক্ষায় অনেক সময়

ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় শান্তিমিশন চলাকালীন অবস্থায় এক মাসে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর হাতে ৮ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বসনিয়ায় মুসলিম অধ্যুষিত শহর স্রেব্রেনিকা সার্ব মিলিশিয়াদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এ সময় ৮ হাজার মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয় জাতিসংঘের শান্তিমিশনের চোখের সামনে[২০]। মানবাধিকার নিশ্চিতে শান্তিমিশনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯২ সালে সোমালিয়ায় সরকার ভেঙে পড়ে এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়। এ সময়ে প্রচন্ড খরায় প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন সোমালিয়ান অনাহার ও রোগের সম্মুখীন হয়। অথচ ঐ সময়ে জাতিসংঘের শান্তিমিশন সোমালিয়ায় চলমান ছিল[২১]।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় অভিযোগটি হলো নব্য সাম্রাজ্যবাদ। বলা হয়ে থাকে জাতিসংঘ শান্তিমিশনের আড়ালে মূলত বৃহৎ শক্তিগুলোর সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী ঔপনিবেশিকতা লোপ পেলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো উন্নয়ন, গণতন্ত্র কিংবা আধুনিকতার মোড়কে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ করছে তা নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মাধ্যমে এ ধারার তাত্ত্বিকগণ গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে প্রকাশ করেন। কিন্তু, ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তীতে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অন্তরালে পরাশক্তি ও পশ্চিমা সাবেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের আধিপত্য টিকিয়ে রেখেছে। এক্ষেত্রে তারা আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তিমিশনের ম্যান্ডেট, কর্মপন্থার মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করে। একজন মূখ্য তথ্যদাতা মন্তব্য করেন যে, ইউনাইটেড সুদান থেকে দক্ষিণ সুদানকে ভাগ করে পৃথক রাষ্ট্র করার পিছনে ক্রীড়ানক হিসেবে কাজ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ সুদানের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তার মূল লক্ষ্য[২২]। পরাশক্তি বা ধনী রাষ্ট্রগুলো মিশনে সেনা প্রেরণ করে না, তাদের সেনারা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসহ উচ্চস্তরে কাজ করে। মাঠ পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শান্তিরক্ষীদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে। বিপরীতে শান্তি মিশনের অর্থায়নে মূখ্য অর্থ দাতা রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে। নিচের টেবিলে (টেবিল ৬.১) দেখা যায়, প্রধান অর্থ দাতা রাষ্ট্রগুলো শান্তিরক্ষী প্রেরণে নিচের দিকে রয়েছে। এর মাধ্যমে উন্নত এ রাষ্ট্রগুলো তাদের সেনাদের সহিংসতার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে না, তেমনি মানবাধিকার প্রশ্নে নিজেদের জনগনের নিকট জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। অথচ, আর্থিক সাহায্য ও রসদ সরবরাহের মাধ্যমে শান্তিমিশনের মাধ্যমে তথা জাতিসংঘের নীতি নির্ধারণে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে এবং সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে

সফল হয়। শান্তিস্থাপন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলে দশকের পর দশক ধরে ঐসব সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে মিশন পরিচালনার মাধ্যমে নিজেদের নব্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, দক্ষিণ সুদানে স্বাধীনতার এক দশকে এখনও মিশন পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু গণতান্ত্রিক উত্তরণ না হয়ে বরং নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘকে নব্য সাম্রাজ্যবাদী এ অপবাদ হতে নিজেদেরকে বের হয়ে আসতে হবে, এজন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

টেবিল-৬.১

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে প্রধান অর্থদাতা দেশগুলোর বিপরীতে প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর অবস্থান

প্রধান অর্থ প্রদানকারী রাষ্ট্র (ক্রম অনুসারে)	শান্তি মিশনে প্রেরণকৃত সৈন্য (জন)	প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র (ক্রম অনুসারে)	শান্তি মিশনে প্রেরণকৃত সৈন্য (জন)
যুক্তরাষ্ট্র	৩২	বাংলাদেশ	৬৪৩৫
ডেনমার্ক	১৩	ভারত	৫৫০৬
রাশিয়া	৭৪	ইথিওপিয়া	৫৪৭৮
সুইডেন	২৩৪	নেপাল	৫৪৪৩
যুক্তরাজ্য	৫৩২	রুয়ান্ডা	৫১১২
ফ্রান্স	৬০৮	পাকিস্তান	৩৮৩৭

সূত্র : জাতিসংঘ শান্তিমিশনের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ www.peacekeeping.un.org হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত, প্রবেশ ১৩ ডিসেম্বর, ২০২১ ।

৬.২ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও উত্তরনের উপায়

শান্তিমিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ নিরূপণে A4P দ্বারা নির্ধারিত জাতিসংঘের শান্তি মিশনের বর্তমান (২০২১-২০২৩) কর্মপন্থা, লক্ষ এবং ভিশন ২০৩০ এর আলোকে আমরা বাংলাদেশের সক্ষমতা, দুর্বলতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ধারণের চেষ্টা করবো। কেননা, বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষরিত এ কৌশল ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আগামী মিশনগুলোতে সেবা দিতে হবে। এ জন্য প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আলোচনার সাথে সাথে এ থেকে উত্তরণের কৌশল

আলোচনা করা হয়েছে। এ লক্ষে প্রথমে A4P কর্তৃক নির্ধারিত শান্তি মিশনের লক্ষ আলোচনা করা হলো।

বৈশ্বিকভাবে চিহ্নিত ও আলোচিত উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণের জন্য A4P 'র সুপারিশে মিশন গঠনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে শুরু করে মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল অংশীজনের সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এ উদ্যোগে চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও লক্ষ্য হিসেবে মোট ৮টি বিষয়ের আওতায় ৪৫টি প্রতিশ্রুত লক্ষ্য স্থির করা হয়। বিষয়গুলো হলো –

১. সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানে সচেষ্ট হওয়া এবং শান্তিরক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করা (To advance political soluations to conflict and Enhance the Political impact of Peacekeeping);

২. নাগরিক সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ (Strengthening the protection by Peacekeeping operation);

৩. নারী শান্তি ও নিরাপত্তা (Women Peace and security);

৪. শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বৃদ্ধি করা (Improve Safety and Security of Peacekeepers);

৫. শান্তিরক্ষায় জড়িত সকল অংশীজন/এজেন্সির জবাবদিহিতা ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতকরণে সহায়তা (To support effective performance and accountibility by all Peacekeeping Components);

৬. শান্তিস্থাপন ও টেকসই শান্তি শক্তিশালীকরণ (Peace building and to strength the impact of Peacekeeping on Sustaining Peace);

৭. শান্তিরক্ষায় অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা (To improve Peacekeeping Partnership);

৮. শান্তিরক্ষী ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আচরণবিধি শক্তিশালীকরণ (To strength the Conduct of Peacekeeping Operations and Parsonnel) ।

নিম্নের টেবিলে উপরোক্ত ৮টি বিষয়ের আওতায় শান্তিমিশনের টেকসই ও কার্যকর রূপান্তরে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও লক্ষ্যসমূহ দেখানো হলো –

টেবিল ৬.২: জাতিসংঘ শান্তিমিশনের ভবিষ্যৎ (২০২১-২৩) কর্মপন্থা ও প্রতিশ্রুত লক্ষ্য

আওতা/ক্ষেত্র	ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও প্রতিশ্রুত লক্ষ্য
রাজনীতি (Politics)	▪ রাজনৈতিক সমাধানে অগ্রাধিকার; ▪ সংঘাতগ্রস্থ রাষ্ট্রের ও অঞ্চলিক রাজনীতির কৌশল নির্ধারণ; ▪ দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ, শক্তি বজায় রাখা এবং স্থিতিশীল শান্তির জন্য তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ।
নারী শান্তি নিরাপত্তা (Women Peace security)	▪ শান্তি স্থাপনের সকল পর্যায় ও শান্তি টেকসইকরণে নারীর সমান অর্থপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ
নাগরিক সুরক্ষা (Civilion Protection)	▪ সামাজিক ইউনিটগুলোর জোরালো মূল্যায়ণ; ▪ কমিউনিটি অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণ; ▪ দ্বন্দ্বকে উৎসাহিত করে এমন অপরাধের তদন্ত ও বিচারের জন্য জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
নিরাপত্তা ও সুরক্ষা (Safety and Security)	▪ শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা উন্নত করণে কর্ম পরিকল্পনা নৈমিত্তিক ও চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষমতা; ▪ পরিস্থিতিগত সচেতনতার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার; ▪ সম্ভাব্য হুমকি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা; ▪ শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
ক্ষমতা ও জবাবদিহিতা (Power and Accountibility)	▪ সমন্বিত কর্মক্ষমতা নীতিকাঠামো ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ; ▪ সেনা ও পুলিশের অপারেশনাল প্রস্তুতি যাচাই এবং কর্মক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহার; ▪ প্রশিক্ষণ ও সরংঞ্জাম জোরদারকরণ;
আচরণ (Code of Conduct)	▪ যৌন অপরাধে জিরো টলারেন্স নীতি; ▪ যৌন নিপীড়ণ ও নির্যাতন দূর করার অঙ্গীকার; ▪ মানবাধিকার চর্চা; ▪ পরিবেশগত কৌশল অনুসরণ।
অংশীদারিত্ব (Partnership)	▪ রাজনৈতিক প্রচেষ্ঠায় জাতিসংঘ ও আফ্রিকান ইউনিয়নে সহযোগিতা; ▪ আফ্রিকান ইউনিয়নের শান্তি কর্মসূচি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; ▪ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; ▪ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে অংশীদারিত্বের জোরদারকরণ।
শান্তি স্থাপন ও শান্তি বজায় রাখা (Peace building & Sustaining Peace)	▪ শান্তি প্রতিষ্ঠায় অংশীদারদের সাথে অংশীদারিত্ব; ▪ সমন্বিত রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সম্পর্কের কৌশল; ▪ ন্যায় বিচার ও আইনের শাসনের বৈশ্বিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করা।

সূত্র: শান্তিরক্ষার মূল এজেন্ডা, UN.org/A4P, প্রবেশ ২৩ নভেম্বও, ২০২১।

সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্বের উপর শান্তিমিশনের প্রভাব

বাংলাদেশের সামরিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ প্রচণ্ড রকম প্রভাব রেখেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং ডিসকোর্সে শান্তি ভিত্তিক মডিউল এবং যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রকাঠামো তৈরির বিষয়সমূহ স্থান করে নিয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে এই বিষয়গুলো সাধারণ 'জাতীয়' নিরাপত্তা এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির ধারণা থেকে 'মানব নিরাপত্তা' ধারণার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এই বিষয়সমূহ স্বাভাবিকভাবে সেনাবাহিনীর প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়[২৩]। ফলে অনেকে আজ মনে করেন শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অংশগ্রহণের পর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহ্যগত জাতীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ও শান্তিরক্ষা এ দুই ভূমিকার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনয়ন প্রয়োজন[২৪]। দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ যুদ্ধকালীন দায়িত্বের ওপর শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের প্রভাব কেমন তা নিয়ে এখন পর্যন্ত অতি সামান্য কিংবা একেবারেই কোনো চিন্তাভাবনা লক্ষ করা যায় না।

সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব

শান্তিরক্ষার বিষয়টি প্রতিরক্ষা বাজেট তৈরি এবং সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব রেখেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার সঙ্গে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের একটি অস্ত্র ক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ রাশিয়ার কাছ থেকে বৃহদাকার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার, যুদ্ধ প্রশিক্ষক বিমান, পন্টুন সেতু, ব্যক্তিগত সাঁজোয়া যান এবং ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় করবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এই ক্রয়কে শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করে এবং কারণ হিসেবে বলা হয় যে বিশ্বের যেসব সংঘাতময় এলাকায় শান্তিরক্ষীরা কাজ করছে সেখানে বিবদমান সশস্ত্র দল কিংবা জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে তা বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ব্যবহৃত অস্ত্রের তুলনায় বেশি আধুনিক[২৫]।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের নতুন অস্ত্রের অধিগ্রহণ জাতিসংঘের মিশনগুলোতে নিয়োজিত বাংলাদেশি কন্টিনজেন্টদের প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ এবং দায়িত্ব পালনে বিশেষ ভূমিকা প্রালন করবে। তথাপি এই ধরনের ক্রয় সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের জন্য উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা

বাংলাদেশে একটি ব্যাপক মতৈক্য বিদ্যমান যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে অংশগ্রহণের ফলে দেশের সশস্ত্রবাহিনীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা হ্রাস পেয়েছে, এই মত সর্বজন গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালে সেনাবাহিনী পরোক্ষভাবে তৎকালীন সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরিয়ে পছন্দসই বিকল্প অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। ওই সময় সেনাবাহিনী সক্রিয়ভাবে একটি অরাজনৈতিক মন্ত্রিসভা গঠনে সহায়তা প্রদান করে, যার মূল লক্ষ ছিল সব রাজনৈতিক দলের জন্য একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা। এই পুরো প্রক্রিয়াতে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং সম্পূর্ণ মেয়াদটি বাংলাদেশের ভঙ্গুর বেসামরিক শাসনের উপর সেনাবাহিনীর আধিপত্যের একটি নিদর্শন ছিল[২৬]। বিশেষ করে 'মাইনাস টু'[২] তত্ত্বের আলোকে প্রধান দু'দলের দু'নেত্রিকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। যদিও সেনা সমর্থিত তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ২০০৭-২০০৮ সালে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা এবং প্রভাব সম্পর্কে নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। সামরিক বাহিনীর ওপর জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণও হ্রাস পাচ্ছে, যার উদাহরণস্বরূপ প্রতিরক্ষা বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিষ্ক্রিয় ভূমিকাকে উল্লেখ করা যায়[২৭]। উপরন্তু, বেসামরিক প্রশাসন এবং কার্যক্রমে সামরিক ব্যক্তিদের উপস্থিতি ১৯৭৫-৯০ সালের সামরিক স্বৈরাচারী যুগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়নি। এসবের ফলে বাংলাদেশে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের মধ্যে ঐতিহ্যগত বিভাজন ক্রমাগতভাবে এক ধরনের অস্পষ্টতায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছে[২৮]। যা গণতান্ত্রিক সরকারের প্রশাসনের জন্য হুমকি হতে পারে।

সেনা নিয়ন্ত্রিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

শান্তিমিশনে ট্রুপস প্রেরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি সশস্ত্রবাহিনী দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জাতিসংঘ মিশনগুলোতে ক্রমবর্ধমান বহুমুখী কারণে যেভাবে বেসামরিক বিশেষজ্ঞের ব্যবহার বাড়ছে, তা এই সিদ্ধান্ত প্রণয়ণ-প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এ পরিবর্তন বাংলাদেশের বর্তমান অংশগ্রহণের প্রকৃতিকে

[২] ৩০০৬-০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বাংলাদেশের প্রধান দু'দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর সভানেত্রি শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে বন্দি এবং রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেস্টাকে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে 'মাইনাস টু' তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করবে। বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে এখনই এ বিষয়গুলো অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

শান্তিমিশনে অর্জিত অর্থের বিলাসী বিনিয়োগ

শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে অর্জিত অর্থ দেশের বিদ্যমান বৈদেশিক অর্থের প্রবাহে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং দেশীয় অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর স্থাপন করে। এতদসত্ত্বেও জাতীয় অর্থনীতিতে শান্তিরক্ষা মিশনের প্রভাব সঠিকভাবে চিহ্নিত করা বেশ দুরূহ। সাবেক শান্তিরক্ষীদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায়, মিশনসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ অনেক সময় অর্থনৈতিকভাবে অনুৎপাদনশীল খাত যেমন: বিলাসী ভোগ্যপণ্য ক্রয়, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং উচ্চ মুনাফার আশায় পুঁজিবাজারে লগ্নি করা হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এই দুই বাহিনীর অফিসার ও সদস্যরা শান্তি মিশনগুলোতে অংশগ্রহণে আগ্রহী, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুমতি বা সুযোগ বাংলাদেশ সরকার প্রদান করেনি। প্রশ্ন জাগে, যদিও এই দুই বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষ ও সুশৃঙ্খল, তবু সরকারের এই অবস্থান ভবিষ্যতে হয়তো এই দুই বাহিনীর মনোবল ও কর্মক্ষমতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

ঘরোয়া রাজনীতির প্রভাব

বাংলাদেশের ঘরোয়া রাজনীতির মারপ্যাঁচে শান্তিরক্ষা ইস্যু আটকে পড়ার আশঙ্কাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেখা যায়, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডে সরকার কর্তৃক বাহিনীর ব্যবহার এবং এর সমালোচনায় সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে বিরোধী দলগুলোর বিদ্রূপ মন্তব্য শান্তিমিশনে বাহিনীর অংশগ্রহণকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। সম্প্রতি দেশের প্রাক্তন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দাবি করে যে তার দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত পুলিশি অভিযানের ফলে জাতিসংঘ মিশনসমূহে বাংলাদেশি পুলিশ সদস্যদের মোতায়নের ব্যাপারে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে[২৯]। অপরদিকে সরকারি দল আওয়ামী লীগ এ আশঙ্কা নাকচ করে দিয়ে দাবি করে প্রকৃতপক্ষে মিশনসমূহে বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে[৩০]। সরকারি দল থেকে জানানো হয় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে আরো অধিক সংখ্যক শান্তিরক্ষী

প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছে আসছে। রাজনৈতিক দলগুলোর এসব দাবি এবং পাল্টা দাবি এটি প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের হিংসাত্মক ও ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক বাস্তবতার ফলে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ যেকোনো সময় দলীয় রাজনৈতিক সংকীর্ণতা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেন[৩১]। শান্তিমিশনে অংশগ্রহণের বিষয়টি এভাবে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হলে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের টেকসই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হুমকির মধ্যে পড়বে।

সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমে আলোকপাত না হওয়া

শান্তিরক্ষামিশনে অংশগ্রহণ নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা ও তার প্রচারের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তার অভাব প্রচণ্ডভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার আন্তঃবিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি রাজনৈতিক দল এ বিষয়টিকে জাতীয় গর্বের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-নিয়ন্ত্রিত থিঙ্ক ট্যাংক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ২০১০ সালে এ বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করে[৩২] এবং কিন্তু পরবর্তী এক দশকে এ নিয়ে আর কোন আলোচনা বা ফলোআপ অধ্যয়ন লক্ষ্য করা যায় না। সরকারি এ থিঙ্ক ট্যাংকের বাহিরে আর কোন বেসামরিক প্রতিষ্ঠানকে এ নিয়ে অধ্যয়নের আগ্রহ দেখা যায় না, এর ফলে নিরপেক্ষ যায়গা হতে বাহিনীসমূহ এবং সরকার শান্তিমিশনকেন্দ্রিক গঠনমূলক সমালোচনা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ, পার্শ্ববর্তী এবং শান্তিরক্ষী প্রেরণে প্রতিযোগী দেশ ভারতে এ বিষয়ে একাধিক বেসরকারি ও সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান নীতিগত পরামর্শ দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বর্তমান উত্থান নিঃসন্দেহে একটি বড় বিবেচনার বিষয়। নিয়মিতভাবে মিডিয়াতে জাতিসংঘ শান্তিমিশনের শুধু ইতিবাচক দিকগুলো গুরুত্বর সঙ্গে প্রচারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এ বিষয়ে মিডিয়াগুলোকে কখনোই তেমন সমালোচকের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় না। বছরান্তে বিশ্ব শান্তিরক্ষা দিবসে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ প্রদত্ত ক্রোড়পত্র ছাপা এবং নির্দিষ্ট দিনে টিভি মিডিয়ায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু মিশনের প্রকৃতি পরিবর্তন বা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে মিডিয়াগুলোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লক্ষ্য করা যায় না। এরকম মিডিয়ার নিরবতা শান্তিমিশন নিয়ে অভ্যন্তরীণ

রাজনীতিতে এবং অন্যান্য বাহিনী (আনসার বাহিনী) ও প্রতিষ্ঠানের (প্রশাসন, বিচার, বেসরকারি খাত) মধ্যে তথ্যের ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। যা দীর্ঘমেয়াদি টেকসই শান্তিমিশনে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

আঞ্চলিক সংগঠনের উপস্থিতি

আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এখন বিশ্ব রাজনীতির একটি অত্যাবশ্যকীয় ধারা। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়সমূহে আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বেশিরভাগ শান্তিমিশন আফ্রিকা মহাদেশে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং এই মহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ খুব স্বাভাবিকভাবেই চাচ্ছে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক সংগঠন, বিশেষ করে আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক সংগঠন এই অঞ্চলের সংঘাতময় পরিস্থিতিতে গঠনমূলক ও প্রধান ভূমিকা পালন করুক। সুদানের দারফুর অঞ্চলে জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের যৌথ মিশন (২০০৭) এবং বর্তমানে মালিতে পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের করণীয় কী হতে পারে এবং এ ধরনের হাইব্রিড মিশনসমূহে বাংলাদেশের কতটুকুই বা দেওয়ার আছে, এ প্রশ্নের আলোকে বাংলাদেশের সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ

জাতিসংঘ ক্রমেই শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত বহুবিধ বিষয় বেসরকারি খাত, বিশেষ করে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করছে[৩৩]। উদাহরণস্বরূপ আরমোর গ্রুপ, রোনকো কনসালটিং এবং ডাইনকর্প ইন্টারন্যাশনাল মাইন অপসারণে শান্তিরক্ষা মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাইন অপসারণ প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যবসা এবং এ রকম লাভজনক খাতের ব্যাপারে বেসরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ খুব একটা অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়[৩৪]। এরকম দক্ষ, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন পশ্চিমা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা ভবিষ্যতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

জাতীয় শান্তিরক্ষা নীতিমালার অনুপস্থিতি

বাংলাদেশের নিজস্ব কোন জাতীয় নীতিমালা না থাকার কারণে অনেক সময় বাংলাদেশকে মিশনে সৈন্য প্রেরণে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়। আঞ্চলিক অবস্থান, ধর্মীয় অনূভূতি কিংবা ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে শান্তি মিশনে অংশ নেয়া নিয়ে বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরূদ্ধে কোনো শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ দুঃসাধ্য। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের একটি নিজস্ব জাতীয় শান্তিরক্ষা নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন। যেমন, ইরাক কিংবা আফগানিস্তান মিশনে সেনা প্রেরণ নিয়ে পরিস্থিতির কথা বলা যেতে পারে।

বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড

বাংলাদেশ নিরাপত্তাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য এলাকায় জাতিগত সংখ্যালঘু এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও অন্যদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকে – এ ধরনের অভিযোগ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের প্রতি করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের সাত খুন হত্যাকাণ্ড এবং সাম্প্রতিক কক্সবাজারে মেজর (অব.) সিনহা হত্যাকাণ্ডে সশস্ত্র ও পুলিশবাহিনীর সম্পৃক্ততা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সত্যতা মিলে। শান্তিমিশনে একজন সদস্য নিয়োগের পূর্বে ঐ সদস্যের বা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস দেখা হয়, অভিযোগ পেলে শান্তিরক্ষী হিসেবে নির্বাচন করা হয় না। বাংলাদেশের সশস্ত্র ও পুলিশবাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে[৩৫]। এ বিষয়টি আঞ্চলিক প্রতিযোগি শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র বা কোন মানবাধিকার গোষ্ঠী উত্থাপন করে ফায়দা নিতে পারে।

মানবাধিকার

সেনা প্রেরণকারী রাষ্ট্র (Troop contributing country, TCC) বা পুলিশ প্রেরণকারী রাষ্ট্রে (Police Contributing country, PCC) স্থায়ী শান্তি এবং সমাজে আইনের শাসনের উপস্থিতি এবং এ দু'য়ের মধ্যকার সম্পূরক সম্পর্কটি যত বেশি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দেশ হতে তত বেশি বাহিনীর সদস্যদের জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে এবং পদে নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের মতো দেশের

জন্য এরকম শর্ত বা পরিস্থিতি একদিকে যেমন এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়, ঠিক তেমনি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেও আবির্ভূত হতে পারে। সম্ভাবনা এই কারণে যে বাংলাদেশের পুলিশ সদস্যরা ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত হয়ে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে নিজ বাহিনী ও দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে। তবে এই সম্ভাবনার জন্য একটি বড় অন্তরায় হলো বেশিরভাগ রাষ্ট্রই পুলিশ সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখে থাকে। আমন্ত্রণকারী প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজস্ব আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদা সচেতন থাকে এবং তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষ ও পেশাদার পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। বর্তমানে মানবাধিকার বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো সংবাদ তথ্যপ্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের কারণে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের একাংশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনে ক্ষমতার অপব্যবহার, হেফাজতে মৃত্যু, গুমসহ মাদক ও চোরাচালানির মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ১০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশের বর্তমান পুলিশ প্রধানসহ ছয় জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) কে কালো তালিকাভুক্ত করে[৩৬]। এরকম অবস্থায় বাংলাদেশের পুলিশ ও সরকারকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো অত্যন্ত দক্ষভাবে এবং দ্রুত মোকাবিলা করতে হবে এবং এই বিষয়গুলো যেন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয়ে পুলিশ সদস্যদের সেনা সদস্যদের মতো শান্তিরক্ষার বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ খুবই প্রয়োজন। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের জন্য শান্তিমিশন কেন্দ্রিক এখনো কোন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিংয়ের (বিপসট) মতো বাংলাদেশের পুলিশ সদস্যদের জন্য একটি আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা এবং তার মাধ্যমে দক্ষ প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জিং মিশনসমূহে পুলিশের নিয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত ও গভীরভাবে ভাবতে হবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও শান্তি মিশনে প্রভাব

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বিভিন্ন দেশের ১৫ ব্যক্তি ও ১০ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে মার্কিন রাজস্ব দপ্তর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার[৩৭] ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ৯ ডিসেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে পৃথকভাবে এ নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট (রাজস্ব বিভাগ) ও পররাষ্ট্র দপ্তর[৩৮]। নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচার বহির্ভূত হত্যার অভিযোগ করা হয়। ২০১৮ সালের মে মাসে কক্সবাজারের টেকনাফে পৌর কাউন্সিলর একরামুল হককে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে সম্পৃক্ততার জন্য বর্তমান র‍্যাব প্রধান এবং পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়[৩৯]। প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ও নিষেধাজ্ঞা জতিসংঘ শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণে কোন প্রভাব পড়বে কি না? শান্তি মিশনে সদস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা হয় ঐ সদস্য কোন ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত কি না। এখানে প্রতিষ্ঠান হিসেবে র‍্যাবের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে সাধারণ র‍্যাব সদস্যগণের ভবিষ্যতে মিশনে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যগণ (পুলিশ, আনসার, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী) প্রেষণে নিদিষ্ট সময়ের জন্য র‍্যাবে নিযুক্ত হন, মেয়াদ শেষে স্ব স্ব বাহিনীতে ফিরে যান। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে র‍্যাব সদস্যদের মাধ্যমে সকল বাহিনীর উপর এ নিষেধাজ্ঞার প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে শান্তি মিশনে সদস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা রয়েছে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে বাংলাদেশ থেকে সদস্য প্রেরণে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে।

চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিরক্ষা কৌশল

বর্তমানে শান্তিরক্ষা মিশন অনেকটা উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর। রোবট, আর্টিফিশিয়াল বুদ্ধিমত্তা, উপগ্রহের ব্যবহার শান্তিমিশনকে অনেকটা কৌশলগত ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সেনা ও পুলিশ সদস্যদের কারিগরি জ্ঞান, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও ব্যবহারের সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে। এসব দিক হতে পিছিয়ে পড়লে আগামীতে শান্তিমিশনে অংশগ্রহণের সক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সক্ষমতা, বিশেষ করে এর অস্ত্র ভাণ্ডার ও

অন্যান্য উপকরণের বহর হয়তো সনাতন নয় কিন্তু ভবিষ্যতের শান্তিরক্ষা মিশনের প্রকৃতি অনুযায়ী তা প্রস্তুত কি না এ বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

জাতিসংঘের বিধিমালা অনুসারে দেখা যায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের দায়িত্ব সরাসরি শান্তিরক্ষীদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। আইনী কাঠামো তৈরি, প্রশাসন, বিচার কাঠামো ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে বিভিন্ন সংস্থার বেসামরিক বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেন। বাংলাদেশকে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় আমলা, বিচারক, আইনজীবী, কূটনীতিক, এনজিওকর্মীসহ বেসামরিক শান্তিকর্মী নিয়োগে জাতিসংঘের সাথে তৎপরতা চালাতে হবে। ২০২১ সালে প্রথম বারের মতো তিনজন বিচার ক্যাডারের কর্মকর্তা শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করেন[৪০]। এছাড়া, ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে প্রশাসন ক্যাডার থেকে শান্তি মিশনে প্রেরণের দাবি করা হয়[৪১]। বর্তমান বহুমাত্রিক মিশন সমূহে আইনের শাসন, আইন,বিচার ও নির্বাহী বিভাগ নির্মাণ, মানবাধিকার সুরক্ষা, নারী শিশুদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা করার মতো অনেক বেসামরিক কার্যে শান্তিমিশনের বেসামরিক আমলা, বিচারক, আইনজীবি, চিকিৎসক, সমাজকর্মী/এনজিও কর্মীদের সমন্বিতভাবে কাজের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকারকে সেনা শান্তিরক্ষী প্রেরনের পাশাপাশি বেসামরিক শান্তিরক্ষী প্রেরণের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এরকম অংশগ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের সুয়োগ তৈরি হবে।

উপসংহার

গতানুগতিক শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষা প্রেরণকারী দেশগুলোর মানসিকতা হলো তারা শুধু বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে, কিন্তু শান্তিরক্ষার পরিবেশ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী,সশস্ত্র গোষ্ঠী, স্ট্রিট গ্যান, সংগঠিত অপরাধ, ক্রিমিনাল, রাজনৈতিক গণবিদ্রোহ, নির্বাচন আয়োজনের মতো জটিল ও বহুমাত্রিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ জাতিসংঘের *চ্যাপ্টার সিক্স স্টাইল* শান্তিমিশনের দিন শেষ। তাই শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোকে এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে “Chapter vi Syndrome” হতে বের হয়ে এসে বর্তমান সহিংসতার মাত্রা ও বাস্তবতা মেনে নিয়ে ট্রুপস গঠন, প্রশিক্ষণ ও মোতায়েনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে[৪২] এবং জাতিসংঘ শান্তিমিশনে জাতিসংঘের সদস্য ছোট রাষ্ট্রগুলোর অংশগ্রহণ বাড়াতে

হবে। বিশেষ করে গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞতা, কৌশলগত বিমান পরিবহণ এবং চিকিৎসা সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এ কাজে বৃহৎ ট্রুপস প্রদানকারী রাষ্ট্রগুলোর সাথে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এজন্য এসব কাজের নির্দেশিকা প্রণয়ন, কারিগরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। দাতা সংস্থা বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংক এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে শান্তিমিশনের কার্যকর ফল অর্জনের জন্য আমন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের দিক হতে (Demand side intervention) বিভিন্ন গবেষণা এবং জাতিসংঘের দিক হতে (Supply side intervention) ম্যান্ডেট, বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা, সেমিনার ও মতামত আদান প্রদানের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে[৪৩]। এক্ষেত্রে সেনা প্রেরণকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বাহিনীগুলোকে নিজস্ব তহবিল হতে নিজেদের মূল্যায়নের জন্য শিক্ষাবিদ, সিভিল সোসাইটি ও গবেষকদের এ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা ও নীতি সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে এবং চতুর্থ প্রজন্মের শান্তিরক্ষা মিশনগুলো অনেক বেশি প্রযুক্তি নির্ভর। বাংলাদেশ প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষিত শান্তিরক্ষী তৈরির জন্য বিপসট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শান্তিরক্ষী প্রেরণে বাংলাদেশকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং সেনা শান্তিরক্ষী প্রেরণের সাথে সাথে বেসামরিক শান্তিরক্ষী প্রেরণে কুটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একথা স্বীকার কার্য যে, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৈশ্বয়িক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ব্রান্ডিং এর অন্যতম উৎস। এ খাতটির উন্নয়ন ও টেকসইকরণে সকল অংশীজনকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

[১] বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত একজন সেনা কর্মকর্তা ও UNMISS মিশনে অংশগ্রহণকারী মূখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাৎকার, বনানী, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি, ২০২১।

[২] Peter Albrecht, Signe and Cold-Ravankilde (2020), *National Interests as Friction: Peacekeeping in Somalia and Mali*, Journal of Intervention and State Building (Pre print).

[৩] বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তা, UNMISS মিশনে অংশগ্রহণকারী এবং বর্তমানে জাতিসংঘের ইয়েমন অফিসে স্টাফ হিসেবে কর্মরত মূখ্য তথ্যদাতার সাথে হোয়াটসআপে সাক্ষাৎকার, ২৫ আগষ্ট, ২০২১।

[৪] Peter Albrecht and Sukanya Podder (2020), *Protection of the Civilians from the Perspective of the Soldiers Who Protect, Gana nad India in UN Peacekeeping*, Danish Instiyute of International Studies, Denmark.

[৫] Peter Albrecht and Cathy Haenlein (2015), Sierra Leone Conflict Peacekeepers: Sudan, Somalia Ebola, The RUSI Journal, Vol 160, N0 1, Pp 26-38.

[৬] Peter Albrecht and Cathy Haenlein (2015), *Sierra Leone's Post Conflict Peacekeeprs: Sudan, Somalia, Ebola*, The RUSI Journal, Vol-160, N0-1., Pp 26-36; and Conliffe Phillip (2013), *Legions of Peace: UN Peace Keepers from the Global South*, C.H. Hurst and Co., London.

[৭] বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে কর্মরত একজন সেনা কর্মকর্তা ও মিশনে অংশগ্রহণকারী মূখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাৎকার, বনানী, ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর, ২০২০।

[৮] Hatto, R. (2014). From peacekeeping to peacebuilding: the evolution of the role of the United Nations in peace operations. *International Review of the Red Cross*, 95(891/892), pp. 511-12; and Hansen (2002), *Ibid*, pp.50-51.

[৯] Sarjoon Athambawa (2019), *The UN Peacekeeping Operations and Challenges*, Academic Journal of Interdisciplinery Studies, Vol – 8, No-3, P-207.

[১০] Woodhouse, T & Ramsotham, O. (1999). *Encyclopedia of international peacekeeping operations.* California: ABC-CLIO, Inc., P 59.

[১১] Lieutenant Generaql (Rtd.) Carlos Alberto dos Santos Cruz (2017), *Improving Security of UNs Peacekeepers: we need to change the way we are doing Business*, A research report of United Nations Peace and Development Trust Fund under Peace and Security Sub-Fund for 2017.

[১২] *প্রাগুক্ত।*

[১৩] Sebastián, S & Gorur, A. (2018). *U.N peacekeeping and host-state consent: how missions navigate relationship with governments*. Washington D.C: Stimson Center. p.5.

[১৪] Marrision et, al, (1999), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪২।.

[১৫] Morrison, A., Cumner, S., Park, H & Zoe, K.A. (1999). Peacekeeping. In L. Kurtz. (ed). (1999**).** Encyclopedia of violence, peace, and conflict London: Academic Press. pp.735-753.

[১৬] Osmanczyk, E.J. (2003). Encyclopedia of the United Nations and international agreements**.** London: Routledge Publications.

[১৭] Wasim Mir (2019), Financing UN Peacekeeping: Avoiding another Crisis, International Peace institute, at https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/04/1904_Financing-UN-Peacekeeping.pdf

[১৮] Sarjoon Athambawa (2019), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১৩।.

[১৯] Berdal, M.R. (1996). *Disarmament and demobilization after civil wars*: arms, soldiers and the termination of armed conflicts. Oxford: Oxford University Press, pp 30-32.

[২০] Miall, H., Woodhouse, T & Ramsotham, O. (2006), Contemporary conflict resolution. Cambridge: Polity Press.:137-138

[২১] Marrision et, al, (1999), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪৪-৭৫০।

[২২] বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা, UNMISS মিশনে অংশগ্রহণকারী এবং শান্তিমিশন বিষয়ক গবেষক ও লেখক মূখ্য তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাৎকার, গুলশান-১, ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২০।

[২৩] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), প্রাগুক্ত।

[২৪] Rahman, 'Impact of Human Security Approach in the Post UN Peace Keeping Mission: A Case Study of Bangladesh', p.11.

[২৫] 'Arms deal with Russia crucial for UN Peacekeeping: Army' The Financial Express, 22 January 2013, at http:// www.thefinancialexpress-bd.com /index.php.

[২৬] Nurul Islam, 'The Army, UN Peacekeeping Mission and Democracy in Bangladesh', pp.81-2.

[২৭] Syed Imtiaz Ahmed, 'Civilian Supremacy in Democracies with 'Fault Lines': The Role of the Parliamentary Standing Committee on Defence in Bangladesh,' Democratization, 13:2 (2006), pp.283–302

[২৮] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), প্রাগুক্ত।

[২৯] 'Close podium or face Dhaka march, says Khaleda', New Age, 16 March 2013, at http://www.newagebd.com/detail.php?date=2013-03-16&nid=43127#.Uc1l6201hMu, প্রবেশ ১ এপ্রিল, ২০১৯।

[৩০] Hasina warns Khaleda against bloodshed,' Bdnews24.com, 2013-03-18, at http://bdnews24.com/politics/2013/03/18/hasina-warns-khaleda-against-bloodshed, প্রবেশ ১ এপ্রিল, ২০১৯।

[৩১] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), প্রাগুক্ত এবং Sultana Yesmin (2013), United Nations Peacekeeping Operations and Bangladesh: An Overview, Journal of International Affairs, Vol. 17, Nos. 1 & 2, June & December.

[৩২] BIISS-এর ওয়েবসাইট www.biiss.org

[৩৩] Ian Richards, 'The UN Must Stop Outsourcing Peacekeepers,' Huffington Post, at www.huffingtonpost.com/ian-richards/the-un-must-stop-outsoureing-b.3874641.html.

[৩৪] Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping, (Cambridge: Polity Press, 2nd edition, 2010), p.327.

[৩৫] রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), প্রাগুক্ত।

[৩৬] দৈনিক প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর, ২০২১, ঢাকা।

[৩৭] নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ব্যাক্তিরা হচ্ছেন- জনাব বেনজীর আহমেদ, বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি); র‍্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) মো. আনোয়ার লতিফ খান এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে র‍্যাবের এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

[৩৮] *প্রাগুক্ত।*

[৩৯] দৈনিক প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর, ২০২১, ঢাকা।

[৪০] Four Bangladeshi female judges to join UN Peacekeeping Mission, The Daily Star, 7th March, 2021, Dhaka.

[৪১] দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক মানব জমিন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর, ২০২২, ঢাকা।

[42] Secretary-General of the United Nations, *Improving Security of United Nations Peacekeepers: We Need to Change: The Way We Are Doing Business*, DECEMBER 19, 2017, available at https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/improving_security_of_united_nations_peacekeepers_report.pdf

[৪৩] Action needed for peacekeeping in distress**:** Small States Can Take Small but Important Steps to Improve Un Peacekeeping, DIIS Policy Brief March 2020. Available at www.diis.dk .

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্লেষণ ও উপসংহার

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ১৯৭১ সালে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান এর অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হতে মুক্তিসংগ্রামের মধ্যেমে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দেশটির সশস্ত্রবাহিনীর জন্ম। স্বাধীনতার মাত্র ১৭ বছরের মাথায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় অন্যতম অংশীজন হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর এ সফলতা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, শিক্ষাবিদ, গবেষক, উন্নয়ন ও শান্তিকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের দর্শনটি কী, বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের কর্ম কৌশলটি কী, সর্বোপরি বিশ্ব শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশী শান্তিকর্মীরা কীভাবে অবদান রাখছে এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা রাখছে এ সকল প্রশ্নের উত্তর এই গবেষণায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অবদান বা কার্যক্রমের মূল্যায়ন দুটি বৃহৎ দৃষ্টিকোন হতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে – প্রথমত-দ্বন্দ্ব নিরসনে সামরিক পন্থায় যুদ্ধবিরতি রক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সহায়ক পরিবেশ তৈরির দিক হতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কাজের মূল্যায়ন করা। পাবলিক ডিসকোর্সে মূলত এদিক হতে গণমাধ্যম ও বিভিন্ন প্রকাশনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের মূল্যায়ন লক্ষ্য করা যায়। যা প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক ও প্রশংসা সূচক। বিশ্লেষণের দ্বিতীয় প্রয়াসটি হলো - অসামরিক পন্থায় বহুমাত্রিক শান্তিমিশনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ তথা নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার আলোকে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ শান্তি মিশনে যোগদানের পর হতে মে ২০২০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ দেশে ৫৪টি মিশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং এসব মিশনের মধ্যে ৪৮ শতাংশ মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ম্যান্ডেটযুক্ত মিশন বাস্তবায়নে অন্য দেশের সৈন্যদের সাথে অংশগ্রহণ করে। অথচ, দায়িত্বের এ বৃহৎ দিকটি নিয়ে গণমাধ্যম সহ পাবলিক ডিসকোর্সে আলোচনা দেখা যায় না। বর্তমান গবেষণায় এদিকটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং উপরোক্ত দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা নির্ণায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার মূল প্রশ্ন হলো " স্থিতিশীল শান্তি

প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনী কীভাবে ভূমিকা রেখেছে (?)" তা অনুসন্ধান করা। এজন্য কেস হিসেবে সুদানের UNMIS মিশনকে একক কেস হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন একটি সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম, যা নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রবিধান ও আর্ন্তজাতিক বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত। এখানে প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড পূর্ব নির্ধারিত নীতিমালা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত কর্মপন্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে জাতিসংঘের দুটি বিভাগ DPPA ও UNDP কাজ করে। UNDP স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধে নির্বাচনী সহযোগিতা প্রদান করে। এটি একটি রুটিন দায়িত্ব, এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। অপর দিকে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ম্যান্ডেট অনুসারে DPPA এর মাধ্যমে সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে নির্বাচনী সহায়তা প্রদান করা হয়। এটি UNDP'র ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক সহায়তা নয় বরং শান্তিরক্ষা কর্মসূচির ম্যান্ডেটভুক্ত। শান্তিরক্ষা কর্মসূচী সরকার পদ্ধতির কোন নির্দিষ্ট মডেলকে সমর্থন করে না বরং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল্যবোধ ও নীতি প্রচার করে এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যেখানে সার্বজনীন মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, নারী ও পুরুষের সমতা, স্বাধীন মত প্রকাশ ও চর্চার মতো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি হয়। ১৯৯১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্বাচনী সহায়তা কর্মসূচি শান্তিমিশনে আওতাভুক্ত হওয়ার পর হতে শান্তিরক্ষা মিশনের অন্যতম লক্ষ্য হয় তাদের উপর অর্পিত ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ সমাজে সরকার, রাজনৈতিক দল, বভিন্ন গোষ্ঠী ও জনগণকে গণতন্ত্রের গুরুত্বের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা। স্বাভাবিকভাবে জাতিসংঘে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এ কাজে সম্পৃক্ত হয়। নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত এসব মিশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো - নামিবিয়া, কাম্বোডিয়া, সোমালিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, মোজাম্বিক, প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া, লাইবেরিয়া, হাইতি, তাজিকিস্তান, পশ্চিম সাহারা, সিয়েরা লিয়ন, সোমালিয়া, কসোভো, জর্জিয়া, পূর্ব তিমুর, কঙ্গো, সুদান, আইভরী ডি কোস্ট, আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া মিশন, ইত্যাদি। এসব মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুসারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসন, অভ্যন্তরীণ সংঘাত নিরসন, সরকার ও বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন, শান্তি স্থাপন, সামাজিক উন্নয়ন তথা অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ সর্বোপরি শান্তির স্থায়ী রূপদানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে প্রশাসনিক, বিচারিক ও

স্থানীয়- কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোটার রেজিস্ট্রেশন, নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচন পরিচালনা, পর্যবেক্ষণসহ নির্বাচন ও নির্বাচন উত্তর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠনে ভূমিকা রাখে। তেমনি পূর্ব তিমুর এবং সুদানে গণভোটের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের জাতিগত সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে নতুন জাতিরাষ্ট্র গঠনে দায়িত্ব পালন করেছে। এসকল মিশনের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ থেকে একথা বলা যায়, মিশন ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে এ মিশনগুলো সফল হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? বা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কি হয়েছে? আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের শান্তিমিশনের ইতিবাচক ভূমিকা প্রতীয়মান হলেও গবেষণার বিশ্লেষণী কাঠামো এবং কেস স্টাডির ফলাফল তা সরাসরি জোরালো সমর্থন করে না।

তত্ত্বগতভাবে গালতুং 'শান্তি' বলতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের শান্তির যোগফলকে বুঝিয়েছেন। গালতুং প্রত্যক্ষ (নেতিবাচক শান্তি), কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক সহিংসতার (ইতিবাচক শান্তি) ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক বুঝাতে গিয়ে 'ক্ষমতা'র ধারণা ব্যবহার করেন এবং চার ধরনের ক্ষমতার মাত্রা (সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক) চিহ্নিত করেন। সামরিক বা পুলিশি ক্ষমতা প্রত্যক্ষ সহিংসতার নেতিবাচক শান্তি অর্জনকে প্রভাবিত করে। অপর দিকে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহিংসতার ত্রিভুজ সম্পর্ক নিরসনে প্রয়োজন কাঠামোগত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তন করে এবং অসামরিক পন্থায় কাঠামোগত সহিংসতা রোধ করে ইতিবাচক শান্তি অর্জনে অবদান রাখে। কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের ধারণাটি বহুমাত্রিক শান্তিমিশন এবং গণতন্ত্রায়ণের উদারনৈতিক ধারণাকে একীভূত করে। ১৯৯১ সালের পর হতে সহিংসতা গ্রস্ত রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রায়নকে উৎসাহিত করা/প্রতিষ্ঠা করা জাতিসংঘ শান্তিমিশনের ম্যান্ডেটভুক্ত করা হয়েছে। বৈশ্বিক সহযোগিতায় শান্তিমিশনে এ ম্যান্ডেটি দু'ভাবে বাস্তবায়িত হয়, প্রথম পন্থা- 'অগ্রাধিকার পদ্ধতি' অনুসারে শান্তি আগে গণতন্ত্রায়ণ পরে। যেখানে 'গণতন্ত্রায়ণের' চেয়ে 'শান্তি স্থাপন' কে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এবং দ্বিতীয় পন্থা 'ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি' অনুসারে শান্তি ও গণতন্ত্রায়ণ উভয় কার্য সমান্তরালভাবে একই সময়ে পরিচালিত হয় (বিস্তারিত দেখুন প্রথম অধ্যায়ে)। গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা হতে দেখা যায়, ১৯৯১ হতে ২০১২ পর্যন্ত জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী মোট ৩২টি নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনের

মধ্যে বাংলাদেশ ২৬টি নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত মিশনে দায়িত্ব পালন করেছে। এটি বৈশ্বিক নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনগুলো ৮১ শতাংশ (৩২টি নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ ২৬টি) এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক অংশগ্রহণকৃত মিশনের ৪৮ শতাংশ (মোট ৫৪টি মিশনের মধ্যে ২৬টি)। এসব নির্বাচনী ম্যান্ডেটভুক্ত মিশনকে অংশগ্রহণের মাত্রার তারতম্যের ভিত্তিতে পাচঁটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং দেখা যায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণকৃত মিশনগুলো কোন না কোন স্তরের আওতাভুক্ত। লক্ষণীয় হলো, অধিকাংশ মিশনে অগ্রাধিকার পদ্ধতি অনুসরণ করে শান্তি স্থাপনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, গণতন্ত্রায়ণ ছিলো কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেমন, কম্বোডিয়া, আফগানিস্তান, দক্ষিণ সুদান, পশ্চিম সাহারাসহ অনেক মিশনে অগ্রাধিকার পদ্ধতিতে বহুমাত্রিক শান্তিমিশনগুলো পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার পরিমাপক সূচকগুলোর উন্নয়ন করা হয়নি। সংঘাতপূর্ণ রাষ্ট্রে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের পরিমাপকসমূহ যেমন – রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (আইন, শাসন, বিচার, নিবাচনী কাঠামো, আইনের শাসন) নির্মাণ, রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নাগরিক সমাজ তথা মানবাধিকার, যুব ও নারীদের সম্পৃক্ততা, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক শিক্ষাসহ সামাজিক সংগঠন ও মিডিয়ার বিকাশকে চিহ্নিত করে। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, নির্বাচনী ম্যান্ডেটযুক্ত শান্তি মিশনে এ সূচকগুলোর উন্নয়নে গুরুত্বারোপ কম করা হয়েছে কিংবা সাময়িক একটি কাঠামো তৈরি করে নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়নি। যেমন – আফগানিস্তান বা সুদান মিশনের কথা ধরা যাক। আফগানিস্তানে দেখা যায় শান্তিমিশন দু দুবার সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করে, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মিশনের পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অবশেষে সেখানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ২০২০ সালে মার্কিন বাহিনী দেশ ত্যাগের সাথে সাথে দেশটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। রাষ্ট্রপতি পলায়ন করেন, সরকারের সকল বিভাগ, আইনের শাসনসহ সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে পড়ে। এর কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আফগানিস্তানে অগ্রাধিকার পদ্ধতিতে শুধু শান্তি স্থাপনকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, কিন্তু একই সময়ে ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি অনুসারে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি। কিন্তু, জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুসারে শান্তিরক্ষা মিশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে তবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সৈন্য প্রত্যাহারের সাথে সাথে সারাদেশে যে অরাজকতা এবং তালেবানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো সেখানে কোন রানৈতিক প্রতিষ্ঠানই দাঁড়াতে পারেনি। অর্থাৎ দীর্ঘ এ দু'দশকে আফগানিস্তানে নেতিবাচক শান্তি অর্জনে শান্তিরক্ষা মিশন সফল হয়েছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ও কাঠামোগত শান্তি যেটি পরোক্ষ/ইতিবাচক শান্তি

অর্জনে টেকসই কাঠামো গড়ে তোলা দরকার ছিলো সেটি মিশন করতে পারেনি। অথচ, কাগজপত্রে মিশনের মূল্যায়নে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুসারে শান্তিরক্ষা মিশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তেমনি, পশ্চিম সাহারায় দীর্ঘ প্রায় দু'দশক থেকে শান্তিমিশন পরিচালিত হচ্ছে এবং সংঘাতপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিরতি বজায় রয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার কারণে শান্তিচুক্তির অন্যতম উপাদান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। বলা যায়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিচালিত মিশনসমূহে 'শান্তিরক্ষা' অর্জিত হয় কিন্তু স্থায়ী শান্তি স্থাপন হয় না। ফলে, দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি অর্জিত না হয়ে মিশন দীর্ঘায়িত হয় এবং ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চাহিদা কাঙ্ক্ষিত থেকে যায়।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে শান্তিরক্ষীবাহিনী গণতন্ত্রায়ণে কী কোন ভূমিকা রাখে না বা রাখলে সেটির ধরন কী? এর উত্তর অনুসন্ধানে দেখা যায়, গণতন্ত্রায়ণের অন্যতম উপাদান স্থিতিশীল আইন শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং মানবাধিকার রক্ষা। যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার মাধ্যমে শান্তিরক্ষীরা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেন যেখানে জাতিসংঘের সকল অঙ্গ সংগঠন নিজ নিজ কর্মসূচি পরিচালনা করে। জাতিসংঘের এবং স্থানীয় শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব শান্তিরক্ষীদের উপর বর্তায়। অর্থাৎ সংঘাতমুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া চর্চার অন্যতম পূর্বশর্ত, এ গুরু দায়িত্ব বা সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণে শান্তিমিশন মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধবিরতি তথা শান্তিরক্ষা না হলে অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় না। এজন্য বলা যায়, শান্তিরক্ষা মিশন আইনের শাসন, মানবাধিকার, গণমাধ্যমসহ সিভিল সোসাইটির বিকাশের সহায়ক পরিবেশ এবং ভিত্তি কাঠামো রচনা করে। যদি শান্তি বজায় না থাকে এবং গ্রুপগুলোর মধ্যে সহিংস যুদ্ধ বিরাজ করে তাহলে অন্য কোন কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব। যুদ্ধবিরতি বা সংঘাত হতে গোষ্ঠীগুলোকে বিরত রেখে স্থিতিশীল শান্ত পরিবেশ তৈরি করার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীবাহিনী। এ দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায়, শান্তিরক্ষীবাহিনীর কাজের সফলতার উপর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুর সফল কার্যকারিতা নির্ভর করে।

গবেষণার দ্বিতীয় প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে সুদানে UNMIS - এর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা কতদূর সফল হয়েছে?' এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীবাহিনীর প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা গবেষণার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের পরিপূরক।

গবেষণার কেস স্টাডি সুদানের UNMIS মিশন বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা যুদ্ধবিরতি বজায় রাখা ছাড়াও মাঠ পর্যায়ের Good Office আওতাধীন বিভিন্ন উপ-শাখায়- রাজনৈতিক, নাগরিক বিষয়ক, মানবাধিকার, জেন্ডার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপ-শাখার বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পাদনে নিরাপত্তা ও কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করে। সুদান ও জাতিসংঘের মধ্যকার চুক্তি অনুসারে UNMIS শান্তিমিশন দুটি প্রক্রিয়ায় চুক্তি বাস্তবায়ন করে। এক. নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান এবং দ্বিতীয়ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ লক্ষে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-প্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশি কাঠামো, আইনী বিধিবিধান প্রণয়ন, সংবিধান রচনা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, ভোটার রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘের Department of Political Affairs বিভাগের আওতায় জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এ মিশনে মোট শান্তিরক্ষীর ৯৬.৯৭% শান্তিরক্ষী বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হওয়ায় চুক্তি বাস্তবায়নের সকল স্তরে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সম্পৃক্ততা ছিলো। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা প্রদান করে বাংলাদেশ পুলিশের শান্তিরক্ষীরা। বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীরা মিশনের শুরু থেকে শেষ অবদি মিশনের সাথে জড়িত ছিলো। ফলে, যেকোন কর্মকাণ্ডে নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সর্বত্র ছিলো বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা। বিশ্লেষণে দেখা যায়, পদ্ধতিগত ভাবে এ মিশনে ২০০৫ সালের পর হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত 'অগ্রাধিকার পদ্ধতি' শান্তিরক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সাল হতে 'ক্রমবিকাশমান' (Gradualist Approach) পদ্ধতিতে গণতন্ত্রায়ণ ও শান্তিস্থাপন উভয় কাজ চালিত হয়। গণতান্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনী কার্য যেমন ভোটার রেজিস্ট্রেশন তথা নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সরাসরি জড়িত ছিলো না, এ দায়িত্বগুলো মিশনের মাঠ পর্যায়ের Good Office এর অন্যান্য উপশাখাসমূহ পালন করে। তবে, এ সকল উপ-শাখার নিরাপত্তা, তাদের কাজের পরিবেশ তৈরি, যাতায়াত এবং কারিগরি বিষয়সমূহ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা। সুদান মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা নিরাপত্তা ও কারিগরি সহযোগিতার বাইরে সরাসরি দায়িত্ব পালন করে নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণে, ভোটার তালিকার কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার গঠনে, ভোটের সকল সরঞ্জাম, ব্যালেট পেপার, কালি, ব্যালেট বক্স ইত্যাদির নিরাপত্তা ও দেশের সকল কেন্দ্রে প্রেরণের দায়িত্ব এবং ভোটের ফলাফল সরাসরি রেডিও লিংক ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌঁছে দেয়ার কাজ করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্থানীয় এফএম রেডিও বিভিন্ন প্রোগ্রাম প্রচার করে।

তথ্য বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, নাগরিক অধিকার, প্রশাসনিক ও আইনী কাঠামো তৈরি, বিচার কাঠামো, আইন শৃঙ্খলা কাঠামো, নির্বাচন কমিশন গঠনসহ নীতিনির্ধারণী কাজে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মূলত সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক রাজনীতি র্চচার পরিবেশ তৈরির সহায়ক ফোর্স হিসেবে কাজ করে। একাজে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা এবং যুদ্ধবিরতি বজায় রেখে একটি শান্তিপূর্ণ নিবার্চনী সহায়ক পরিবেশ তৈরির মধ্যে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনকালীন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন এবং জনগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রলুব্ধ করণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সম্পৃক্ততা লক্ষণীয়। প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের বাইরে, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সুদান ও দক্ষিণ সুদানের জনগণের আস্থা অর্জন করেছিলো, জনগণ বিশ্বাস করতে পেরেছিল নির্বাচনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের উপস্থিতি থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। ২০১০ সালে সুদান জাতীয় পরিষদ এবং ২০১১ সালে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানের জন্ম হয়। গণভোটে ৯৭.৫৮% ভোট গণনা হয়। বাস্তবায়িত হয় UNMIS এর ম্যান্ডেট। এ থেকে বলা যায়, UNMIS এর মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে ভূমিকার বিষয়টি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কারণ হিসেবে দেখা যায়, সুদানের UNMIS মিশনে প্রথম দিকে ২০০৫ হতে ২০০৯ পর্যন্ত শান্তিরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, এসময়ে গণতন্ত্রায়ণের বিভিন্ন উপাদানসমূহ সমান্তরালভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৯ সালে এসে তড়িঘড়ি করে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ২০১০ ও ২০১১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী ট্রাইবুনাল, রাজনৈতিক দল রেজিষ্ট্রেশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করা হয়। আরো সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, নির্বাচনের এক বছর আগে তড়িঘড়ি করে মিশন ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের স্বার্থে একটি রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হয়। প্রতিষ্ঠান গঠনের এ প্রক্রিয়ায় সুদানের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ বা নীতিগত ঐক্য ছিলো না, ফলে দীর্ঘ মেয়াদে সুদানে এ সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান টেকসই হয়নি। গণতান্ত্রায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ, এটি বাইরে থেকে চাপানো যায়না। সুদানের রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য না থাকা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতি প্রতিশ্রুতি/সংহতি না থাকার কারণে দেশটির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভঙ্গুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, আন্তঃগ্রুপ দ্বন্ধ, দারফুর ও আবেয় প্রদেশের বিচ্ছিন্নতার দাবির প্রেক্ষিতে দীর্ঘ প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে পৃথক তিনটি মিশন সুদানে

চলমান রয়েছে। মিশন চলমান অবস্থায় ২০২১ সালের জাতীয় নির্বাচনে কারচুপি, অনিয়ম ইত্যাদি কারণে সুদানে পুনরায় সামরিক শাসন জারি হয়। অর্থাৎ দীর্ঘ জাতিগত সংঘাতের কারণে প্রায় দেড় যুগ আগে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দেশটিতে শান্তি মিশন শুরু, মিশনের মাধ্যমে একাধিক নির্বাচন অনুষ্ঠান, দেশ ভেঙ্গে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি (দক্ষিণ সুদান) হয়েছে কিন্তু সুদানের জনগণ কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক শাসনের সুফল পায়নি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাতিষ্টানিকীকরণের ব্যর্থতা দেশটি সামরিক শাসনের মাধ্যমে পুনরায় সংঘাত গ্রস্ত রাষ্ট্রে পতিত হলো। অপরদিকে, ২০১১ সালের গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং একই বছর নতুন রাষ্ট্র গঠনে সহায়তার জন্য নতুন একটি মিশন (UNMISS) প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘ এক দশক থেকে মিশনটি বিদ্যমান রয়েছে। মিশনটি অগ্রাধিকার পদ্ধতিতে দক্ষিণ সুদানের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার আন্তঃদ্বন্ধ, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘাত, সম্পদের মালিকানা ও ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সংহিসতা থেকে বিরত রাখতে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। UNMISS মিশনের শুরু থেকে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা অংশগ্রহণ করে এবং এখনো দায়িত্বরত রয়েছে। কার্যত, গণতন্ত্রায়নের পরিমাপক উপাদান যেমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সচল করা এবং সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের বিকাশ না হওয়ার কারণে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হচ্ছে না, বরঞ্চ চলমান মিশনগুলো শান্তিরক্ষার নামে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। বর্তমানে সুদানে তিনটি এবং দক্ষিণ সুদানে একটি মিশন চলমান রয়েছে। এক UNMIS মিশনের সমাপ্তিতে চারটি মিশনের জন্ম হয়েছে। বলা যায়, এরকম মিশনের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা হয় কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

তবে, জাতিসংঘ শান্তিমিশন কর্তৃক নির্বাচন পরিচালনা এবং সহায়ক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ দ্বন্ধগ্রস্ত সুদানে গণতন্ত্রের প্রাথমিক সূচনা বলা যেতে পারে। স্বল্প মেয়াদে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ না হলেও এসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এবং গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়েছে, যা সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোকে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে সাহায্য করবে। নির্বাচনের মাঠে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনীর জনগণের আস্থা অর্জন এবং নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন দেশগুলোকে ভবিষ্যৎ নির্বচানী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আদর্শ চর্চা উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ সদস্যগণ পেশাগত দক্ষতা, দ্বন্দ্বকালীন সমস্যা মোকাবেলার বাস্তব অভিজ্ঞতা, মানবাধিকারসহ উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ পেশাগত অভিজ্ঞতা শান্তিরক্ষীগণ নিজ বাহিনীর দক্ষতা এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে, মানবাধিকা সংরক্ষণে এবং সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতিতে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি গুরুত্বারোপের কারণে ভবিষ্যতে বিশ্বরাজনীতিতে গণতন্ত্র সাহায্যের (aiding democracy) উদ্যোগ জাতিসংঘ শান্তিমিশনে প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে মিশন ম্যান্ডেটে আরো গুরুত্বের সাথে গণতন্ত্রায়ণ বিষয়টি বিবেচিত হবে। এ জন্য, প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিভিন্ন বাহিনীর সামরিক ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন বাহিনী ও বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার উপর অধিকরত গুরুত্বারোপের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে আন্তর্জাতিক মানে পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাহিনী সমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নীতিগত ঐক্যমত এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্ব হারাবে। এ গবেষনার প্রাপ্ত ফলাফল শুধু সুদান বা দক্ষিণ সুদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা বলা যাবে না। বরংচ এ ফলাফল অন্যান্য দেশেও গণতন্ত্রায়নে শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ যোগ্য হতে পারে। অসামরিক পন্থায় বিশ্বশান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের এ অবদান নিয়ে পাবলিক ডিসকোর্সে আরো অধিকতর গবেষণা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে।

পরিশিষ্ট -১

মূখ্য তথ্যদাতাদের তালিকা

নং	তথ্য দাতার নাম	পদবী	সাক্ষাতের তারিখ
১	জনাব আমেনা বেগম	ডিআইজি. বাংলাদেশ পুলিশ ও UNMIS (সুদান) মিশনে অংশগ্রহণকারী	০৫.১২.২০২০; ১২.০৯.২০২১
২	জনাব দেলওয়ার	অবসর প্রাপ্ত মেজর এবং UNMISS দক্ষিণ সুদান মিশনে অংশগ্রহণকারী	২৫.০১.২০২১
৩	জনাব হামিদ	মেজর, সেনা সদর দপ্তরে কর্মরত, UNMISS (সুদান) মিশনে অংশগ্রহণকারী	১৮.১০.২০২০
৪	জনাব আসিফ আহমেদ আনসারী	অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং UNMIS (সুদান) ONUMOZ (মোজাম্বিক) মিশনে অংশগ্রহণকারী	২৭.১০.২০২০
৬	জনাব মো: সারোয়ার আলম সরকার	সাবেক এসপি, বাংলাদেশ পুলিশ এবং একাধিক মিশনে অংশগ্রহণকারী, বর্তমানে জাতিসংঘে কর্মরত	২৮.০৭.২০২১; ১২.০১.২০২২
৭	জনাব নুরুল মান্নান	অবসর প্রাপ্ত মেজর, বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ও মিশনে অংশগ্রহকারী	২১.০১.২০২১
৮	জনাব আতিক	অবসর প্রাপ্ত লে: কর্ণেল, আইভরী কোস্ট মিশনে অংশগ্রহণকারী	২৫.১০.২০২০
৯	জনাব মিলি বিশ্বাস	ডি আই ডি, বাংলাদেশ পুলিশ	১৭.১২.২০২০
১০	জনাব একে এম শফিউল আনাম	অবসর প্রাপ্ত লে: কর্ণেল, বাংলাদেশ সেনা বাহিনী এবং একাধিক মিশনে অংশগ্রহণকারী	১০.০৭.২০২০
১১	ড. নীলয় রঞ্জন বিশ্বাস	সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাবি।	১৯.১০.২০২০
১২	ড. শরীফ আহমদ চৌধুরী	গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইডিডি)।	২৩.০৭.২০২১; ১৩.০২.২০২২
১৩	জনাব মো: তৌহিদুল ইসলাম	অবসর প্রাপ্ত উইং কমান্ডার, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, MINUSMA (মালি), MONUC (কঙ্গো) মিশনে অংশগ্রহণকারী	২৫.১১.২০২০
১৪	জনাব শাহরিয়ার হামিদ রসুল	অবসর প্রাপ্ত লে: কমান্ডার (নৌ বাহিনী), আইভরী কোস্ট মিশনে অংশগ্রহণকারী	১৭.১১.২০২০
১৫	জনাব সাজেদা আক্তার	মেজর, বিপসটে কর্মরত, UNMISS দক্ষিণ সুদান মিশনে অংশগ্রহণকারী	১৯.০১.২০২১
১৬	জনাব ইসরাত মারিয়া মিতু	লে: কর্ণেল, বিপসটে কর্মরত, UNMISS দক্ষিণ সুদান মিশনে অংশগ্রহণকারী	২১.০১.২০২১
১৭	জনাব মোঃ মনজুর কাদের খান	অবসর প্রাপ্ত ডিআইজি. বাংলাদেশ পুলিশ, UNMISS দক্ষিণ সুদান মিশনে অংশগ্রহণকারী	২৫.০৮.২০২১
১৮	জনাব রওনক জাহান	ডিআইজি. বাংলাদেশ পুলিশ, পূর্ব তিমুর মিশনে অংশগ্রহণকারী	অন লাইন ২২.১২.২০২০
১৯	জনাব শামীমা আক্তার	ডিআইজি. বাংলাদেশ পুলিশ সুদান (খারতুম) মিশনে অংশগ্রহণকারী	অন লাইন ১৮.১২.২০২০
২০	জনাব রবিউল আফিজ	জাতিসংঘের কর্মকর্তা হিসেবে ইয়েমেনে কর্মরত এবং সাবেক মেজর বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ও একাধিক মিশনে অংশগ্রহণকারী	অন লাইন ২৫.০৮.২০২১
২১	জনাব শাওন শায়লা	কর্মকর্তা বাংলাদেশ পুলিশ, UNMISS (সুদান) মিশনে অংশগ্রহণকারী	অন লাইন ২৬.১২.২০২০
২২	জনাব তাহমিনা তাকিয়া	কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পুলিশ, UNMISS (সুদান) মিশনে কর্মরত	অন লাইন ২৮.১২.২০২০
২৩	জনাব শামীমা পারভীন	অতিরিক্ত পুলিশ সুপাররেনডেন্ট, বাংলাদেশ পুলিশ	০৩.০৩.২০২২
২৪	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	এয়ার কমান্ডার, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কর্মরত এবং একাধিক মিশনে অংশগ্রহণকারী	১৩.১০.২০২১
২৫	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	নৌ কমান্ডার, বাংলাদেশ নৌ বাহিনীতে কর্মরত এবং একাধিক মিশনে অংশগ্রহণকারী	২২.১১.২০২২
২৬	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	মেজর, মেডিকেল কোর, বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ও কঙ্গো মিশনে অংশগ্রহণকারী	২২.১০.২০২১

পরিশিষ্ট-২

প্রাতিষ্টানিক (সেনা ও পুলিশ সদর দপ্তর) তথ্য সংগ্রহের চেক লিস্ট

আমি **তাসনীম তাহের** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে **"জাতি সংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা"** শীর্ষক বিষয়ে পিএইচডি গবেষণা করছি। গবেষণার তথ্যের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত তথ্য ও উপাত্ত প্রয়োজন। এ তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং যথাযথ সাইটেশন/উৎস ব্যবহার করা হবে। অনুমতি সাপেক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

১. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণ প্রক্রিয়াটি কি?

২. শান্তিরক্ষী প্রেরণে বাংলাদেশের বাহিনীগুলোর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কোন কর্মপরিকল্পনা বা কৌশলপত্র বা দীর্ঘ মেয়াদী কোন ভিশন আছে কি? যদি থাকে সেটি কি?

৩. শান্তি মিশনে প্রেরণের পূর্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সামরিক প্রশিক্ষণের বাহিরে যেসব ট্রেনিং প্রদান করা হয় সেটি কী? (ট্রেনিং এর মেয়াদ, বিষয়সমূহ) । যেহেতু, সকল সদস্যেরই মিশনে যাবার সুযোগ রয়েছে সেহেতু বাহিনীর সদস্যদের সাধারণভাবে বর্তমানে কি কি ভাষার উপর ট্রেনিং প্রদান করা হয়?

৪. শান্তিরক্ষী বাহিনী হতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা হতে সরকার কোন অংশ পেয়ে থাকে কী ? যদি হ্যাঁ হয়, সেটির হার (%) কত এবং বিগত যে কোন একটি নির্দিষ্ট্য মেয়াদে কত টাকা বৈদেশিক মুদ্রা শান্তিরক্ষীরা, প্রতিষ্ঠান (বাহিনী) ও সরকার পেয়েছেন।

৫. শান্তিরক্ষী প্রেরণের জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কোন প্রশিক্ষণ/প্রযুক্তি/লজিস্টিক/তহবিল জাতিসংঘ থেকে পেয়ে থাকে কি? হ্যাঁ হলে সেটি কী? প্রয়োজনে প্রতিটি বিষয়ে তালিকা সংযুক্ত করুন।

৬. বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সফলতার সাথে শান্তি রক্ষা মিশন বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার, আইনের শাসন ও নির্বাচন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে (যেমন-UNMIL/ UNOMIL (লাইবেরিয়া), UNOCI/MINUCI (আইভরি কোস্ট), MONUSCO/ MONUC (কঙ্গো) মিশনে নির্বাচন পরিচালনায় ভূমিকা পালন করেছে)। বিশেষ করে আইনের শাসন, প্রতিষ্ঠান নির্মাণে নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা কোন কোন মিশনে কাজ করেছে বা করছে তার তালিকা,অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং এসব মিশনের অভিজ্ঞতা /মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোন প্রকাশিত প্রতিবেদন।

৭. সামরিক কৌশল ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অবদানের বা কর্মকৌশলের মূল্যায়ণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কৌশলগত ইনডিকেটর বা পন্থা কী? এ সংক্রান্ত পুরুস্কার, স্বীকৃতি বা অর্জন (ব্যাক্তিগত বা বাহিনী) আছে কি? থাকলে সেটির তথ্য। এসংক্রান্ত কোন প্রকাশিত প্রতিবেদন/ প্রেজেন্টেশন।

৮. শান্তি রক্ষা মিশনে বর্তমান পর্যন্ত কত জন নারী অংশগ্রহণ করেছেন? কোন নারী কি মিশনে দায়িত্ব পালনে আহত বা নিহত হয়েছেন? হলে সংখ্যাটি কত।

(চলমান)

৯. শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করতে গেলে অংশগ্রহণকারী সদস্যের পরিবারকে সরকারি কোয়াটার বা কোন সুবধা কি ছেড়ে দিতে হয়? মিশনকালীন সময়ে কোন সদস্য কি ছুটিতে দেশে আসতে পারেন? বিশেষ করে মহিলা সদস্যদের পারিবারিক বন্ধনের জন্য কোন বিশেষ অপশন আছে কি?

১০. শান্তি মিশনে অপরাধ বা কোন অভিযোগের কারণে এ পর্যন্ত কতজন সদস্য বিচার বা শাস্তির সম্মুখীন হয়েছেন, অপরাধ ও শাস্তির ধরণ কী? এ সংক্রান্ত কোন তালিকা ও নীতিমালা। শাস্তি প্রাপ্ত সদস্যগণ কি পূনরায় মিশনে যেতে পারেন?

১১. চতুর্থ প্রজন্মের প্রযুক্তি নির্ভর শান্তি মিশনে প্রতিযোগীতায় ঠিকে থাকা এবং টেকসই অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোন কৌশলপত্র বা পরিকল্পনা আছে কি? থাকলে সেটি কি?

নোটঃ প্রেজেন্টেশন/রিপোর্ট/প্রকাশনার ক্ষেত্রে কপি বা সংশ্লিষ্ট অংশের কপি বা লিংক দয়া করে সংযুক্ত করুন।

আপনাকে ধন্যবাদ

পরিশিষ্ট -৩

মূখ্য তথ্যদাতা স্বাক্ষাৎকার চেক লিস্ট
(শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী সেনা/পুলিশ সদস্যদের জন্য)

আমি তাসনীম তাহের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে **"জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা"** শীর্ষক বিষয়ে পিএইচডি গবেষণা করছি। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে একজন মূখ্য তথ্যদাতা (Key informant) হিসেবে আপনর সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এ তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম অনুমতি ব্যতীত গবেষণার কোন পর্যায়ে উল্লেখ করা হবে না। আপনার অনুমতি সাপেক্ষে স্বাক্ষাতকারটি শুরু করতে পারি?

আপনার নামঃ **পদবীঃ**

১. আাপনি জাতিসংঘের কোন/ কোন কোন মিশনে কবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এ মিশনে বা মিশনগুলোর মেন্ডেট কি ছিলো?

২. এ মিশনে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ কি ছিলো এবং এ দ্বন্দ্ব নিরসনে বাংলাদেশ মিশন কি ধরণের ভুমিকা পালন করেছিল?

৩. বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিমিশনে প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র। আপনার দৃষ্টিতে এ সাফল্যের কারণগুলো কি? (পেশাগত/সক্ষমতা, রাজনৈতিক ও নীতি নির্ধারণী বা কৌশলগত দিক হতে)

৪. আপনি কি মনে করেন, 'শত্রু কর্তৃক প্রথমে আক্রান্ত হলেই আত্ম রক্ষার্থে অস্ত্রের ব্যবহার' এ নীতির কারণে অন্য দেশের অনাগ্রহের কারণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা এ ঝুঁকি গ্রহণ করে মিশনে যোগদান করে থাকে? এ বিষয়ে বাংলাদেশ কি ধরণের নীতিগত কৌশল গ্রহণ করতে পারে?

৫. আপনার দৃষ্টিতে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অবদানগুলো কি?

৬. শান্তিরক্ষা মিশন বিভিন্ন দেশে মানবাধিকর ও নির্বাচন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে (যেমন- UNMIL/UNOMIL (লাইবেরিয়া), UNOCI/MINUCI (আইভরি কোস্ট), MONUSCO/MONUC (কঙ্গো) মিশনে শান্তিরক্ষীরা নির্বাচন পরিচালনায় ভূমিকা পালন করেছে)। নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা কি ধরনের কার্য বা দায়িত্বগুলো পালন করেছে?

৭. আপনি কি মনে করেন, শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

৮. প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র হওয়ার পরও, কেনো জাতিসংঘ শান্তি মিশনের উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে বাংলাদেশী অফিসারদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় না?

৯. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বেসামরিক জনগণের অংশগ্রহণ এর সুযোগ কেন বাংলাদেশ নিচ্ছে না বা এ বৃহৎ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কি করা উচিত?

১০. আপনার মতে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ কি কি এবং এ হতে উত্তরণ এবং মিশনে অংশগ্রহণ টেকসই করণে আপনার সুপারিশ কি?

আপনাকে ধন্যবাদ

পরিশিষ্ট-৪

মূখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাতকার চেক লিস্ট
(বেসামরিক ও একাডেমিক বিশেষজ্ঞদের জন্য)

আমি **তাসনীম তাহের** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে **"জাতি সংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা"** শীর্ষক বিষয়ে পিএইচডি গবেষণা করছি। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে একজন মূখ্য তথ্যদাতা (Key informant) হিসেবে আপনার সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এ তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম অনুমতি ব্যতীত গবেষণার কোন পর্যায়ে উল্লেখ্য করা হবে না। আপনার অনুমতি সাপেক্ষে সাক্ষাতকারটি শুরু করতে পারি?

আপনার নামঃ **পদবীঃ**

১. বাংলাদেশ জাতি সংঘের শান্তি মিশনে প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র। আপনার দৃষ্টিতে এ সাফল্যের কারণগুলো কি? (পেশাগত/সক্ষমতা, রাজনৈতিক ও নীতি নির্ধারনী বা কৌশলগত দিক হতে)

২. আপনি কি মনে করেন, 'শত্রু কর্তৃক প্রথমে আক্রান্ত হলেই আত্ম রক্ষার্থে অস্ত্রের ব্যবহার' এ নীতির কারণে অন্য দেশের অনাগ্রহের কারণে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা এ ঝুঁকি গ্রহণ করে মিশনে যোগদান করে থাকে? এ বিষয়ে বাংলাদেশ কি ধরণের নীতিগত কৌশল গ্রহণ করতে পারে? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি কী?

৩. আপনার দৃষ্টিতে জাতি সংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অবদানগুলো কিভাবে মূন্যায়ন করবেন?

৪. শান্তি রক্ষা মিশন বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার ও নির্বাচন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে (যেমন-UNMIL/ UNOMIL (লাইবেরিয়া), UNOCI/MINUCI (আইভরি কোস্ট), MONUSCO/ MONUC (কঙ্গো) মিশনে শান্তিরক্ষীরা নির্বাচন পরিচালনায় ভূমিকা পালন করেছে)। নির্বাচন পরিচালনায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা কি ধরনের কার্য বা দায়িত্বগুলো পালন করেছে ?

৫. আপনি কি মনে করেন, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ বাংলাদেশ সশস্ত্র/পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব নস্ট হচ্ছে? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি কী?

৬. প্রধান শান্তি রক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র হওয়ার পরও, কেন জাতিসংঘ শান্তি মিশনের উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে বাংলাদেশী অফিসারদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় না?

৭. সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিকর্মী নিয়ে শান্তিরক্ষীদল গঠিত। বাংলাদেশ বিগত তিন দশকে শুধু সেনা ও পুলিশ শান্তিরক্ষী প্রেরণ করেছে। কিন্তু, বেসামরিক শান্তি কর্মী প্রেরণের বিশাল এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

৮. আপনার দৃষ্টিতে মিশনে নারী সদস্যদের দায়িত্বপালনের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জগুলো কি এবং উত্তরণের উপায় কি?

৯. বৈশ্বয়িক প্রেক্ষিতে, জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অবস্থান টেকসই করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয়কে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেন? এসব চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণে আপনার সুপারিশ কি?

আপনাকে ধন্যবাদ

পরিশিষ্ট-৫

সংযুক্ত সুদানের ভৌগলিক মানচিত্র

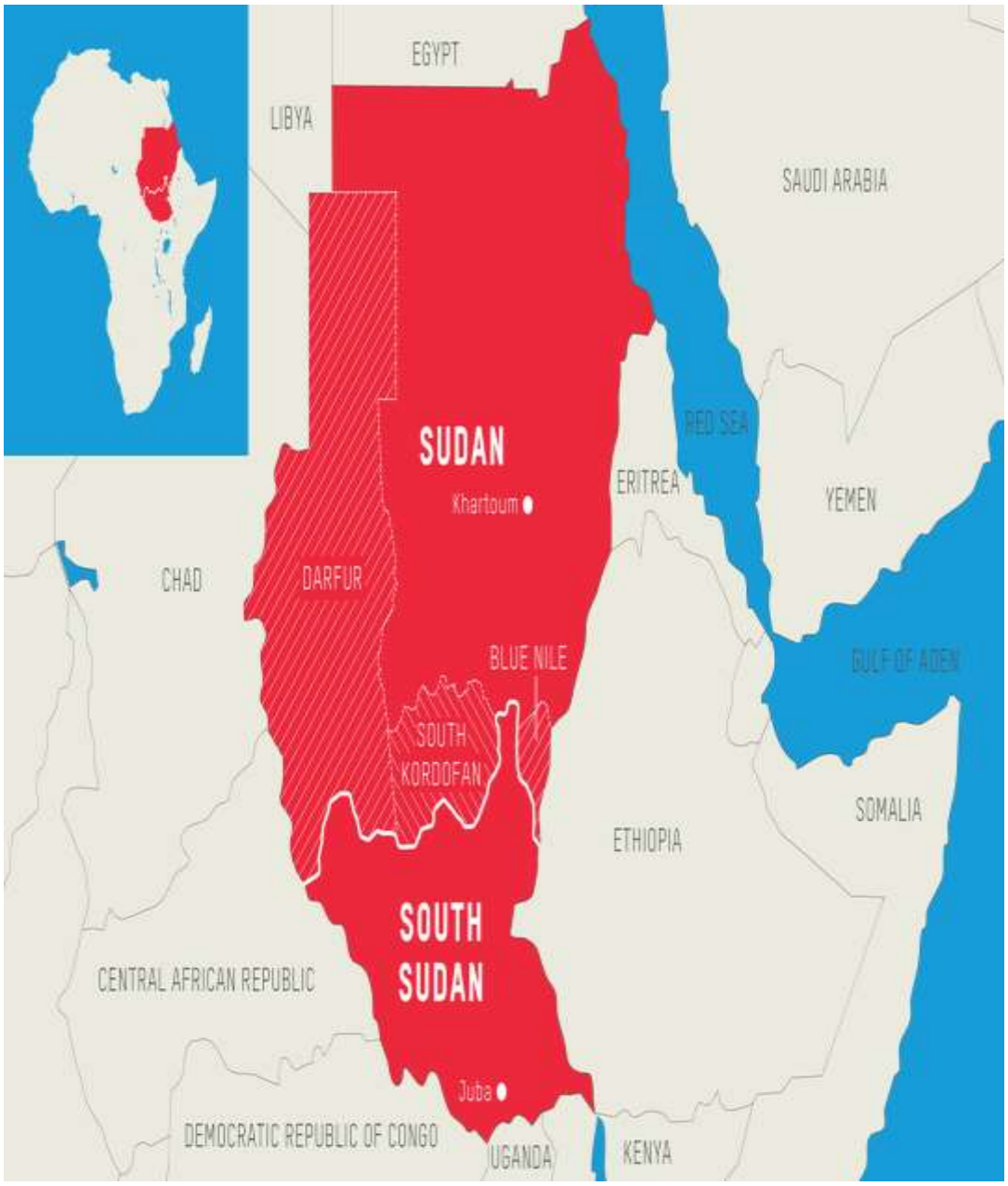

গ্রন্থপুঞ্জি

Comprehensive Peace Agreement between the Government of Sudan and the SPLM/SPLA, at https://peacemaker.un.org/node/1369.

Darfur Peace Agreement, available at https://www.un.org/zh/focus/southernsudan/pdf/dpa.pdf

Secretary-General of the United Nations, *Improving Security of United Nations Peacekeepers: We Need to Change: The Way We Are Doing Business*, DECEMBER 19, 2017, available at https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/improving_security_of_united_nations_peacekeepers_report.pdf

United Nations Electoral Assistance, Report of The Secretary-General, A/74/285, 6 AUGUST 2019

UN (2011), Strengthening The Role of the United Nations in Enhancing the Effectiveness of the Principle of Periodic and Genuine Elections and the Promotion of Democratization, Report of the Secretary-General in General Assembly, Report no-A/66/314

International Crisis Group, "Sudan's Comprehensive Peace Agreement: The Long Road Ahead", Africa Report, 106, 31 March 2006.

International Crisis Group, "Unifying Darfur's Rebels: A Prerequisite for Peace", Africa Briefing, 32, October 2005.

James Putzel, (January 2004), 'The Politics of 'Participation': Civil Society, the State and Development Assistance' Discussion Paper no 1, Crisis States Research Centre,

Laurie Nathan, (June 2004), 'Accounting for South Africa's Successful Transition to Democracy' Discussion Paper no 1, Crisis States Research Centre, LSE, UK.

James Putzel, (November 2004), 'The Political Impact of Globalization and Liberalization: Evidence Emerging from Crisis States Research', Discussion Paper no 7, Crisis States Research Centre, LSE, UK.

Laurie Nathan, (June 2005), 'Mediation and the African Union's Panel of the Wise', Discussion Paper no 10, Crisis States Research Centre, LSE, UK.

Laurie Nathan, (September 2005), 'The Frightful Inadequacy of Most of the Statistics: A Critique of Collier and Hoeffler on Causes of Civil War', Discussion Paper no 11, Crisis States Research Centre, LSE, UK.

Antonio Giustozzi, (October 2005), 'The Debate on Warlordism: The Importance of Military Legitimacy' Discussion Paper no 13, Crisis States Research Centre, LSE, UK

Giovanni Carbone, (December 2005), "Populism" Visits Africa: The Case of Yoweri Museveni and No-party Democracy in Uganda', Working Paper no. 73 Crisis States Research Centre, LSE, UK

Laurie Nathan, (September 2006), 'No Ownership, No Peace: The Darfur Peace Agreement', Working Paper no. 5, Crisis States Research Centre, LSE, UK

Islam, Nurul (2010), *The Army, UN Peacekeeping Mission and Democracy in Bangladesh*, MPRA Paper No. 24312, at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24312/

Sarjoon Athambawa and Mohammed Agus Yusoff (2019), *The United Nations Peacekeeping Operations and Challenges*, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 8 No 3, November 2019, Doi: 10.36941/ajis-2019-0018

Iftekhar Ahmed Chowdhury, Roshni Kapur and Nazneen Mohsina **(**2019) UNITED NATIONS PEACE OPERATIONS: BANGLADESH'S CONTRIBUTIONS, Institute of South Asian Studies, Joint Workshop by ISAS, COSATT and KAS, 27 August, Singapore

The United Nations Peacekeepers Journal, published by Civil-Military Relations Directorate Prime Minister's Office, Armed Forces Division, Dhaka Cantonment, Dhaka.

UN (1992), An Agenda for Peace, United Nations, New York.

Challenges for the New Peacekeepers, Stockholm International Peace Research Institute**,** Sweden at www.sipri.se

Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, Understanding Peacekeeping, Cambridge: Polity Press, 2nd edition, 2010.

Mross, Karina (2019), Democracy Support and Peaceful Democratisation After Civil War, Briefing Paper, No. 7/2019, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn.

Karina Mross (2019) First Peace, then Democracy? Evaluating Strategies of International Support at Critical Junctures after Civil War, International Peacekeeping, 26:2, 190-215.

Rahman, 'Impact of Human Security Approach in the Post UN Peace Keeping Mission: A Case Study of Bangladesh'

Nurul Islam, 'The Army, UN Peacekeeping Mission and Democracy in Bangladesh'

Ilyas Iftekhar Rasul, 'Bangladesh's Contribution to United Nations Peacekeeping Missions in Africa, BISS, 2010.

রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭), "আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দুই দশক একটি মূল্যায়ন", প্রতি চিন্তা, ঢাকা।

কাজী আলী রেজা (২০১৬), জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ উন্নয়নের অংশীদার, হোপ মাল্টিমিডিয়া, ঢাকা।

মেজর এ কে এম তাওহীদ উল ইসলাম (অবঃ) (২০১৮), শান্তির দূত- বসনিয়ার দিনগুলি, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা।

ডেল এইচ খান (২০২০), সম্পাদিত ও সংকলিত, শান্তিরক্ষী: বিশ্ব শান্তি ওক্ষায ৩০ বছর বাংরাদেশী শান্তিরক্ষীদের অভিজ্ঞতা, নালন্দা, ঢাকা।

কর্ণেল নাজমা আক্তার নাজু (২০১৭), আত্মকতন, জাতিসংঘ ইতিহাসে প্রথম নারী কন্টিনজেন্ট কমান্ডার, অন্বেষণ, ঢাকা।

ইজমা বেগম নাজু (২০১২), শান্তিরক্ষী নারীযোদ্ধা: আইভরিকোস্ট থেকে বাংলাদেমের কানে কানে, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

সাইফুদ্দিন আহমদ ও মো. জাহিদুল ইসলাম (২০১৯), শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যায়ন, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (২০১৫), বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস (পঞ্চম খন্ড), বাংলাদেশ সেনা সদর দপ্তর, ঢাকা।

Websites

Bangladesh Army Journal, https://www.army.mil.bd/Publication

https://theglobalobservatory.org/

https://www.un.org/

https://www.jstor.org/

https://www.unsecretariat.net/

https://www.ipinst.org/

https://peacekeeping.un.org/en

https://afd.gov.bd/

https://www.army.mil.bd/

https://www.navy.mil.bd/

https://www.police.gov.bd/

https://baf.mil.bd/

www.dppa.un.org

https://undocs.org

https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unmis/background.shtml,